নারায়ণগঞ্জের স্থাপত্য (সুলতানী ও মুঘল)

তত্ত্বাবধায়ক

ড. হাবিবা খাতুন

অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

উপস্থাপক

ফৌজিয়া করিম এম. ফিল. গবেষক

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

401796

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

নারায়ণগঞ্জের স্থাপত্য (সুলতানী ও মুঘল)

Dhaka University Library
401796

GIFT

তত্ত্বাবধায়ক

ড. হাবিবা খাতুন
অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

401796

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

উপস্থাপক

ফৌজিয়া করিম এম. ফিল. গবেষক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

অভিজ্ঞান পত্র

আমি প্রত্যয়ন করছি যে, ফৌজিয়া করিম ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক হিসেবে এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য আমার তত্ত্বাবধানে **"নারায়ণগঞ্জের স্হাপত্য" (সুলতানী ও মুঘল)** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি প্রণয়ন করেছে। মৌলিক উপকরণের বিচার বিশ্লেষণের ভিত্তিতে রচিত এ অভিসন্দর্ভটি তার একক গবেষণার ফল। আমি অভিসন্দর্ভটির প্রাথমিক ও চূড়ান্ত পান্ডুলিপি আদ্যপ্রান্ত পাঠ করেছি এবং এটি এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য এ বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিল করার সুপারিশ করছি।

401796

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

২৫.০১.০৪

(ডঃ হাবিবা খাতুন)

প্রফেসর

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ও

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

Dhaka University Institutional Repository

অঙ্গীকার পত্র

আমি এ মর্মে অঙ্গীকার করছি যে নারায়ণগঞ্জের স্থাপত্য (সুলতানী ও মুঘল) শিরোনামের এ গবেষণা কর্মটি সম্পূর্ণরূপে আমার নিজস্ব রচনা। আমার জানা মতে ইতোপূর্বে এ বিষয়ের উপর অন্য কেউ অথবা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে অথবা প্রতিষ্ঠানে গবেষণাকার্য পরিচালিত হয় নি। এই অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য লিখিত এবং এটি বা এর কোন অংশবিশেষ অন্যকোন বিশ্ববিদ্যালয়ে অথবা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে কোন ডিগ্রী অথবা ডিপ্লোমা কিংবা প্রকাশের জন্য উপস্থাপন করা হয়নি।

401796

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Faujia Karim
15.01.04.

ফৌজিয়া করিম

এম. ফিল. গবেষক

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমি এম. এ. ক্লাশে 'মুসলিম শিল্পকলা ও প্রত্ন'তত্ত্ব' বিষয়ে অধ্যায়নকালে যে অংশ আমাকে সবচেয়ে আকৃষ্ট করেছে তা হলো আমাদের অতীত ইতিহাসের সাক্ষ্য আমাদের প্রত্নসম্পদ, মধ্যযুগীয় স্থাপত্য। যদিও বাংলার মুসলিম স্থাপত্য অধ্যয়ন করেছি ভারতীয় স্থাপত্যের অংশ হিসেবে, তথাপি স্বকীয়তা ও আত্মমর্যাদার দিক থেকে এ অঞ্চলের স্থাপত্য অন্যান্য দেশের মুসলিম স্থাপত্যের চেয়ে যে কম গুরুত্ব বহন করেনা তা উপলব্ধি করতে পেরেছি। এম.এ. শেষ করার পর আমার নিজের জেলা নারায়ণগঞ্জের স্থাপত্য (সুলতানী ও মুঘল) নিয়ে গবেষণার ইচ্ছা পোষণ করি। এ বিষয়ে গবেষণার জন্য আমার বিভাগের অধ্যাপক ড. হাবিবা খাতুন আমাকে অনুপ্রাণিত করেন এবং সর্বাঙ্গীন সহযোগীতার আশ্বাস দেন। তাই প্রথমেই আমার শ্রদ্ধেয় তত্ত্বাবধায়ক ড. হাবিবা খাতুনকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমার তত্ত্বাবধায়ক ছাড়া যিনি আমাকে এই কাজে সর্বাত্বকভাবে সহযোগিতা ও অনুপ্রাণিত করেন আমার বিভাগের তৎকালীন চেয়ারম্যান ড. আয়শা বেগম। আমার বিভাগের প্রবীন ও নবীন শিক্ষকগণ বিভিন্ন সময়ে উপদেশ ও উৎসাহ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। তাদের প্রতি আমি আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। নিজ জেলা নিয়ে কাজ করার উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যুগিয়ে সহযোগিতা করেছেন আমার শ্রদ্ধেয় পিতা ফজলুল করিম। তাঁকে সর্বদা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। স্থাপত্য নিয়ে গবেষণা অত্যন্ত দুরূহ কেননা শুধু তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ নয়, এর জন্য প্রয়োজন বাস্তব পর্যবেক্ষণমূলক জ্ঞান। এই জ্ঞান আহরণের জন্য আমাকে যেতে হয়েছে বর্তমান নারায়ণগঞ্জের অন্তর্ভুক্ত মধ্যযুগের রাজধানী সোনারগায়ের বিভিন্ন অঞ্চলে। আর এই দুঃসাধ্য কাজটি সম্পাদনে যে শুভানুরাগীরা আমাকে সহায়তা করেছেন, তাদের প্রতি আন্ত রিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। বিশেষ করে আমার ছোট ভাই ফটোগ্রাফার মোঃ রকিব উদ্দিন আহম্মেদ এবং বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের অঙ্কন বিভাগের জনাব আব্দুস সবুর আমাকে প্রত্ন সম্পদ পরিদর্শন,ভূমি নকশা অঙ্কন, ছবি তোলার এবং তথ্য সংগ্রহের কাজে

Dhaka University Institutional Repository

যথেষ্ট সহযোগিতা প্রদান করেন। তাদের সহযোগিতা ব্যতীত আমার মাঠ পর্যায়ের কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যেত। এ ছাড়া নারায়নগঞ্জের স্থানীয় সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ যারা আমাকে সানন্দে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করেছেন। আমি আমার বন্ধু-বান্ধব ও সহকর্মীদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যারা আমাকে গবেষণা কার্য পরিচালনায় উৎসাহ দিয়েছেন এবং সার্বিক সহযোগিতা করেছেন।

এই গবেষণা পান্ডুলিপিটি কম্পিউটারে কম্পোজ করে দিয়েছে আমার সহকর্মী খাইরুজ্জামান এবং ভ্রাতৃতুল্য হোসাইন ফাহ্‌মি। এই গবেষণা কর্মটি সম্পাদনে আমার পরিবারের সকলেরই অবদান রয়েছে। আমি তাদের সকলের কাছে বিশেষভাবে ঋণী। পরিশেষে নারায়ণগঞ্জ সুধীজন পাঠাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, তরফদার স্মৃতি জাদুঘর, বেগম সুফিয়া কামাল গ্রন্থাগার, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী গ্রন্থাগার, এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগার, প্রভৃতি জ্ঞানগৃহ আমার গবেষণাকে আরও সহজ ও সমৃদ্ধ করেছে। এ সকল গ্রন্থগারের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পরিশেষে আবারও স্মরণ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় তত্ত্বাধায়ক ড.হাবিবা খাতুনকে যাঁর সার্বক্ষনিক পর্যবেক্ষণ, প্রত্যেকটি বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ও সঠিক দিক নির্দেশনার ফলে অভিসন্দর্ভটি বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

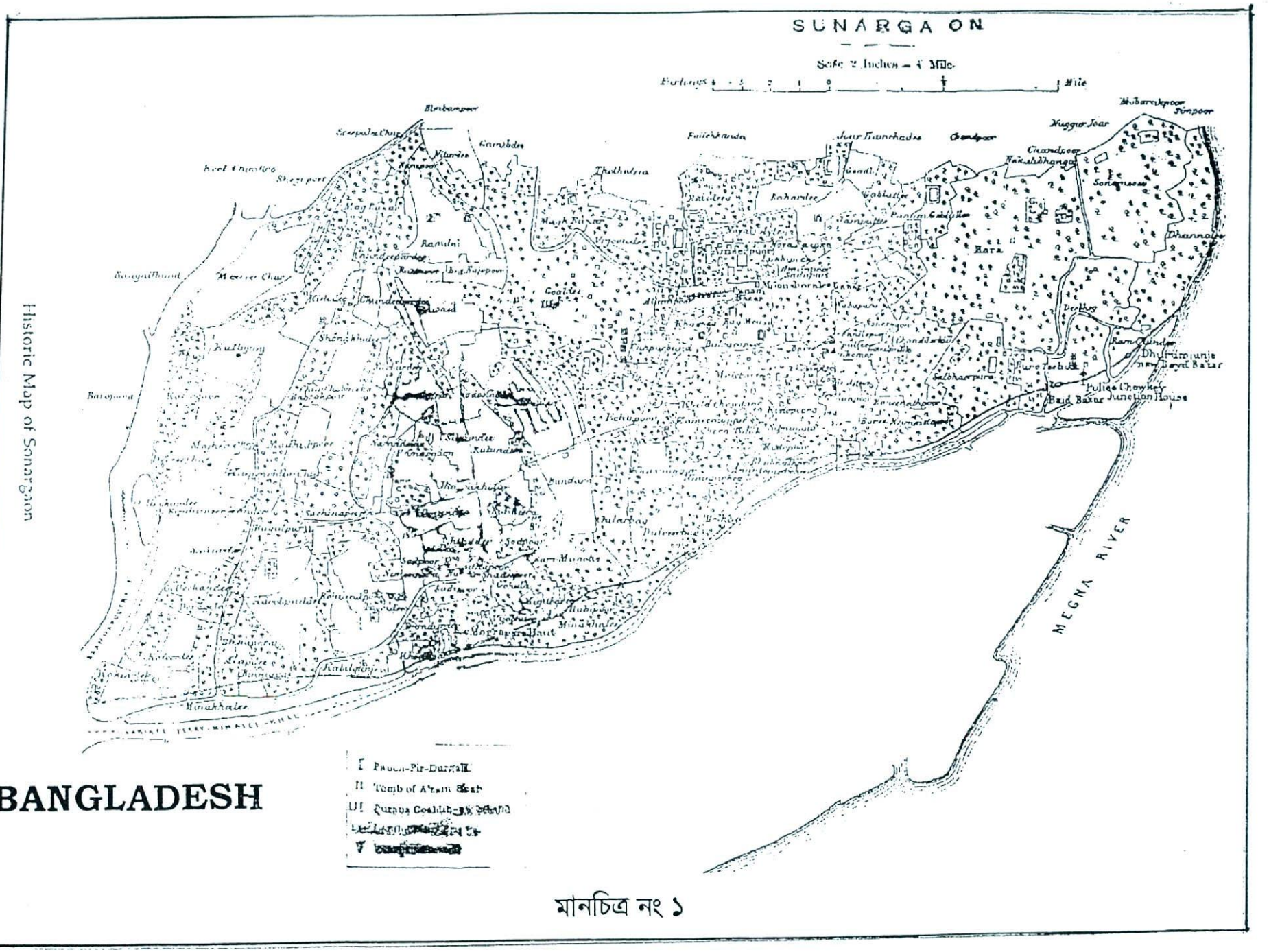

মানচিত্র নং ১

Dhaka University Institutional Repository

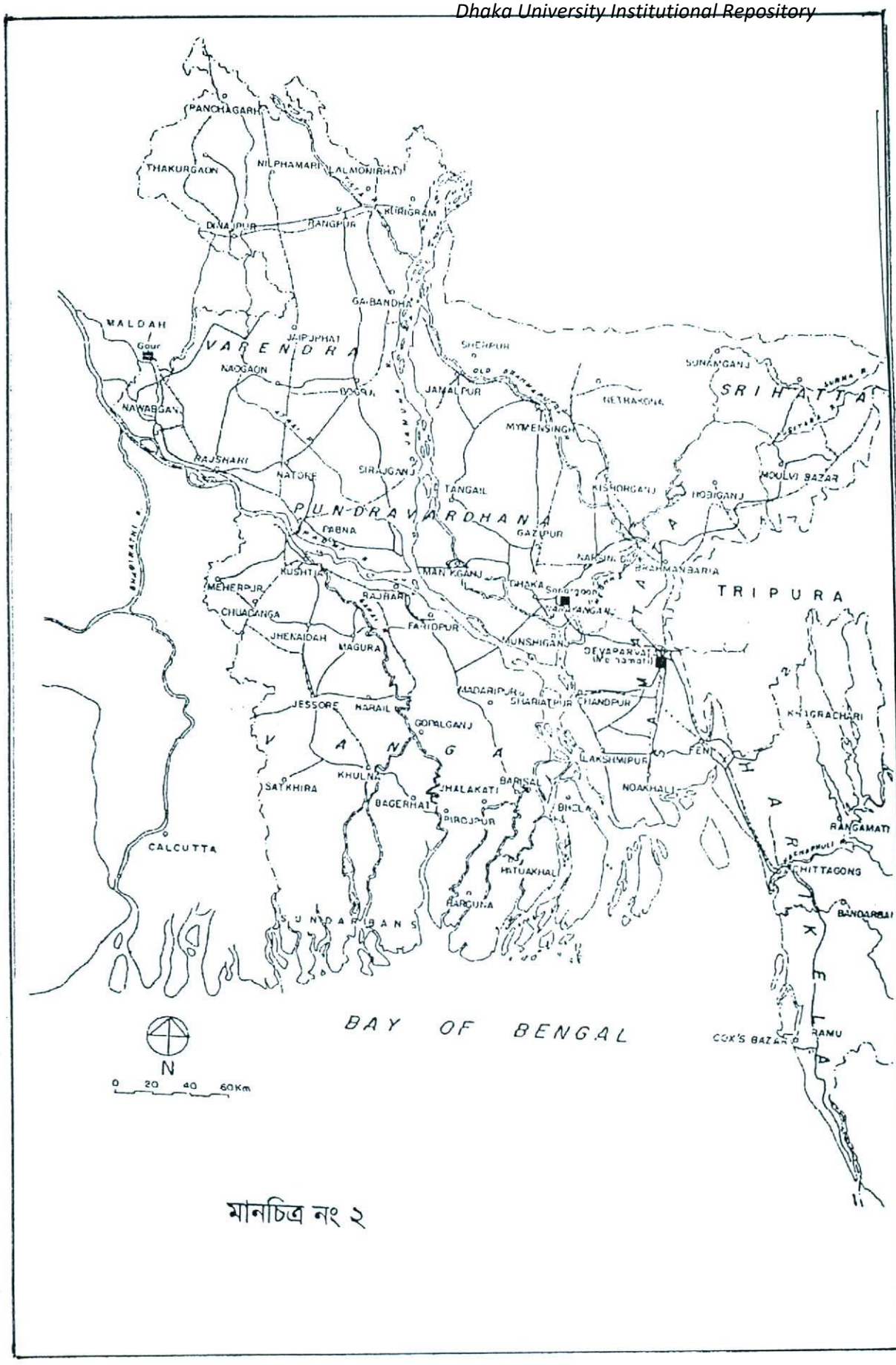

মানচিত্র নং ২

Dhaka University Institutional Repository

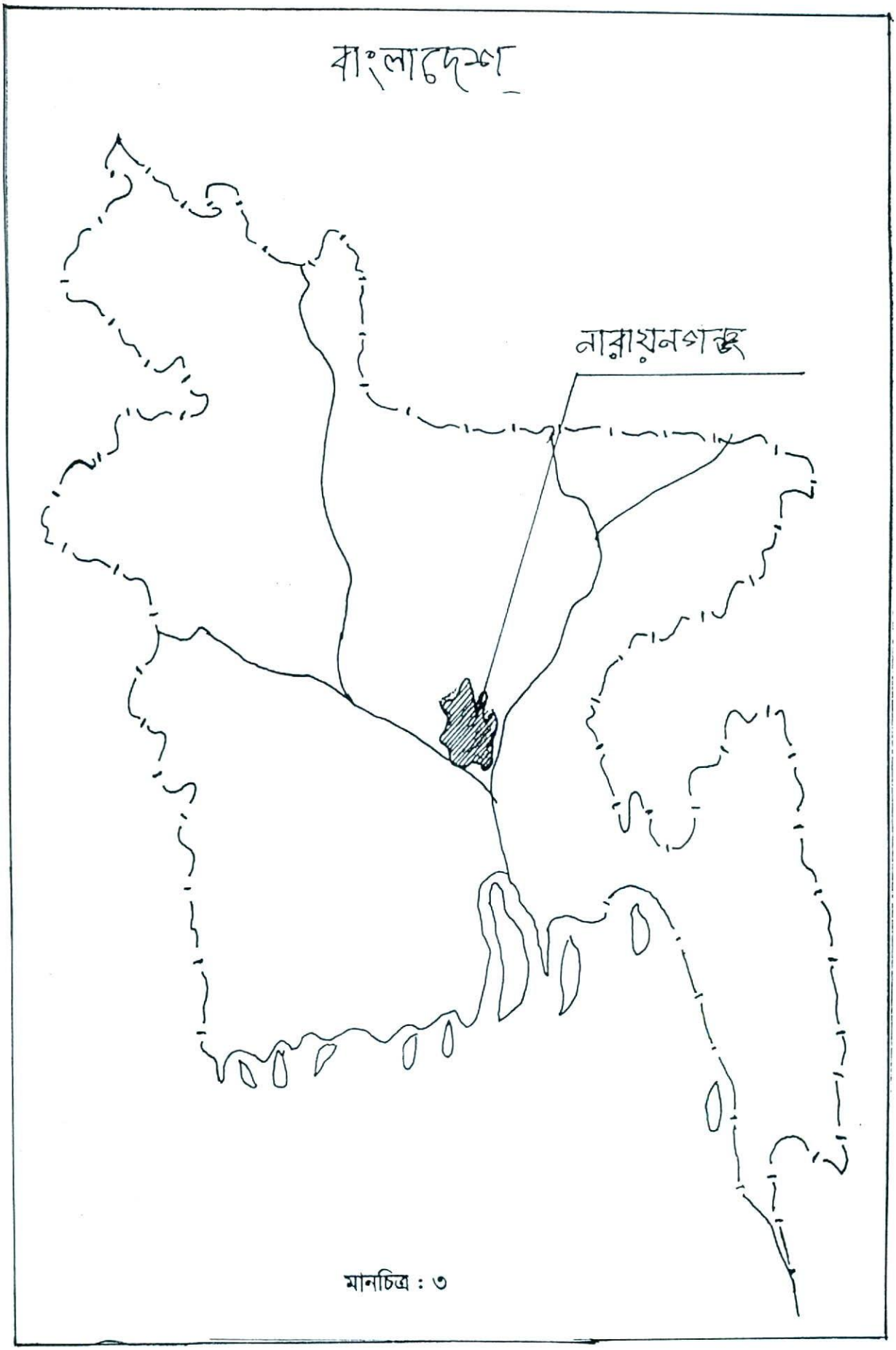

মানচিত্র : ৩

Dhaka University Institutional Repository

নারায়ণগঞ্জ শহর

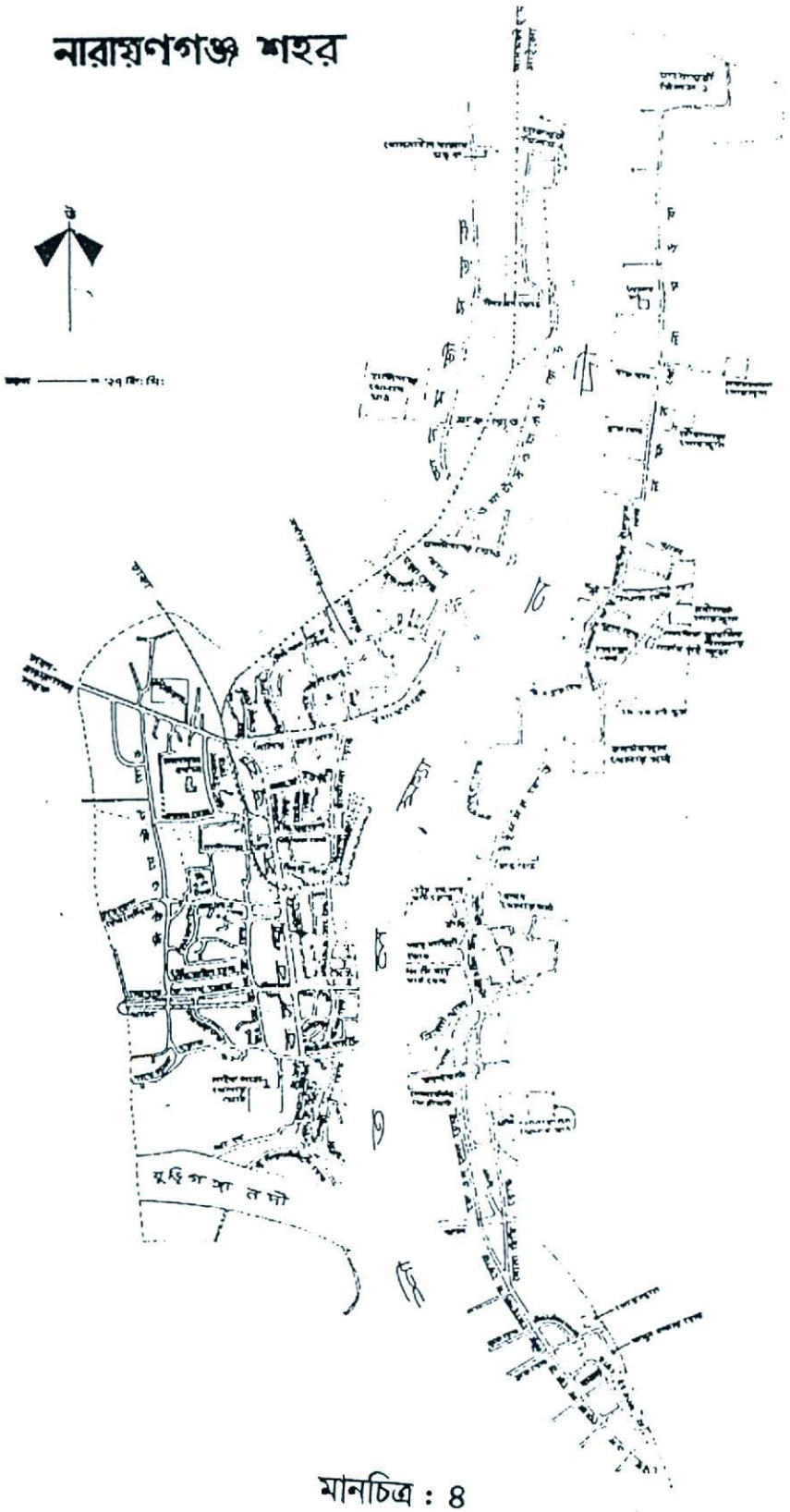

মানচিত্র : ৪

Dhaka University Institutional Repository

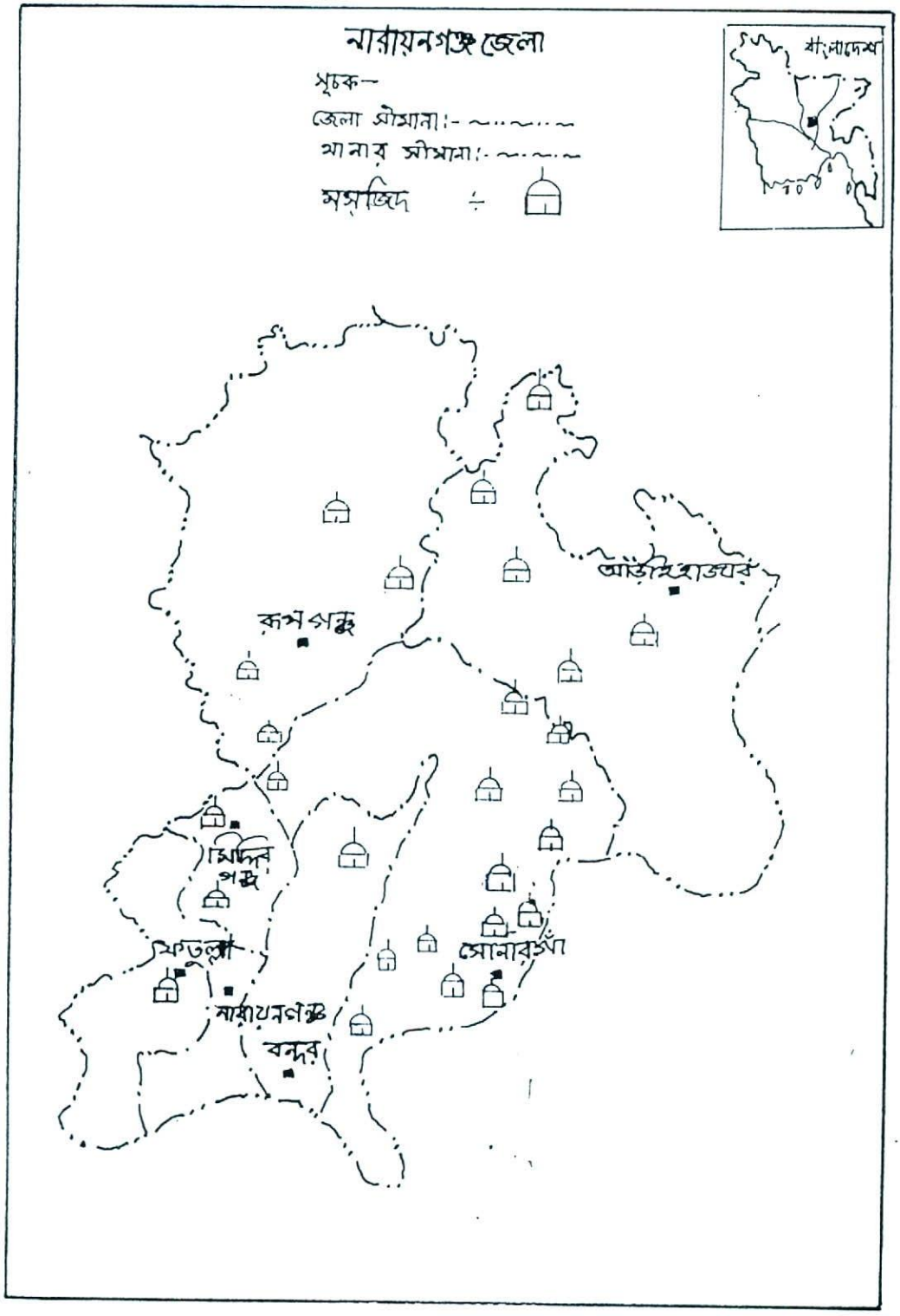

মানচিত্র : ৫

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

১।	অভিজ্ঞান পত্র	
২।	ঘোষনা পত্র	
৩।	কৃতজ্ঞতা স্বীকার	
৪।	মানচিত্র	
৫।	প্রথম অধ্যায়ঃ ভূমিকা	১-৭
৬।	দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ ঐতিহাসিক পটভূমি	৮-২৬
৭।	তৃতীয় অধ্যায় ঃ নারায়ণগঞ্জের ভৌগলিক অবস্থান ও পরিবেশ	২৭-৩৩
৮।	চতুর্থ অধ্যায় ঃ নারায়ণগঞ্জের স্থাপত্যিক বিবরণ	৩৪-১৩২
(ক)	সুলতানী আমলের স্থাপত্য-	৩৫-৩৫
i)	মুয়াজ্জমপুর শাহী মসজিদ	৩৬-৪৩
ii)	বন্দর শাহী মসজিদ	৪৩-৪৪
iii)	ফতেহ শাহের মসজিদ	৪৫-৪৭
iv)	ইউসুফগজ্ঞ মসজিদ	৪৮-৪৯
v)	দেওয়ান বাগ মসজিদ	৫০-৫২
vi)	বাবা সালেহ মসজিদ কমপ্লেক্স	৫৩-৫৪
vii)	গোয়ালদী মসজিদ	৫৫-৫৯
viii)	গিয়াস উদ্দিন আযম শাহ নির্মিত সমাধি	৬০-৬৪
(খ)	মুঘল আমলের স্থাপত্য	৬৪-৬৪
i)	পাঁচপীরের মসজিদ	৬৫-৬৬
ii)	আব্দুল হামিদের মসিজদ	৬৭-৬৮
iii)	বিবি মরিয়ম মসজিদ কমপ্লেক্স	৬৯-৭৭

Dhaka University Institutional Repository

iv)	হাজীগঞ্জ মসজিদ	৭৮-৮২
v)	দোলারদী মসজিদ	৮৩-৮৪
vi)	দরিকান্দি মসজিদ	৮৫-৮৬
vii)	বাড়ি মজলিস জামে মসজিদ	৮৭-৮৮
viii)	বালিয়া দিঘির পাড় মসজিদ	৮৯-৯০
xi)	পাঁচপীরের সমাধি	৯১-৯৪
x)	ইব্রাহিম দানেশ মন্দের সমাধি	৯৫-৯৭
xi)	ফতুল্লা সেতু	৯৮-৯৯
xii)	পাগলার সেতু	৯৯-১০০
xiii)	চাপাতলীর সেতু	১০১-১০৪
xiv)	পিঠাওয়ালীর সেতু	১০৪-১০৫
xv)	ছোট পানাম সেতু	১০৫-১০৬
xvi)	পানাম সেতু	১০৬-১০৭
xvii)	দমদমা দুর্গ	১০৮-১০৯
xviii)	কাত্রাভু দুর্গ	১০৯-১১৩
xix)	সোনাকান্দা দুর্গ	১১৪-১১৯
xx)	হাজীগঞ্জ দুর্গ	১১৯-১২৫
xxi)	কদম রসুলের ইমারত	১২৬-১২৭
৯।	পঞ্চম অধ্যায় ঃ নারায়ণগঞ্জের স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য	১৩৩-১৪৮
১০।	ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ নারায়ণগঞ্জের স্থাপত্যের তুলনামুলক আলোচনা	১৪৯-১৫৫
১১।	সপ্তম অধ্যায় ঃ নারায়ণগঞ্জের স্থাপত্যের শিলালিপি	১৫৬-১৭৭
১২।	অষ্টম অধ্যায় ঃ উপসংহার	১৭৮-১৮২
১৩।	পরিভাষা	১৮৩-১৮৫
১৪।	গ্রন্থপঞ্জি	১৮৬-১৯৬

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

দক্ষিণ পূর্ব বাংলার মধ্যযুগের ইতিহাস পর্যালোচনায় নারায়ণগঞ্জ নামক কোন শহরের নাম পাওয়া যায় না। সুলতানী শাসনামলে সোনারগাঁ ছিল দক্ষিন-পূর্ব বাংলার রাজধানী[১] বর্তমানে সোনারগাঁ নারায়ণগঞ্জ জেলার একটি উপজেলা।[২] নারায়ণগঞ্জের ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে সোনারগাঁর ইতিহাস চলে আসে। পাল ও সেন বংশের শাসনামলের পূর্বে সোনারগাঁয়ের কোন ইতিহাসই আমরা সঠিক ভাবে জানি না।[৩] যোগিনীতন্ত্র এর মতে কামরূপ রাজ্যের দক্ষিণ সীমানা ছিল ব্রহ্মপুত্র ও লক্ষ্যা নদীর সংগম স্থল, যে স্থানে বর্তমানের নারায়ণগঞ্জ অবস্থিত। বিক্রমপুরের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী রাজাদের হাতেই সোনারগাঁ এর শাসনভার ন্যস্ত ছিল। মুসলিম বিজয়ের প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে চন্দ্র বংশ, পাল বংশ ও দেব বংশ সোনারগাঁ এর কর্তৃত্ব করতেন[৪]।

১২০৪ খৃঃ ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজীর লক্ষণাবতী দখলের পর রাজা লক্ষণ সেন সোনারগাঁ এ পালিয়ে আসেন।[৫] লক্ষণ সেনের সোনারগাঁ–এ আশ্রয় লাভের ঘটনায় এর ঐতিহাসক গুরুত্ব কিছুটা বৃদ্ধি পায়। ১২৮১ খৃঃ সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের সোনারগাঁ আক্রমনের পূর্ব পর্যন্ত তথায় সেন রাজারা নির্বিঘ্নে রাজত্ব করেন। এরপর দীর্ঘ দুই শতাব্দী এই সুপ্রাচীন নগরটি দক্ষিন-পূর্ব বাংলার মুসলিম শাসকদের রাজধানী ছিল।[৬] কিন্তু দিল্লী থেকে সোনারগাঁ এর বিশাল দূরত্ব এবং বাংলার ঐশ্বর্য তখনকার প্রাদেশিক শাসনকর্তাদেরকে দিল্লীর সুলতানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষনা করতে প্ররোচিত করত। ফলশ্রুতিতে ১৩৩৮ খৃঃ ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ নিজেকে পূর্ব বাংলার স্বাধীন রাজা হিসেবে ঘোষনা করে সুলতান সিকান্দর শাহ উপাধি ধারণ করেন। শের শাহের পূর্ব বাংলা দখলের পূর্ব পর্যন্ত হোসেন শাহের বংশধররা এতদাঞ্চলে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৫৭৬ খৃঃ সম্রাট আকবরের সেনাবাহিনী কর্তৃক দাউদ খান কররানীর পরাজয় ও নিহত হওয়ার মাধ্যমে পূর্ব বাংলায় আফগান রাজত্বের অবসান হয়। পরাজিত ও বিক্ষিপ্ত আফগানরা

Dhaka University Institutional Repository

হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে এবং তারা আসাম ও উড়িষ্যার কয়েকজন পার্বত্য রাজ্য প্রধানের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে।

আফগানী পাঠানদের আশ্রয়দানকারী একজন জমিদার ছিলেন ঈশা খাঁ। মুঘলদের দ্বারা তাড়িত হয়ে ঈশা খাঁ তার রাজধানী কাত্রাভূতে স্থানান্তরিত করেন। ঈশা খানের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মুসা খান পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। কোন কেন ঐতিহাসিকদের মতে মুঘল আক্রমনের প্রাক্কালে মুসা খান কাত্রাভূ হতে সোনারগাঁ-এ রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। মুঘল বাহিনীর কাত্রাভূ ও কদমরসূল বিজয়ের পর মুসা খান ইব্রাহিমপুর দ্বীপে পালিয়ে যান[৭]। এ দিকে মুঘল বাহিনী অতি সহজেই সোনারগাঁ অবরুদ্ধ করে। সোনারগাঁয়ের ভারপ্রাপ্ত শাসনকর্তা হাজী শামসুদ্দিন বাগদাদী আত্মসমর্পণ করে ইসলাম খানের কাছে আনুষ্ঠানিক ভাবে রাজধানী হস্তান্তর করেন। সোনারগাঁয়ের পতনের পর এ অঞ্চলে বার ভুঁইয়ার অন্যতম প্রধান ভুঁইয়া মুসা খানের শাসনের অবসান ঘটে। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত নারায়ণগঞ্জ অঞ্চলের ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায়নি। নারায়ণগঞ্জ বলতে তখন পর্যন্ত কোন শহর গড়ে ওঠেনি। বর্তমান মূল শহরের ভূ-গঠন সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি হতে শুরু করে অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক পর্যন্ত চলে। পলিমাটি পড়ে জেগে উঠে নতুন ভূমি এবং এই জেগে উঠা নতুন ভূমির উপর অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে নারায়ণগঞ্জের প্রতিষ্ঠা হয়[৮]। ১৯৮৪ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী নারায়ণগঞ্জ জেলা হিসাবে আত্ম প্রকাশ করে। বর্তমানে নারায়ণগঞ্জে ৫টি উপজেলা এবং ৬১টি ইউনিয়ন রয়েছে[৯]। প্রাক-মুসলিম কিংবা মুসলিম শাসনামলে এ অঞ্চলে ইতিহাস চর্চার প্রচেষ্টা খুব একটা লক্ষ্য করা যায় না। এ অঞ্চলের সমসাময়িক ইতিহাস জানার জন্য অনেকটাই নির্ভর করতে হয় স্থাপত্য তথা প্রত্নতত্ত্বের উপর। মধ্যযুগে বাংলায় নির্মিত মুসলিম স্থাপত্যের যে সব নিদর্শন আজও অতীত ইতিহাসের গৌরব বহন করে টিকে আছে নারায়ণগঞ্জের স্থাপত্য তাদের মধ্যে অন্যতম।

Dhaka University Institutional Repository

নারায়ণগঞ্জের ইতিহাস ও স্থাপত্য সম্বন্ধে লিখিত তথ্যাদি বিক্ষিপ্ত ভাবে বিভিন্ন বই, প্রতিবেদন, দলিল-দস্তাবেজে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এই গবেষণাকর্মে সে সব তথ্যাদি সমন্বয় করে সন্নিবেশিত করার মাধ্যমে নারায়ণগঞ্জের অতীতের একটি সামগ্রিক রূপরেখা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। নারায়ণগঞ্জের ইতিহাস সংশ্লিষ্ট যেসব তথাদি পাওয়া গেছে তাতে স্থাপত্য বিষয়ে খুব সামান্যই উল্লেখ পাওয়া যায়। এর মধ্যে আ.ক.ম. যাকারিয়া প্রণীত "বাঙলাদেশের প্রত্ন সম্পদ" গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁর গ্রন্থে ঢাকার স্থাপত্য আলোচনায় মুসলিম সময়ের স্থাপত্য আলোচনা প্রসংগে সোনারগাঁ তথা নারায়ণগঞ্জের কিছু সংখ্যক স্থাপত্যের উপর আংশিক আলোকপাত করেছেন। কিন্তু এখানকার স্থাপত্যিক রীতির বৈশিষ্ট্য তাঁর গ্রন্থে পাওয়া যায়নি।

ঐতিহাসিক রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর "বাঙ্গালার ইতিহাস" প্রথম খন্ড (১৯১৪) গ্রন্থে বঙ্গের বিভিন্ন রাজবংশের ইতিহাস আলোচনা করেছেন[১০]। তাঁর গ্রন্থটিতে বিভিন্ন রাজবংশের ইতিহাস আলোচনা হলেও তিনি দক্ষিণ পূর্ব বাংলার এক কালের সমৃদ্ধ নগরী সোনারগাঁয়ের স্থাপত্য সম্পর্কে কোন আলোচনা করেননি। এই গ্রন্থগুলোতে দক্ষিণ পূর্ব বাংলার রাজবংশগুলোর সাথে সোনারগাঁয়ের অবিচ্ছেদ্য যোগাযোগ থাকার কারণে অতীতে তাদের মধ্যে সম্পর্ক ও তাদের অবদানের কথা আলোচিত হয়েছে। কিন্তু স্থাপত্য সম্পর্কে সেখানে আলোচনা অনুপস্থিত। ঐতিহাসিক মীর্যা নাথান "বাহারীস্থান-ই-গায়বী" গ্রন্থে বিভিন্ন রাজবংশের ইতিহাস আলোচনা করলেও তিনি স্থাপত্য নিয়ে আলোচনা করেননি। "সুবর্ণ গ্রামের ইতিহাস" প্রবন্ধে স্বরূপ চন্দ্র রায় নারায়ণগঞ্জের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন কিন্তু স্থাপত্য নিয়ে আলোচনা করেননি। তিনি মূলত তাঁর প্রবন্ধটিতে সোনারগাঁয়ের সীমা নির্ধারণ করার চেষ্টা করেছেন। "Inscriptions of Bengal, vol-(IV) শামসুদ্দীন আহম্মদ তার গ্রন্থে বাংলার শিলালিপি নিয়ে আলোচনা করেছেন। এতে সোনারগাঁয়ের বিভিন্ন সুলতান কেন্দ্রীক কিছু শিলালিপি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে তবে সোনার গাঁয়ে প্রাপ্ত সব শিলালিপি সমন্ধে আলোচনা করা হয়নি। *"বিক্রমপুরের ইতিহাস"* গ্রন্থের রচয়িতা যোগেন্দ্র

Dhaka University Institutional Repository

নাথ গুপ্ত "সোনরগাঁয়ের সন্ধানে" শামসুদ্দোহা চৌধুরী "বাংলাদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ–)" রমেশ চন্দ্র মজুমদার, "বাংলায় মুসলিম অধিকারের আদি পর্ব (১২০৪-১৩৩৮ খ্রীঃ) সুখময় মুখোপাধ্যায় "বাংলার ইতিহাস (সুলতানী-আমল), "বাংলার ইতিহাস (মুঘল আমল) আব্দুল করিম প্রমুখগণ তাঁদের গ্রন্থে সোনারগাঁ তথা নারায়ণগঞ্জের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু আধুনিক নারায়ণগঞ্জের ইতিহাস নিয়ে কোন ঐতিহাসিকই আলোচনা করেননি এবং স্থাপত্য বিষয়েও তেমন আলোকপাত করেননি। "তাওয়ারিখে ঢাকা" মুন্সী রহমান আলী তায়েশ, "Glimpses of Old Dacca" সৈয়দ মুহাম্মদ তৈফুর, "Skatch of the Topography & Statistics of Dacca" – *James Taylor,* এ সব গ্রন্থে ইতিহাসের পাশাপাশি স্থাপত্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু তা খুব সামান্য পরিমানে। *Archaeological Survey of India, Report of a tour in Bihar and Bengal vol-xv 1879-* গ্রন্থে Alexander Cunningham নারায়ণগঞ্জ তথা সোনাররগাঁয়ের স্থাপত্য সম্পর্কে যেভাবে আলোকপাত করেছেন[১১] তাতে স্থাপত্য ইতিহাস স্থান পেলেও স্থাপত্যের সামগ্রিক চিত্র ফুটে উঠেনি। তিনি তখন তার জরিপে প্রাপ্ত স্থাপত্য নিদর্শন গুলোই তুলে ধরেছেন। তার জরিপের বাইরেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক স্থাপত্য নিদর্শন রয়ে গেছে যা এ গবেষণায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে ব্রিটিশ আমলে আঞ্চলিক ইতিহাস সংগ্রহ ও সংরক্ষণের কাজ শুরু হয়। এ সময় ঔপনিবেশিক শাসকদের উৎসাহে *District Gazetteers* লেখার কাজ শুরু হয়[১২]। কিন্তু গেজেটিয়ার তৈরীর কাজ যে উদ্যম নিয়ে শুরু হয়েছিল তা অচিরেই থেমে যায়। ব্রিটিশদের অনুকরণে অনেকেই বাংলার আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে উৎসাহী হয়ে উঠেন। কিন্তু ইতিহাস লিখন, চর্চা ও সংরক্ষণের জন্য যে ব্যাপক গবেষণা ও পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজন তা কখনই সঠিক ভাবে করা হয়নি। ফলশ্রুতিতে আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতার পরিবর্তে পক্ষপাতিত্বের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। স্থানীয় ইতিহাস চর্চাকারীদের হাতে পড়ে প্রাসংগিকতার পরিবর্তে অপ্রাসংগিক বিষয়ের অবতারণা বেশী হয়েছে। ফলে ইতিহাস চর্চার

Dhaka University Institutional Repository

মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়েছে। সোনারগাঁয়ের ইতিহাস নিয়ে অনেক গ্রন্থ থাকলেও আধুনিক নারায়ণগঞ্জের ইতিহাস সম্পর্কিত কোন আলোচনা এ সকল গ্রন্থে নেই। একমাত্র "নারায়ণগঞ্জের ইতিহাস" গ্রন্থটি ছাড়া। এই গ্রন্থে আধুনিক নারায়ণগঞ্জের ইতিহাস এর উত্থান পতন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে[১৩]।

কোন অঞ্চলের স্থাপত্য সম্বন্ধে সঠিক ধারণা তুলে ধরতে একজন গবেষক গবেষণার ক্ষেত্রে পূর্ববতী উপাত্ত উপাদানই শুধু সংগ্রহ করেন না বরং অনুসন্ধানলব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে আলোচ্য বিষয়কে বিচার বিশ্লেষণ করে ইতিহাস পূণর্গঠন করেন। আলোচ্য গবেষণাকর্ম সম্পাদনে দুটি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। প্রথমতঃ ঐতিহাসিক পদ্ধতি **(Historical Method)** এ পর্যন্ত এই এলাকার উপর যেসব সাহিত্য ইতিহাস, পত্র পত্রিকা, দলিল-দস্তাবেজ, প্রত্নতাত্ত্বিক প্রতিবেদন ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে সেগুলো মুখ্য উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ জরিপ ভিত্তিক বাস্তব পযবেক্ষণের **(Survey and observation Method)** ভিত্তিতে আলোকচিত্র ও রেখাচিত্রের মাধ্যমে স্থাপত্য নিদর্শনের পরিচয় উপস্থাপন করা হয়েছে।

এই গবেষণা কাজের পরিধি রূপগঞ্জ উপজেলা, সোনারগাঁ উপজেলা, আড়াই হাজার উপজেলা, বন্দর উপজেলা এবং নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলা অর্থাৎ আধুনিক নারায়ণগঞ্জ জেলার সুলতানী ও মুঘল আমলের স্থাপত্য সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচ্য অভিসন্দর্ভটি ভূমিকা ও উপসংহার সহ আটটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা; এই অধ্যায়ে কোন বিষয়ের উপর গবেষণা করা হয়েছে, কেন করা হয়েছে, কি পদ্ধতিতে গবেষণা পরিচালিত হয়েছে, গবেষণার পরিধি, গবেষণার জন্য কি ধরণের প্রবন্ধ, গ্রন্থের সহায়তা নেওয়া হয়েছে সে সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়: ঐতিহাসিক পটভূমি; যার মধ্যে রয়েছে নারায়ণগঞ্জ শহরের গোড়াপত্তনের ইতিহাস এবং নারায়ণগঞ্জের ইতিহাস।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়: ভৌগলিক অবস্থান; এই অধ্যায়ে এ অঞ্চলের ভৌগলিক অবস্থান ও পরিবেশ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়: নারায়ণগঞ্জের স্থাপত্যিক বিবরণ; এই অধ্যায়ে মধ্যযুগে নারায়ণগঞ্জে নির্মিত স্থাপত্য সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আলোচনার সুবিধার্থে স্থাপত্যকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা : সুলতানী আমলের স্থাপত্য ও মুঘল আমলের স্থাপত্য। সুলতানী আমলের স্থাপত্যের মধ্যে মসজিদ, সমাধি আলোচনা করা হয়েছে। মুঘল আমলের স্থাপত্যে মসজিদ, সমাধি, দুর্গ, সেতু এবং কিছু লৌকিক স্থাপত্য আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়: নারায়ণগঞ্জের স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য; এই অধ্যায়ে নারায়ণগঞ্জে নির্মিত স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়: নারায়ণগঞ্জের স্থাপত্যের সাথে বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের স্থাপত্যের তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

সপ্তম অধ্যায়: নারায়ণগঞ্জের সুলতানী ও মুঘল আমলের স্থাপত্যের শিলালিপি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

অষ্টম অধ্যায়: নারায়ণগঞ্জের স্থাপত্য (সুলতানী ও মুঘল) শিরোনামের অভিসন্দর্ভটির উপসংহার টানা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

টীকা ও তথ্য নির্দেশ

১) মানিচিত্র নং- ১

২) গবেষক ব্যক্তিগতভাবে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে জেনেছে।

৩) গোস্বামী, করুণাময় ও অন্যান্য (সম্পাদিত)। ***নারায়নগঞ্জের ইতিহাস,*** জেলা প্রশাসন ও সুধীজন পাঠাগার, নারায়নগঞ্জ, পৃ. ১

৪) ঐ, পৃ. ২

৫) করিম, আব্দুল। ***বাংলার ইতিহাস (সুলতানী আমল),*** ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭, পৃ. ৮৩

৬) রহিম, আব্দুর ও অন্যান্য। ***বাংলাদেশের ইতিহাস,*** ঢাকা, নওরোজ কিতাবস্তিান , ১৯৯৯, পৃ. ১৭৫

৭) হোসেন, জামাল। ***প্রাগুক্ত,*** পৃ. ৪

৮) ঐ পৃ.৭

৯) গবেষক ব্যক্তিগতভাবে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে জেনেছে।

১০) বন্দোপাধ্যায়, রাখালদাস। ***বাঙ্গালার ইতিহাস (দ্বিতীয় খন্ড),*** কলিকাতা, দেজ পাবলিশিং, ১৯৮৮, পৃ. ৫২

১১) Cunningham, Alexander. ***Archaeological survey of India, Report of a tour in Bihar and Bengal,*** Delhi, Indological Book House, 1878, pp. 135-144

১২) Rizvi, S.N. H (ed.). ***East Pakistan District Gazetteers,*** Dacca, East Pakistan Govt. Press, 1969, P. 50

১৩) গোস্বামী, করুণাময় ও অন্যান্য (সম্পাদিত)। ***প্রাগুক্ত,*** পৃ. ৪

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঐতিহাসিক পটভূমি

নারায়ণগঞ্জ[১] শহরের ইতিহাস সম্পর্কে জানতে হলে কয়েক শতাব্দী পেছনে ফিরে তাকানো দরকার। বাংলাদেশের ইতিহাসের ক্রমবিবর্তনে ঢাকা শহর থেকে প্রায় ১০ মাইল (১৬.০৯কি:মি) দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত আজকের এই নারায়ণগঞ্জ অঞ্চলের নাম মাত্র কয়েক শতাব্দী পূর্বেও শোনা যায়নি[২]। খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতেও নারায়ণগঞ্জের পার্শ্ববর্তী এলাকা খিজিরপুর, হাজীগঞ্জ, সোনাকান্দা, কদমরসুল ও বন্দর এলাকার নাম পাওয়া যায়। এসব অঞ্চল শীতলক্ষ্যা নদীর পূর্ব ও উত্তর অঞ্চলেই বিস্তৃত। আজকের নারায়ণগঞ্জ শহর শীতলক্ষার পশ্চিম তীরে পরবর্তী সময়ে ধীরে ধীরে জেগে উঠা পললভুমির উপর স্থান করে নিয়েছে।

'নারায়ণগঞ্জ' নামের উৎপত্তি হিন্দু দেবতা 'বিষ্ণু' বা 'নারায়ণের' প্রতিকৃতি থেকে[৩]। পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের সহায়তাদানকারী একজন ধর্মভীরু দানশীল তথা দেশদ্রোহী হিন্দু ভিখনলাল পান্ডে ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর কাছ থেকে পুরস্কার স্বরূপ 'গঞ্জ' নামক এই এলাকার ভোগস্বত্ত্ব লাভ করেন[৪]। কথিত আছে যে, একবার এক সন্ন্যাসী ভিখনলালের আতিথেয়তা গ্রহন করেন এবং তার অতিথি পরায়নতায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে পাঁচটি নারায়ণচক্র উপহার দেন। ভিখনলাল এই পাঁচটি নারায়ণের একটি নরসিংহজীর আখড়ায়, একটি ইদ্রাকপুরে, ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরবর্তী পঞ্চমীঘাটে একটি এবং একটি শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে স্থাপন করেন। শীতলক্ষ্যা নদীর তীরের স্থানটিই হচ্ছে বর্তমানে দেওভোগের লক্ষীনারায়ণের আখড়া।[৫] শীতলক্ষ্যার তীরের বাজারগুলো ভিখনলাল নারায়ণ পুজার ব্যয়ভার নির্বাহে 'দেবোত্তর সম্পত্তি' করে দেন। এই বাজার বা নদীর তীরবর্তী 'গঞ্জ' অঞ্চলের আয় থেকেই সকল ধর্মীয় খরচাদি বহন করা যেত। নারায়ণ ঠাকুরের নামে উৎসর্গীকৃত বলে এই 'গঞ্জ' এলাকা কালক্রমে 'নারায়ণগঞ্জ' নামে পরিচিত হয়ে উঠে।[৬] কালক্রমে শীতলক্ষ্যার পশ্চিম

Dhaka University Institutional Repository

তীরবর্তী এই নবীনভূমি 'গঞ্জ' পূর্বতীরের প্রসিদ্ধ প্রাচীন 'বন্দর' এলাকার জায়গায় স্থান করে নেয়। বর্তমানে শীতলক্ষ্যার উভয় তীরের সমগ্র এলাকাই নারায়ণগঞ্জের অন্তর্ভূক্ত। তাই এতদঞ্চলের দীর্ঘদিনের পূর্ব ইতিহাসের মধ্যেই নারায়ণগঞ্জের গোড়াপত্তনের ইতিহাস অন্তর্নিহিত রয়েছে।

'নারায়ণগঞ্জ' নামটি নতুন হলেও এ অঞ্চলের ইতিহাসে মূলতঃ বাংলার সুলতানী আমলের ঘটনাবলীই প্রাধান্য পেয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের ইতিহাস অনুসন্ধানে দেখা যায় এদেশে মুঘলমানদের আগমন-পূর্ব ইতিহাস সম্পর্কে খুব সামান্য তথ্যই আমাদের হাতে আছে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ভারতবর্ষের ইতহাস অতিপ্রাচীন কাল হতেই বিকৃতরূপে উপস্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের মুসলিম-পূর্ব ইতিহাস বলতে মৌর্য্য বংশের সম্রাট অশোকের রাজত্বকাল, গুপ্ত রাজবংশ, হর্ষবর্ধনের রাজত্বকাল, রাজা শশাঙ্ক চন্দ্র, বর্ম, পাল ও সেন রাজবংশের রাজত্বকাল সম্পর্কে যৎসামান্য তথ্য পাই। এদের শাসনক্ষেত্র ও কাল নিরূপনে একমাত্র পাল ও সেন বংশ ছাড়া অন্যদের ইতিহাস খুব পরিস্কার জানা যায়নি। বস্তুত:পক্ষে বাংলাদেশের ইতিহাস অনুসন্ধানে প্রায় সকল ইতিহাসবেত্তাই একটি গ্রহনযোগ্য মতের অবতারনা করেছেন যে, বাংলাদেশ বা পূর্ববাংলা বা পূর্ববঙ্গ এক সময় বঙ্গোপসাগরে নিমজ্জিত ছিল।[৭] ভৌগলিক অবস্থানগত বিচারে এবং ভূমিরূপ গঠনেও দেখা যায় বাংলাদেশের ভূমি নবীন পললভূমি সমৃদ্ধ। সমুদ্রের পলি জমে জমে কালক্রমে জেগে ওঠা এই ভূমি পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বড় ব-দ্বীপ হিসেবে সুপরিচিত এবং এই ব-দ্বীপের 'বাংলা' বা 'বাংলাদেশ' নামকরণ বহু পরের ঘটনা।

অতীতে 'বাংলাদেশ' বা 'বাংলা' নামে কোন অখন্ড দেশ ছিল না। সে সময় এদেশের এক একটি এলাকা এক একটি নামে পরিচিত ছিল। এসব এলাকাগুলো জনপদ নামে পরিচিত ছিল। যেমনঃ বঙ্গ,সমতট, রাঢ়, গৌড়, কামরূপ, বরেন্দ্র, হরিকেল প্রভৃতি অঞ্চল।'বঙ্গ' জনপদ গড়ে উঠেছিল বর্তমান কালের দক্ষিন ও পূর্ববঙ্গ নিয়ে[৮]। এর সন্নিকটস্থ 'সমতট' গড়ে উঠেছিল কুমিল্লা,নোয়াখালী জেলা, কুষ্টিয়া ,যশোর জেলা , ঢাকা, ময়মনসিংহ,

Dhaka University Institutional Repository

সিলেট ও ফরিদপুর জেলার কিছু অংশ নিয়ে। রাজশাহী জেলার কিয়দাংশ ও পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলা নিয়ে গৌড় জনপদ গড়ে ওঠে। ক্রমে এক একটি অথবা কয়েকটি জনপদ মিলে একটি রাজ্য গঠিত হতে দেখা যায়। এইসব রাজ্য ও জনপদের সীমানা বারবার পরিবর্তীত হয়েছে।

নারায়ণগঞ্জের বর্তমান অবস্থিতি বিচারে এ জেলাটি তৎকালীন 'বঙ্গ' এর অন্তভূর্ক্ত ছিল[৯]। তাই আমরা আমাদের আলোচনায় এই বঙ্গের ইতিহাস সর্ম্পকে আলোকপাতের মাধ্যম্যে নারায়ণগঞ্জের গোড়াপত্তনের ইতিহাস অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা চালাবো।

'বঙ্গ' শব্দটি সংস্কৃত থেকে আগত। সংস্কৃত সাহিত্য 'আরন্যক-ব্রাহ্মণ'-এ প্রথম একটি ক্ষুদ্র জনপদরূপে এর উল্লেখ পাওয়া যায়[১০]। স্থানীয় বাংলা ভাষাভাষী জনসাধারণের মুখে 'বাংলা' নামটি পাল ও সেন রাজাদের অমলে প্রচলিত হয়। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগেও 'বাংলা' বলতে কেবলমাত্র পূর্ব ও দক্ষিনাঞ্চলকেই বুঝাত। ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানীর লেখনী হতে জানা যায় গিয়াস উদ্দিন বলবনের সময় (১২৬৬খৃঃ এর পর হতে) 'ইকলীম বাঙ্গালা' নামের ব্যবহার ছিল[১১]। গিয়াসউদ্দিন তুঘলক 'বাংলা'কে তিনটি শাসনতান্ত্রিক বিভাগে বিভক্ত করেন-লখনৌতি, সাতগাঁও এবং সোনারগাঁও। চতুদর্শ শতাব্দীর প্রারম্ভে শামস-উদ্দিন ইলিয়াস শাহ্ সোনাগাঁও দখল করে নেন এবং সর্বপ্রথম এই তিনটি শাসনবিভাগ- লখনৌতি, সাতগাঁও এবং সোনাগাঁও-কে একক রাষ্ট্রভূক্ত করে এই সম্মিলিত রাজ্যের অধীশ্বর হন এবং এদেশের নামকরণ করেন 'বাঙ্গালাহ্'। বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রকৃতপক্ষে সে সময় 'নারায়ণগঞ্জ' বলে কোন এলাকার জন্মই হয়নি। সোনারগাঁয়ের নামও মাত্র ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এসে শাসনতান্ত্রিক কেন্দ্র হিসেবে ঐতিহাসিক স্বীকৃতি লাভ করে। তবে প্রাক মুসলিম যুগে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী শাসকদের তৎকালীন সুবর্ণ গ্রাম বা সোনারগাঁ যা বর্তমান নারায়ণগঞ্জ জেলার আওতাধীন বুদ্ধমন্ডপ ও শালিবর্ধক বিহারের জন্য বিখ্যাত ছিল[১২]।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বে এ অঞ্চলের মৌর্য্য বংশের সম্রাট অশোক, গুপ্ত রাজবংশের সমুদ্রগুপ্ত-কুমারগুপ্ত, রাজা হর্ষবর্ধন, রাজা শশাঙ্ক প্রমুখগণ রাজত্ব করতেন। তাদের রাজত্বকালে এ এলাকায় যে ঐক্য-সংহতিবোধ গড়ে উঠেছিল সপ্তম শতাব্দীতে রাজা শশাঙ্কের মৃত্যুর পর তা স্তিমিত হয়ে পড়ে। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষার্ধে ভারত উপমহাদেশে আরবদের সিন্ধুবিজয়ের (৭১১খৃঃ) প্রাক্কালে কোন কেন্দ্রীয় সরকার ছিল না । ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দু রাজ্যগুলি পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করতো। স্বাধীনভাবেই পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষবশত: এরা পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ৬৫০ খৃষ্টাব্দে হতে ৭৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় একশত বৎসর এই অঞ্চলে নানা গোলযোগ, বিশৃঙ্খলা, অসহিষ্ণুতা বিরাজমান ছিল। অত:পর অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে (৭৫০খৃষ্টাব্দে আব্বাসীয় খিলাফতের সমসাময়িক) উত্তর বাংলায় পাল বংশের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার ফলে এই গোলযোগ নিয়ন্ত্রনে আসে।

পালবংশের প্রথম রাজা গোপাল (৭৫০-৭৭০) অত্যন্ত দক্ষতার সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করে রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। এই বংশীয় পরবর্তী দুই শাসক ধর্মপাল (৭৮১-৮২১খৃ:) এবং দেবপাল (৮২১-৮৫০খৃ:) অত্যন্ত পরাক্রমশালী হয়ে উঠেন। বাংলার বৃহত্তম অংশ জুড়ে তাদের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটে। এ সময় তারা ভারতবর্ষের উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের গুজরার এদের সমতুল্য হয়ে উঠেন। পাল বংশের রাজাগণ পরবর্তী প্রায় চারশত বৎসর ধরে তাদের সুশাসন বাংলায় সমুজ্জ্বল রাখতে সমর্থ হন। নারায়ণগঞ্জের অনতিদুরের সোনারগাঁও বা 'সুবর্ণ গ্রাম' বা 'সুবর্ণবীথিকা' গ্রাম এসময় বিক্রমপুরের এই ধর্মাবলম্বী রাজবংশের শাসনাধীন ছিল। এ সময় হতেই অর্থাৎ অষ্টম-নবম শতাব্দী হতেই সোনরগাঁও রাজনীতির অন্যতম কেন্দ্র হয়ে ওঠে। তাই নারায়ণগঞ্জের ইতিহাসে সোনারগাঁয়ের প্রাধান্য অনস্বীকার্য।

একসময় সোনারগাঁও-'সুবর্ণবীথি নব্যবিকাশিকা' জনপদ নামে পরিচিত ছিল[১৩]। ভৌগলিক সীমারেখায় সুন্দরবনের পূর্বাঞ্চলসহ ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যন্ত প্রাচীন বঙ্গভূমিই মুসলিম শাসনামলের ইকলিম সোনারগাঁও[১৪]। হিন্দু-পুরাণের বর্ণনানুযায়ী ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে

Dhaka University Institutional Repository

লাঙ্গলবন্ধ এবং পঞ্চমীঘাট নামে দুটি স্থান এবং একটি বন্দর ছিল। এই এলাকায় সুভার নামে একটি স্থানও ছিল[১৫]। এ স্থানটি বর্তমানে সাভার নামে পরিচিত। এর ব্যবসা কেন্দ্রকে 'নিঘামা' বলা হত। সম্ভবত এই এলাকার বিশাল ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে এই সুভারের নিঘামাকে চিহ্নিত করার জন্য 'সুভার নিঘামা' শব্দের প্রচলন ঘটে ও কালক্রমে তা সূবর্ণগ্রামে রূপান্তরিত হয়। সেনরাজাদের শাসনামলে এই 'সুভার নিগামা' সুভার্মাগ্রাম বা সূবর্ণগ্রাম রূপ লাভ করে। বৃহত্তর ঢাকা জেলার আশরাফপুর গ্রামে প্রাপ্ত একটি তাম্রফলকে এই সূবর্ণগ্রাম শব্দের ব্যবহার পাওয়া গেছে[১৬]। এতে বুঝা যাচেছ যে, এটি প্রাক মুসলিম যুগে প্রাচীন বঙ্গের পূর্ব অংশের একটি প্রশাসন কেন্দ্রের নাম ও একটি অঞ্চলের নাম ছিল। সূবর্ণগ্রামকে সোনারগাঁও নামে ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারাণী লিখনিতে প্রথম সোনারগাঁয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে হিন্দু রাজা দনুজমর্দন দেবের রাজধানী বিক্রমপুর থেকে সোনারগাঁয়ে স্থানান্তরিত হয়। দক্ষিন বঙ্গের প্রশাসনিক কেন্দ্র রূপে ১৬০৮ খৃঃ পর্যন্ত এই সোনারগাঁও সুলতানী শাসক ও বার ভুঁইয়াদের অধীনে ছিল। অতঃপর মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে সোনারগাঁও মুঘলদের অধিকারে আসে।

লখনৌতি তথা বাংলার সর্বপ্রথম মুসলিম বিজেতা বখতিয়ার খলজীর বিজয়কাল থেকে বাংলাদেশ প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন ছিল। তবে বখতিয়ার তাঁর রাজধানী লক্ষনাবতী বা লখনৌতিতে স্থাপন করেন, বাংলাদেশের বিরাট অংশ বিশেষ করে সারা পূর্ববঙ্গ এবং দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গ অর্থাৎ তৎকালীন বঙ্গ, রাঢ় ও সমতট, এমনকি বরেন্দ্রের কিছু অংশ তার অধিকারের বাইরে ছিল। ১২৮০ খৃঃ গিয়াসউদ্দিন বলবন লখনৌতি জয় করে কনিষ্ঠপুত্র বুগরা খানকে সোনারগাঁয়ের দায়িত্বে রেখে যান। এই সময় বলবন কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে বিশিষ্ট মওলানা শেখ শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামা সোনারগাঁয়ে আশ্রয় গ্রহন করেন। আবু তাওয়ামার আগমনের মধ্য দিয়েই সোনারগাঁয়ের ইসলাম ধর্ম বিস্তারের ইতিহাস শুরু হয়[১৭]। আবু তাওয়ামার বিহারের শেখ শরফুদ্দিন মানেরীর শিক্ষক ও শ্বশুর ছিলেন। তিনি সোনারগাঁয়ে একটি বিশাল মাদ্রাসা ও খানকাহ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর সময়ে সোনারগাঁও

Dhaka University Institutional Repository

উপমহাদেশে ইসলাম শিক্ষার অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠে[১৮]। ১৩০০ খৃষ্টাব্দে তিনি এখানেই মৃত্যুবরণ করেন। বলবন দিল্লীর সুলতানদের অনুগত থাকলেও ১২৮৭ খৃঃ এ তাঁর মৃত্যুর পর বুগরা খান লখনৌতির স্বাধীনতা ঘোষনা করেন। যদিও বুগরা খানের এ প্রচেষ্টা প্রকৃত অর্থে কার্যকর হয়নি। বলবনের পৌত্র সুলতান রুকনউদ্দিন কাইকাউসের (১২৯০-) অনেক মুদ্রা আবিস্কৃত হয়েছে। সোনারগাঁয়ের টাকশাল হতে ১৩০৫ সাল সর্বপ্রথম শামসুদ্দিন ফিরাজ শাহ্ কর্তৃক উৎকীর্ণ মুদ্রা পাওয়া যায়[১৯]। ১৩১০ সালে তাঁর পুত্র বাহাদুর শাহ্ কর্তৃক উৎকীর্ণ স্বর্ণমুদ্রা ও এখান থেকে জারী করা হয়েছিল। এভাবে নিজ নামে মুদ্রা জারী করার মাধ্যমে প্রাদেশিক শাসনকরা দিল্লীর সম্রাটদের প্রতি বিদ্রোহী মনোভাব প্রকাশ করেছে। এ সময় দিল্লীর সাথে লখনৌতির বন্ধন ক্ষীনতর হয়ে আসে। সমসাময়িক শিলালিপিতে লখনৌতির অধীন বিহার , দেবকোট ও সাতগাঁও প্রদেশের নাম পাওয়া যায়। ১৩২৫ খৃঃ এ বাংলার শাসক বাহাদুর শাহ তাঁর স্বাধীন চেতনার জন্য তুগলকের হাতে বন্দী হন। গিয়াসউদ্দিন তুগলক বাংলায়র মুসলিম রাজ্যকে তিনটি ইকতা বা প্রদেশে বিভক্ত করেন। এই বিভক্তিতে পূর্ব বাংলার প্রাধান্য লক্ষ্যণীয়। 'ইকত্া' তিনটির নাম লখনৌতি,সাতগাঁও এবং সোনারগাঁও অর্থাৎ চতুর্দশ শতাব্দীতে এসে আমরা মুসলিম প্রশাসনিক কেন্দ্র রূপে প্রথমবারের মতো সোনারগাঁয়ের উল্লেখ পাই[২০]। ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ ১৩৩৮ খৃঃ সোনারগাঁয়ের স্বাধীনতা ঘোষনা করে এ সময় হতেই সোনারগাঁ রাজধানীর মর্যাদা লাভ করে। বাংলার ইতিহাসে বস্তুতঃ নারায়ণগঞ্জের ইতিহাসে এই ঘটনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা ঃ-

প্রথমতঃ 'ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ্'-ই সোনারগাঁও তথা বর্তমান নারায়ণগঞ্জের প্রথম স্বাধীন সুলতান হিসেবে বাংলাদেশের ইতিহাসে গৌরবজ্জ্বল স্থান অধিকার করে আছেন।

দ্বিতীয়তঃ আমাদের আলোচ্য বর্তমান নারায়ণগঞ্জ জেলার একটি উপজেলা সোনারগাঁও- এর প্রসাশনিক গুরুত্ব এই ঐতিহাসিক ঘটনার মাধ্যমে মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাসে অত্যন্ত গৌরবান্বিত স্থান দখল করে নেয়।

Dhaka University Institutional Repository

ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ্ কর্তৃক সোনারগাঁও টাকশাল হতে উৎকীর্ণ অনেক মুদ্রা আবিস্কৃত হয়েছে। মুদ্রাগুলি ৭৩৯-৭৫০হিঃ/১৩৩৮-১৩৪৯ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ। তাঁর মুদ্রায় সোনারগাঁওকে 'হযরত জালাল সোনারগাঁও' রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ 'সোনারগাঁও' যে তাঁর রাজধানী ছিল তা 'জালাল' বা 'মহান' শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়েছে। এই সময় সোনারগাঁও অঞ্চল মেঘনা নদীর পশ্চিমতীর থেকে শীতলক্ষ্যার পশ্চিম তীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

ফখরুদ্দীন মোবারক শাহ্র সময়েই চট্রগ্রাম সর্বপ্রথম মুসলিমদের কর্তৃত্বাধীনে আসে। শ্রীপুরের বিপরীতে নদীর অপর তীরে অবস্থিত চাঁদপুর হতে চট্রগ্রাম পর্যন্ত একটি রাজপথ তাঁর সময়ে নির্মিত হয়েছিল বলে জানা যায়। তাঁর সময়ে কদর খান গাজী পীর বা মাহি আসোয়ার ১১ জন শিষ্যসহ ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য চট্টগ্রাম আগমন করেন। জনশ্রুতি অনুযায়ী তাদের আগমন অনুসারেই চট্টগ্রামকে বর্তমানে 'বার আউলিয়ার দেশ' বলা হয়। ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ্ ১১ বৎসর(১৩৩৮-১৩৪৯খৃঃ) সোনারগাঁও শাসন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ইখতিয়ার উদ্দীন গাজী শাহ্ আরও চার বৎসর এ অঞ্চলে কর্তৃত্ব অব্যাহত রাখেন। ফখরুদ্দীনের সমসাময়িক কালে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে হাজী ইলিয়াস নামে এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে। ফখরুদ্দীন লখনৌতির কদর খানের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ন হন এবং তাকে পরাজিত ও নিহত করেন। কদর খানের মৃত্যুর পর তার সেনাধ্যক্ষ আলী মুবারক সুলতান আলাউদ্দীন আলী শাহ্ উপাধি ধারন করে সিংহাসনে আরোহন করেন। প্রাথমিক অবস্থায় আলী মুবারকের অধীনে এই তৃতীয় ব্যক্তি হাজী ইলিয়াস চাকুরী গ্রহন করেন। পরবর্তীতে হাজী ইলিয়াস শাহকে সরিয়ে লখনৌতি অধিকার করেন ও পরে তিনি সোনারগাঁও ও সাতগাঁও অধিকার করে নেন এবং সামগ্র বাংলাদেশে স্বীয় কর্তৃত্ব স্থাপন করতে সমর্থ হন। হাজী ইলিয়াস সর্বপ্রথম সারা বাংলাদেশকে একত্রীভূত করে বাংলার একচ্ছত্র স্বাধীন সুলতান হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। এজন্য তিনি শাহ-ই-বাঙ্গালাহ, শাহ-ই-বাঙ্গালীয়ান এবং সুলতান-ই-বাঙ্গালাহ্ রূপে অভিহিত হন। তিনিই এ দেশের 'বাঙ্গালাহ্' নামকরণ করেন। ফখরুদ্দীনের সময় সোনারগাঁও রাজধানী থাকলেও হাজী ইলিয়াস

Dhaka University Institutional Repository

সোনারগাঁওসহ সারা বাঙ্গালা রাজ্যের রাজধানী লখনৌতিতে স্থানান্তর করেন। কিন্তু বাঙ্গালা রাজ্যের পূর্বাঞ্চলের রাজধানীর গুরুত্ব অব্যাহত থাকে। 'প্রাচীন নগরে'র পরিধি ছাড়িয়ে এ অঞ্চল বন্দর নগরী হিসাবে অন্তর্জাতিক ভাবেও পরিচিত হয়ে উঠে। মরক্কোর অধিবাসী পর্যটক ইবনে বতুতা তাঁর সময়েই বাংলায় আসেন এবং সোনারগাঁয়ে কিছুদিন অবস্থান করেন। যেসব পর্যটকদের বিবরণ হতে বাংলার আদি সমাজ, প্রকৃতি, ইতিহাস সম্পর্কে আজ আমরা মুল্যবান তথ্যাদি জানতে পারি তাদের মধ্যে ইবনে বতুতার সাক্ষ্য অনস্বীকার্য। তিনি চট্টগ্রাম ভ্রমন করেন এবং সিলেটের শাহ্ জালালের সঙ্গে সাক্ষাত করেন এবং তারপর নদী পথে সোনারগাঁয়ে আসেন। অর্থাৎ সোনারগাঁও সংলগ্ন নদী বন্দর সেইসময় গুরুত্বপূর্ণ বানিজ্য কেন্দ্র ছিল বলে অনুধাবন করা যায়। এ নদী বন্দরের পরিবর্তীত স্থানই বর্তমান নারায়ণগঞ্জ।

মোবারক শাহী বংশের পরে ইলিয়াস শাহী বংশ এবং হোসেন শাহী বংশের সুলতানগণ স্বাধীনভাবে বাংলাদেশ শাসন করতে থাকেন। সুলতান ইলিয়াস শাহ ও সিকান্দার শাহ 'হযরত জালাল সোনারগাঁও' থেকে স্বনামে মুদ্রার প্রচলন করেন। তাঁর জীবদ্দশাতেই তাঁর পুত্র গিয়াসউদ্দীন আযম শাহ্ (১৩৮৯-১৪০৯খৃঃ) সোনারগাঁয়ে অবস্থান করেন। তিনি এখান থেকেই রাজ্য শাসন করতেন। গিয়াসউদ্দীন আযম শাহ্'র সোনারগাঁয়ে অবস্থান এ অঞ্চলকে আরও মহিমান্বিত করেছে। তিনি শুধুমাত্র একজন সাধারণ সুলতানই ছিলেন না বরং তার চারিত্রিক মাধূর্য্য, বিদ্যোৎসাহীতা ও ন্যায়পরায়নতার জন্য তিনি বিখ্যাত হয়ে উঠেন। তিনি ফার্সী ভাষায় কবিতা লিখতেন। চীনা সম্রাট ও আযম শাহ এর মধ্যে বেশ কয়েকবার উপহার সামগ্রীসহ শুভেচ্ছা বিনিময় হয়। চীনা পর্যটক মাহুয়ান এ সময় বাংলায় এসেছিলেন। তিনি সোনারগাঁয়ের মসলিন ও সূতি বস্ত্রের উচ্ছসিত প্রশংসা করে গেছেন। সুলতান মক্কা ও মদীনায় সরাইখানা স্থাপন করেন। তাঁর এই সকল কর্মকান্ডের মাধ্যমে সোনারগাঁও এর নাম আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও সুখ্যাতি অর্জন করে। সম্ভবত সুলতান

Dhaka University Institutional Repository

গিয়াসউদ্দীন আযম শাহের নির্মিত সমাধিটি বাংলাদেশে বিদ্যমান মুসলিম স্থাপত্য কীর্তির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন নিদর্শন।

ইলিয়াস শাহী বংশের পরে হোসেন শাহী আমলে রাজধানী পান্ডুয়া চলে যায়। ১৫৩৮ খৃঃ হোসেন শাহী বংশের শেষ অধিপতি সুলতান গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ শাহ'র পতনের মধ্য দিয়েই বাংলার সোনারগাঁয়ের প্রথম স্বাধীন সুলতান ফখরুদ্দীন মোবারক শাহ্ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দুশো বছরের দক্ষিন-পূর্ব বাংলার স্বাধীন রাজত্বের অবসান ঘটে।

এ সময় বাংলার সর্বময় ক্ষমতা চলে যায় আফগান নেতা শের শাহ শুরের হাতে। তবে পূর্ববাংলায় প্রতিষ্ঠিত শের শাহ'র শাসনামল খুব বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। তার প্রতিষ্ঠিত আফগান বংশ (১৫৩৮-১৫৭৫খৃঃ) সোয়া দুই যুগের মত স্থায়ী হয়। শের শাহ বাংলা জয় করলেও মাহমুদ শাহ'র শেষ আশ্রয়স্থল চট্টগ্রাম দখল করতে পারেননি। শের শাহ'র সময়ের মুদ্রাগুলি পান্ডুয়া, সাতগাঁও, শরীফাবাদ, ফতেহাবাদ টাকশাল হতে উৎকীর্ণ হতে দেখা যায়। এই টাকশালগুলি উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গে অবস্থিত। তাই ধারনা করা যায় যে, তিনি সোনারগাঁয়ে অবস্থান করেননি। কিন্তু তার উল্লেখযোগ্য কীর্তি সোনারগাঁও হতে সিন্ধুনদ পর্যন্ত বিস্তৃত প্রায় ৩০০০ কিঃমিঃ দীর্ঘ গ্র্যান্ড ট্রাঙ্করোডের অস্তিত্ব আজও সোনারগাঁয়ের ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করছে।

১৫৭৫ খৃষ্টাব্দের ৩ মার্চ তুকারায়ের যুদ্ধে আফগান বংশীয় শেষ প্রতিনিধি দাউদ খান কররাণীর পরাজয়ের মাধ্যমে বাংলা মুঘল রাজত্বের অধীনে চলে যায়। কিন্তু মধ্য বাংলা হতে বিতাড়িত হওয়ার পরও পরাজিত ও বিক্ষিপ্ত প্রতিশোধ পরায়ন আফগানরা হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হতে শুরু করে। এই প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতায় ১৫৭৫ খৃঃ ১২ জুলাই তারিখে সংঘটিত রাজমহলের যুদ্ধে মুঘল সম্রাট আকবরের সেনাপতি মুনিম খান হাতে দাউদ খান কররানীর পরাজয় ও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বাংলায় আফগান শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে। তবে এই বিজয়ও মুঘলদের জন্য খুব একটা ফলপ্রসূ হয়নি; কেননা মুঘল প্রশাসনের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বাংলাদেশে সম্রাটের প্রভূত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি।

Dhaka University Institutional Repository

পরাজিত ও ক্ষুব্ধ সাহসী দেশপ্রেমিক আফগানরা তাদের হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে। সোনারগাঁওকে ঘাঁটি করে স্থানীয় প্রভাবশালী হিন্দুরাজা, সামন্তরাজ ও জমিদারদের সহায়তায় দীর্ঘদিন তাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে যায়। বস্তুতঃ বাংলার ভৌগলিক ও প্রাকৃতিক অবস্থা কয়েক শতাব্দী ধরে এর স্বাধীন রাজনৈতিক অবস্থা বহাল রাখতে সহায়ক হয়েছিল। উত্তর ভারতের সম্রাটদের পক্ষে হিন্দু ও মুসলিম আমলে এদেশের শাসন কর্তাদের উপর তাদের কর্তৃত্ব রক্ষা করা সম্ভব হতো না। প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতার আশ্রয় নিয়ে এবং ভৌগলিক ও তথাকথিত বৈরী আবহাওয়ার সুযোগে বাংলার শাসনকর্তাগণ সহজেই দিল্লীর অধিপত্য অগ্রাহ্য করে স্বাধীনতা ঘোষনা করতেন। মুঘলরাও বাংলায় ছিল বহিরাগতদের মতো। এজন্য এ অঞ্চলের শাসকরা স্বভাবতঃই তাদের অনুপ্রবেশ সহজ ভাবে নিতে পারেনি। যার ফলশ্রুতিতে স্থানীয় নেতৃস্থানীয় জমিদার বা সামন্ত রাজদের সহায়তা লাভ করতে আফগানদের তেমন বেগ পেতে হয়নি।

সোনারগাঁয়ের ইতিহাস পরিক্রমার এ পর্যায়ে নতুন যে ব্যক্তির উত্থান ঘটে তিনি ছিলেন স্থানীয় বাঙ্গালী জমিদার ঈশা খান। পরাজিত আফগান-কররানীদের সহায়তা দানকারী ঈশা খান ছিলেন সোনারগাঁয়ের জমিদার। মুঘলদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে তাঁকে তাঁর রাজধানী শীতলক্ষ্যার তীরবর্তী খিজিরপুর হতে আরও উত্তরে সরে গিয়ে কাটরাবোতে স্থানান্তারিত করতে হয়। ঈশা খান মসনদ-ই-আলা ছিলেন এ অঞ্চলের দিওয়ান তার সময়ে এটি জনসমাগম পূর্ণ একটি নগরী ছিল। আজ অবধি এটি নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার একটি 'রাজস্ব-উপবিভাগ' বা 'টাপ্পা'। কাট্‌রাব বা কাত্রাভু অঞ্চলটি খিজিরপুর, কদমরসুল হতে বার মাইল উত্তরে অবস্থিত। রূপগঞ্জের মাসুমাবাদ গ্রামে ঈশা খাঁনের বসতবাড়ী 'দিওয়ান বাড়ী'র ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান রয়েছে। রাজনৈতিকভাবে উত্তপ্ত ভাঁটি অঞ্চলের জমিদার ঈশা খান 'বার ভুইঞা' নেতা হিসাবে পরিচিত। বাঙ্গালী জমিদারগন সাফল্যের সাথে মুঘলদের প্রভূত্ব অগ্রাহ্য করে স্ব-স্ব অঞ্চলে স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখেন। ঈশা খানের নেতৃত্বে এই বার ভুইঞাদের মধ্যে যশোরের রাজ্য প্রতাপাদিত্য, শ্রীপুরের চাঁদ রায়

Dhaka University Institutional Repository

ও কেদার রায়, ভাওয়াল জমিদার বাহাদুর গাজী, ত্রিপুরার সোনাগাজী, ভুলুয়ার জমিদার অনন্তমানিক্য, বর্তমানে বাকেরগঞ্জের রাজা কন্দর্প নারায়ণ ও রামচন্দ্র, ময়মনসিংহের ওসমান খান, ফতেহ খান, বীরভূমের মাসুম খান কাবুলী প্রমূখগনের নাম উল্লেখযোগ্য। ঈশা খাঁনের নেতৃত্বাধীন এদের সম্মিলিত শক্তি তার জীবদ্দশায় দেশের বিভিন্ন স্থান হতে বিভিন্ন সময় মুঘল বাহিনীর সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহ চালিয়ে যেতে থাকে। ঈশা খা ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে তার বসতবাড়ী 'কাত্রাভু দুর্গ' মাসুম খান কাবুলীকে ছেড়ে দিয়ে রাজধানী সোনারগাঁয়ে স্থানান্তরিত করেন। ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত মাসুম খান এখানেই- বসবাস করেন। সম্ভবতঃ মাসুম খানই তার নামানুসারে এ অঞ্চলের নামকরণ করেন 'মাসুমাবাদ'। মুঘলদের আক্রমন প্রতিহত করে সাম্রাজ্যকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে একজন বিজ্ঞ সমরবিদের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ঈশা খান শীতলক্ষ্যার উভয় তীর জুড়ে দুর্গ সন্নিবেষ্টিত চৌকির ব্যবস্থা করেন। ঈশা খান ১৫৯৯ সালে পরোলোক গমন করেন। পুত্র মুসা খান তার সাহসী বীর পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। পৈত্রিক সূত্রে তিনি বিশাল জমিদারীর অধিপতি হন। বর্তমান ঢাকার প্রায় অর্ধাংশ, আধুনিক ত্রিপুরারাজ্যের তৎকালীন রাজা রঘুনাথের অধীন সুসং (Sushang) রাজ্য বাদে সম্পূর্ণ ময়মনসিংহ এবং বর্তমান রংপুর,বগুড়া, পাবনা জেলার কিয়দাংশ তাঁর জমিদারীর অংশ ছিল।

১৬০৮ খৃষ্টাব্দে ইসলাম খান চিশ্‌তী সম্রাট জাহাঙ্গীর কর্তৃক বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন। তিনি প্রসিদ্ধ সুফী শেখ সেলিম চিশ্‌তীর পৌত্র ছিলেন। বাংলার রাজধানী ছিল রাজমহলে। ইসলাম খান অত্যন্ত সতর্কতা ও বিচক্ষণতার সাথে বাংলার বিশৃঙ্খলাপূর্ণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন এবং বাংলার রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত করার ঐতিহাসিক পদক্ষেপ গ্রহন করেন। ঢাকা বড় বড় কয়েকটি নদীর যেমনঃ বুড়িগঙ্গা,মেঘনা, শীতলক্ষ্যা, ব্রহ্মপুত্র নদের, তীরবর্তী এবং দ্বন্দ্ব বিদ্রোহের কেন্দ্র হওয়ায় এ অঞ্চল হতেই ভাটি অঞ্চলের বিদ্রোহ দমনে সামরিক বাহিনী পরিচালনায় কার্যকরী ভূমিকা পালন সহজতর হবে বিবেচনায় তিনি এ পদক্ষেপ নেন। ১৬০৭ খৃঃ মুঘল সেনাবাহিনী নিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম খান ঘোড়াঘাটের উদ্দেশ্যে অভিযান শুরু করেন। পথিমধ্যে তিনি নানা অঞ্চলের যথাঃ বালিয়া নদীর তীরবর্তী এলাকা, সাভারের বংশী নদীর নিকটবর্তী ইসলাম খানের মুঘলবাহিনী ঢাকায় প্রবেশ করে ১৬০৮ খৃঃ । মুঘলবাহিনীর এই প্রতিরোধরূপ প্রত্যক্ষ করে মুসা খান কাত্রাভু দুর্গ ত্যাগ করে কিছুটা দক্ষিণ পশ্চিমে সরে যান। মুঘলদেরকে প্রতিহত করার জন্য সংকল্পবদ্ধ হয়ে শেষ প্রচেষ্ট হিসেবে মুসা খান এ সময় শীতলক্ষ্যার তীর ধরে বন্দর, কদমরসুল এবং ডেমরায় তাঁর সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করেন। শীতলক্ষ্যার দক্ষিণ তীরের দাপা ও খিজিরপুর দুর্গ এবং তাঁর রাজধানী সোনারগাঁও এসময় মুঘল রাজধানী ঢাকার অত্যন্ত নিকটবর্তী হয়ে পড়ে। এজন্য মুসা দাপা থেকেও সরে আসেন। সামান্য কিছু আক্রমন প্রতিহত করার পর খিজিরপুর দুর্গও মুঘল সেনাধ্যক্ষ মীর্জা নাথানের হস্তগত হয়। এই সময় মুসা খানের ভাই দাউদ খান কাত্রাভুতে অবস্থান করছিলেন। মীর্জা নাথন ১২, মার্চ ১৬১১ খৃঃ গভীর রাতে কাত্রাভুর অভিজান পরিচালনা করেন। কিন্তু তিনি কাত্রাভু পর্যন্ত পৌছাতে সক্ষম হননি। আক্রমনের দ্বিতীয় পর্যায়ে কদমরসুল প্রায় বিনা বাধায় মীর্জা নাথান বাহিনীর হস্তগত হয়। পরবর্তীতে সেনাপতি ইহতিমাম খান এবং সুবেদার ইসলাম খানের নির্দেশে তিনি পুনরায় 'কাত্রাভু' আক্রমন করেন এবং এবার তিনি মুসা খানের পারিবারিক আবাসস্থল 'কাত্রাভু দুর্গ' একেবারে ধুলিস্মাৎ করে দেন। কিন্তু তা সত্ত্বে তিনি দুর্গস্থল দখল করতে পারেননি। দাউদ এই ধ্বংসাবশেষের মধ্যেও পৈত্রিক গৃহ আকড়ে ধরে ছিলেন। কিন্তু আকস্মিক ভাবে পর্তুগীজ জলদস্যুদের আক্রমনে তিনি নিহত হন। এভাবে দাউদের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মুঘলরা কাত্রাভু'র কর্তৃত্ব নিয়ে নেন। পর পর প্রতিটি সংঘর্ষে পরাজিত হয়ে মুসা খান সম্পূর্ণ ভাবে বিধ্বস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তিনি মুঘল বাহিনীকে প্রতিহত করার কোন চেষ্টাই না করে মেঘনা নদীর বুকে ইব্রাহীমপুর দ্বীপে পালিয়ে যান এবং হাজী শামসুদ্দীন বাগদাদীকে রাজধানী সোনারগাঁয়ের দায়িত্ব অর্পন করে যান। অতপর মুঘল বাহিনী সোনারগাঁও অবরুদ্ধ করলে ভারপ্রাপ্ত শাসনকর্তা হাজী শামসুদ্দীন প্রতিরোধের কোনরূপ চেষ্টা না করে পরাজয় বরণ করে নেন এবং ইসলাম খানের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্বসমর্পন

Dhaka University Institutional Repository

করেন। মুসা খানের পতনের মধ্য দিয়ে সোনারগাঁও এর দীর্ঘ আড়াইশত বছরের বেশী (১৩৩৮-১৬১১খৃঃ) সময়কালব্যাপী গৌরবজ্জ্বল শাসনকালের অবসান ঘটে। এভাবে সম্রাট জাহাঙ্গীরের সুযোগ্য ও বিচক্ষণ সুবাদার ইসলাম খান দীর্ঘ এক বছরের যুদ্ধের পর বার ভুইঞা শিরোমনি মুসা খান সহ অন্যান্য জমিদারদের বশ করেন এবং প্রদেশে মুঘল শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। মুসা ও তার অনুসারীদেরকে নাম মাত্র তাঁদের জায়গীরসমূহ ফিরিয়ে দেয়া হয় প্রকৃত ক্ষমতা মুঘল সেনা বাহিনীর হাতে থাকে। তাদের প্রত্যেককে মুঘলবাহিনীতে যোগদানে বাধ্য করা হয়। মুসা খানের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়। পরাজয়ের পর ১৬২৩ খৃষ্টাব্দে মুসা খান ঢাকায় মৃত্যুবরন করেন। অদ্যাবধি ঢাকার কার্জন হলের সন্নিকটে অবস্থিত মুসা খানের সমাধিটি তার সাহসী জীবনের সাক্ষ্য বহন করছে।

সোনরগাঁও অঞ্চলের পরবর্তী ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য তেমন কোন রাজনৈতিক ঘটনা পরিলক্ষিত হয় না। এক মাত্র মুঘল সুবাদার হিসেবে বাংলায় আগত মীরজুমলারই কিঞ্চিৎ পদধ্বনি শোনা যায় নারায়ণগঞ্জের খিজিরপুর অঞ্চলে। ঢাকা থেকে শাহজাদা শাহ সুজার ক্ষমতা লুপ্ত হওয়ার পর মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব কর্তৃক মীরজুমলা বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন(জুন, ১৬৬০খৃ;)। মীর জুমলা মাত্র তিন বছর বাংলার সুবাদার ছিলেন। এর মধ্যে দেড়বছর তিনি বাংলায় অতিবাহিত করেন বাকী সময় তিনি আসাম ও কুচবিহার অভিযানে ব্যয় করেন। তিনি কুচবিহার জয়ের (ডিসেম্বর, ১৬৬১খৃ:) পরই আসাম রাজা জয়ধ্বজের রাজধানী দখল করে নেন (মার্চ ১৭, ১৬৬২ খৃ:)। আসাম জয়ের অব্যবহিত পরই বর্ষাকাল শুরু হওয়ায় মীর জুমলা অধিকাংশ সময় হাজীগঞ্জেই কাটাতেন। বর্ষাকালে সাম্রাজ্যে জলদস্যুদের আক্রমনের সম্ভাবনা বেড়ে যেত বিধায় এসময়টা তিনি খিজিরপুর দুর্গের ভার নিজেই গ্রহন করতেন। বর্ষাকাল এসে পড়ায় মীরজুমলার মুঘল বাহিনী বেশ সমস্যার সম্মূখীন হয়ে পড়ে। সারা দেশ জলে ডুবে যাওয়ায় মুঘল ঘাঁটিগুলিও পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। স্থানীয় জনগন ও বরাবরের মতো বহিরাগত মুঘলদের সাথে অসহযোগিতা করতে থাকে। যার ফলে মুঘল শিবিরগুলোতে প্রচন্ড খাদ্যাভাব দেখা দেয়। বহু অশ্ব

Dhaka University Institutional Repository

খাদ্যাভাবে মারা যায় এবং সংক্রামক ব্যধি ছড়িয়ে পড়ে এবং বহু সৈন্যও মৃত্যুবরন করে। আসামের বৈরী আবহাওয়া মুঘলদের একবারেই সহ্য হচ্ছিল না। এ সময় মীর জুমলাও বার বার অসুস্থ হয়ে পড়ছিলেন। এ অবস্থায় দিলীর খানের পরামর্শে অহোমরাজ জয়ধ্বজের সাথে একরকম বাধ্য হয়েই অসুস্থ মীর জুমলা সন্ধি করেন। সন্ধির পর মীর জুমলা নৌকাযোগে ঢাকার পথে রওনা হন (জানু ১০,১৬৬৩ খৃঃ)। অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে ঢাকা থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে নারায়ণগঞ্জের খিজিরপুরে তিনি মৃত্যুবরন করেন (মার্চ ৩১, ১৬৬৩ খৃ:)। সৈয়দ মোহম্মদ তৈফুরের মতে, খিজিরপুর মীরজুমলার প্রিয় আবাসস্থল ছিল। আসাম অভিযানের প্রাক্কালে তিনি এখানে তার সমাধি স্থাপনের ব্যবস্থা করেন এবং অভিযানে তার মৃত্যু হলে এখানে তাকে সমাধিস্থ করার নির্দেশ দেন। তাঁর নির্দেশানুযায়ী মৃত্যুর পর তাঁকে খিজিরপুরে সমাধিস্থ করা হয়।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, ইসলাম খান কর্তৃক সোনারগাঁও অধিকৃত হওয়ায় মুসাখানের পতনের সাথে সাথে সোনারগাঁও ও তার গৌরবজ্জ্বল অধ্যায়ের যবনিকাপাত ঘটে। এর পরবর্তীকালের ইতিহাস অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত নারায়ণগঞ্জ অঞ্চলের ইতিহাস সম্মন্ধে সুস্পষ্ট কিছু জানা যায় না। মধ্যবর্তী দেড় শতাব্দী কালের ইতিহাস রচনা করা তাই কষ্টসাধ্য। সমসাময়িক অন্যান্য ঘটনাবলীর সাথে সামঞ্জস্য রেখে ও কিছুটা জনশ্রুতি নির্ভর তথ্যের সংমিশ্রনে এ সময়ের ইতিহাস সম্পর্কে আমরা শুধুমাত্র অনুমান ভিত্তিক ধারণা অর্জন করতে পারি। প্রাচীনকাল হতে সভ্যতার ইতিহাসগুলো পর্যালোচনা করলে আমরা এই সত্যটিই খুঁজে পাই যে, নদী তীরবর্তী ভূমিগুলির প্রচন্ড চাহিদা ছিল, মূলত: এর যোগাযোগের সুবিধার জন্য। একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পারি - বাংলাদেশেও নদীর গতিপথের সাথে তাল মিলিয়ে পূর্ব থেকে ক্রমাগত পশ্চিমে নগরায়ন ঘটেছে। রাজধানী পরিবর্তীত হয়েছে বিক্রমপুর, সোনরগাঁও এবং ঢাকায়।

নারায়ণগঞ্জ বলতে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত কোন শহর গড়ে উঠেনি। ঢাকার দক্ষিণ-পূর্বস্থ নদীর তীরবর্তী অঞ্চল গঙ্গা (পদ্মা), লক্ষ্যা (শীতলক্ষ্যা) এবং ব্রহ্মপুত্র (মেঘনা), এই

Dhaka University Institutional Repository

তিন নদীর মোহনার তীরবর্তী অঞ্চলকে ঘিরেই তখন নগরভিত্তিক কেন্দ্রগুলো গড়ে উঠেছিল। এই সব নদী তীরবর্তী এলাকার মধ্যে কাত্রাভু, খিজিরপুর, হাজীগঞ্জ, সোনাকান্দা, কদমরসুল এবং বন্দরই ছিল মূল শহর। মূল শহরের দক্ষিণাংশের বর্তমান নারায়ণগঞ্জ শহরের তখন কোন অস্তিত্বই ছিল না। ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা ও লক্ষ্যার মোহনার পরিধি তখন পশ্চিমে দেওভোগ থেকে উত্তরে খিজিরপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বাহারিস্থান-ই-গায়বীতে মীর্জা নাথান উল্লেখ করেছেন যে, ইসলাম খানের বাহিনী যখন লক্ষ্যায় প্রবেশ করে, তখন এ নদী খরস্রোতা এবং কোন কোন জায়গায় এর প্রশস্ততা এক মাইলেরও অধিক ছিল। বস্তুত:পক্ষে মীর্জা নাথান কর্তৃক উল্লেখিত এই প্রশস্ত অঞ্চলটিই ছিল তিন নদীর সঙ্গমস্থল। কালক্রমে লক্ষ্যার বিপুল স্রোত বহুলাংশে হ্রাস পায় এবং নদীর প্রশস্ততা কমে আসে; জেগে ওঠে নতুন চরাভূমি। ধীরে ধীরে এই নতুন জেগে ওঠা ভূমিতে গড়ে ওঠে জনবসতি। শুরু হয় নারায়ণগঞ্জের গোড়া পত্তন।

১৭৬৫ সালে বৃটিশ সাম্রাজ্যকালীন রেনেল কর্তৃক চিত্রিত মানচিত্রটি আমাদের ভৌগলিক ইতিহাসের একটি অন্যতম প্রাচীনতম সূত্র বলে বিবেচিত হয়। এই মানচিত্রে আমরা নারায়ণগঞ্জসহ আশে পাশের যে সব এলাকার নাম পাই সেগুলো হলঃ সোনারগাঁও, কদমরসুল, সোনাকান্দা দুর্গ, হাজীগঞ্জ, বন্দর, ফতুল্লা, খিজিরপুর, পাগলাপুল। তাছাড়া বিক্রমপুরের ফিরিঙ্গিবাজার, ও ইদ্রাকপুর দুর্গ এবং ঢাকা জেলার পুরাতন দুর্গ ও পুরাতন ঢাকার উল্লেখ পাই। আধুনিক ঐতিহাসিক আহমদ হাসান দানীর বিবরণ হতে জানা যায়, নারায়ণগঞ্জ শহরের বিপরীতে শীতলক্ষ্যা নদীর পূর্বপাড়ের ' শাহ্ বন্দর' বা 'বন্দর শাহী' ই প্রাথমিক অবস্থায় ছিল সে সময়ের গুরুত্বপূর্ণ আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যবন্দর। হলওয়েল উল্লেখ করেন যে, ১৭৬৫ সালে বন্দরশাহী হতে মোট শুল্ক আদায় হয়েছিল দুকোটি রূপী। জেমস টেইলর এর মতে, বৃটিশ আমলে এসে পূর্বতীরের বন্দরশাহীর প্রাধান্য খর্ব হয়ে যায় এবং শীতলক্ষ্যার পশ্চিম তীরের নতুন জেগে উঠা নারায়ণগঞ্জ বন্দরনগরী হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে ওঠে। উত্তর ভারত থেকে আমদানীকৃত লবণ গঙ্গা যমুনা নদী হয়ে শীতলক্ষ্যা তীরের

Dhaka University Institutional Repository

এই নতুন গঞ্জ এলাকায় ভিড়তে থাকে। এ সময় বৈদেশিক চাহিদার উপর ভিত্তি করে পাট চাষের ব্যাপক প্রসার ঘটে। বড় বড় পাটের গাইট গঞ্জের বিস্তৃত চড়া ভূমির উপর জমা হতে থাকে। এই সময় নারায়নগঞ্জ থেকে পাট বিদেশে রপ্তানী করা হত তাই নারায়নগঞ্জ প্রাচ্যের ডান্ডি হিসেবে পরিচিত ছিল। টেইলরের বর্ননা হতে আরও জানা যায়, নারায়ণগঞ্জ তখন লবন, তৈলবীজ, খাদ্যশস্য, চিনি, ঘি, তামাক, ধাতব পদার্থ, চুন ইত্যাদির বিশাল বাণিজ্য কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। নারায়নগঞ্জ নদীবন্দরের মাধ্যমে চট্রগ্রাম ও ভুলুয়া থেকে বাৎসরিক ৫০,০০০ মন লবণ আমদানী করা হত। এজন্য এখানে বভু পোতাশ্রয় গড়ে উঠেছিল। মগ এবং পূর্বাঞ্চলীয় আরাকান ও আর্মেনীয়দের মতো গ্রীকরাও এখানকার অভ্যন্তরীন বাণিজ্যে নিয়োজিত ছিল। যাদের বংশধরদের অনেকে এখনও নারায়ণগঞ্জের লবন ব্যবসার সাথে জড়িত রয়েছে। এসময় নারায়ণগঞ্জ বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করে। চীনা ব্যবসায়ীরাও এখানে সুপারি, চিনি, তামাক ও বিভিন্ন ধরণের উৎপাদিত দ্রব্যাদির পরিবর্তে তুলা, গোলপাতা, সোনা ও রূপা বিনিময় করতো। সোনরগাঁয়ের কার্পাস তুলা এসময় ভারতের বিভিন্ন স্থানে রপ্তানী হত। এখানকার মসলিন বিশ্বব্যাপী সুখ্যাতি অর্জন করে। প্রকৃতপক্ষে মুঘলামলে রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরিত করার ফলে এখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থারও উন্নতি ঘটে। ইংরেজ আমলে এই যোগাযোগ ব্যবস্থার আরও উন্নতি সাধিত হলে স্বভাবতই এই অঞ্চলের ব্যবসা- বাণিজ্যের প্রসার ঘটে এবং পূর্বপাড়ের এলাকার গুরুত্ব হ্রাস পেতে থাকে। ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প-কারখানার দ্রুত প্রসারের ফলে নারায়ণগঞ্জ এলাকা ঘনবসতিপূর্ণ বন্দর নগরীতে পরিনত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নারায়ণগঞ্জে পাঁচটি থানা গড়ে ওঠে; যথা:-বইদ্যার বাজার, নরসিংদী, রায়পুরা, আড়াইহাজার ও বন্দর।

১৮৬০ সালে বৃটিশ সরকার কর্তৃক ৪৩ নং অধ্যাদেশ অনুযায়ী Small Cause Court আইন প্রবর্তিত হয়। এই আইন প্রবর্তনের ধারাবাহিকতায় ১৮৬৩ সাল থেকে নারায়ণগঞ্জ শহরে নির্দিষ্ট মেয়াদ অন্তর বিচার বিভাগের কার্যাবলী সমাধা হতে শুরু করে।

Dhaka University Institutional Repository

যার ফলে নগরায়নের ক্ষেত্রে এ অঞ্চলের আরো প্রসার ঘটে। ইতোমধ্যে গড়াই নদীর গতির পরিবর্তন হেতু ১৮৭১ সালে পূর্ব বাংলা রেলওয়ে গোয়ালন্দ তার স্থান পরিবর্তন করে। ফলে ঢাকা কলকাতার স্টীমারে ও রেলপথে নারায়ণগঞ্জ ভায়া হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। ১৮৮৫ সাল ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রেল লাইন স্থাপিত হওয়ার পরে অবিভক্ত বাংলার সারা ভারতবর্ষের সাথে শহরের যোগাযোগ সহজতর হয়ে ওঠে এবং বাণিজ্য কেন্দ্ররূপে নারায়ণগঞ্জ শহরের দ্রুত অগ্রগতি ঘটতে শুরু করে য়ার উন্নয়নের স্রোতধারায় আজকের এই তীব্র জনবসতিপূর্ণ গমগমে শহর নারায়ণগঞ্জের উৎপত্তি। এই নারায়ণগঞ্জের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটায় নারায়ণগঞ্জ শহর ১৯৮৪ সালে একটি পরিপূর্ণ জেলার স্বীকৃতি অর্জন করেছে। এই প্রাচীন ও ঐতিহাসিক বন্দরনগরীটির ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখতে নারায়ণগঞ্জবাসীর আন্তরিক প্রচেষ্টার প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

টীকা ও তথ্য নির্দেশ

১) মানচিত্র নং - ২

২) গোস্বামী, করুণাময় ও অন্যান্য (সম্পাদিত)। ***নারায়নগঞ্জের ইতিহাস,*** জেলা প্রশাসন ও সুধীজন পাঠাগার, নারায়নগঞ্জ, পৃ. ১৫

৩) ঐ, পৃ. ১৫

৪) ঐ, পৃ. ৭

৫) *ঐ, পৃ. ৭*

৬) ঐ, পৃ. ১৯

৭) ঐ, পৃ. ১

৮) মজুমদার, রমেশ চন্দ্র। ***বাংলাদেশের ইতিহাস,*** জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ-৭

৯) পূর্ববঙ্গ, বঙ্গ ও সমতট বলতে ঐতিহাসিকরা এ বঙ্গ অঞ্চলকে বুঝিয়েছেন।

১০) গুপ্ত, যোগেন্দ্রনাথ। ***বিক্রমপুরের ইতিহাস,*** কলিকাতা, ভট্টাচার্য এন্ড সন্স প্রকাশনী, ১৯৯৮, পৃ. ১

১১) করিম, আব্দুল। ***প্রাগুক্ত,*** পৃ. ৩৯৯

১২) গুপ্ত, যোগেন্দ্রনাথ। ***প্রাগুক্ত,*** পৃ. ১৬৮

১৩) করিম, রেজাউল (সম্পাদিত)। ***সোনারগাঁয়ের ইতিহাস উৎস ও উপাদান,*** ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৩৪৯

১৪) ঐ, পৃ-৩৪৯

১৫) ঐ, পৃ. ৩৯১

১৬) ঐ, পৃ. ৩৯২

Dhaka University Institutional Repository

১৭) Ahmed, Nazimuddin. ***Discover the Monuments of Bangladesh***, UPL, Dhaka, 1984, p.153

১৮) করিম, রেজাউল (সম্পাদিত)। ***প্রাগুক্ত,*** পৃ. ৩৫০

১৯) Karim, Abdul. ***Corpus of the Muslims Coins of Bengal***, p. 26-27

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়
নারায়ণগঞ্জের ভৌগলিক অবস্থান ও পরিবেশ

পরিবর্তনশীলতা সৃষ্টিতত্ত্বের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য। প্রাকৃতিক কারনে এ ভূ-পৃষ্ঠের, বায়ুমন্ডল এবং বারিমন্ডলে অহরহ পরিবর্তিত হয়েছে। কখনো পর্বত ও মালভূমি সমভূমিতে আবার সমতলভূমি কিংবা জলমগ্ন সমুদ্রতল উঁচু ভূমিতে পরিনত হয়েছে। এই পরিবর্তনের ধারা আবহমান কাল ধরে চলছে। বহুলবিদদের মতে, বর্তমান বাংলাদেশ ছিল এককালে সমুদ্রের নীচে। একথা অনস্বীকার্য যে, ভূ-পৃষ্ঠের কোন অঞ্চল বা দেশের ইতিহাস সেই অঞ্চল বা দেশের ভৌগলিক অবস্থান, ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ুর উপর স্বভাবত:ই নির্ভরশীল। আর সে কারনেই কোন অঞ্চলের ইতিহাস সম্বন্ধে জানতে হলে সেই অঞ্চলের ভৌগলিক অবস্থান, ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ু জানা অতি প্রয়োজন[১]। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, প্রাচীন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল নদী নির্ভর এলাকায়। আর সে কারনেই বাংলাদেশের সভ্যতা গড়ে উঠেছে নদী নির্ভর করে এবং বাংলাদেশকে বলা হয় নদীমাতৃক দেশ। বর্তমান বাংলাদেশের এই সমতল ভূ-খন্ড কোন সময়ে গঠিত হয়েছিল তা সঠিক ভাবে বলা না গেলেও বাংলাদেশ প্রধানত পলিমাটির দেশ এবং সেই জন্য উপমহাদেশের অন্যান্য অংশের তুলনায় বয়সে নবীন বলা যায়। নবীন হওয়া সত্ত্বেও প্রাচীনকাল হতেই বাংলাদেশের অনেক অঞ্চলই শাসকদের মনোযোগ আকর্ষন করেছিল। ভূমির গঠন অনুযায়ী বাংলাদেশের ভূমিকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথমত: পাহাড়ী এলাকা, দ্বিতীয়ত: প্লাইস্টোসিন যুগের সোপান ভূমি এবং সাম্প্রতিক কালের প্লাবন ভূমি। নারায়ণগঞ্জের প্রায় সামগ্র এলাকাই প্লাবন সমভূমির অন্তর্ভুক্ত। এই নবীন সমতল ভূখন্ডের দক্ষিণ পূর্বগাঙ্গেয় ব-দ্বীপটি সম্ভবত আরও নবীন। এই ব-দ্বীপেরই প্রায় কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ঐতিহাসিক নারায়ণগঞ্জ জেলা।

Dhaka University Institutional Repository

অবস্থান

বর্তমান নারায়ণগঞ্জ জেলা বৃটিশ আমলের পূর্ববাংলা- আসাম প্রদেশের ঢাকা জেলার উত্তর পূর্ব মহকুমা। এর অবস্থান ২৩°৩৪´ হতে ২৪° ১৫´ উত্তর অক্ষাংশ ও ৯০° ২৭´ হতে ৯০° ৫৯´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে।[২] বাংলাদেশর রাজধানী ঢাকার মাত্র দশ মাইল দূরে নারায়নগঞ্জ অবস্থিত। নারায়ণগঞ্জের সর্ব উত্তরে গাজীপুর জেলা দক্ষিণে মুন্সিগঞ্জ ও কুমিল্লা জেলা পূর্বে নরসিংদী ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা এবং পশ্চিমে ঢাকা জেলা। নারায়ণগঞ্জ জেলাটি নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলা, আড়াই হাজার উপজেলা, সোনারগাঁ উপজেলা, বন্দর উপজেলা এবং রূপগঞ্জ উপজেলা অর্থাৎ মোট ৫টি উপজেলা, ৪৯টি ইউনিয়ন, ৮৮১টি মৌজা এবং ১৪৭৯টি গ্রাম নিয়ে গঠিত। এই জেলার মোট আয়তন ৭৫৯.৫৭ বর্গ কি:মি:। জেলার মোট জনসংখ্যা ১৭,৫৮,৮০৪ জন এবং শিক্ষিতের হার ৪৫.৪%।[৩]

নারায়ণগঞ্জকে মোটামুটি সমতল বলা যায় এবং এর ভূ-ভাগের কোথায়ও উচ্চভূমি নেই। কোন কোন স্থানে লাল মাটি বাদে বাকি এলাকার ভূমি পলিমাটি। নারায়ণগঞ্জ জেলার উত্তরাঞ্চল বিশেষ করে মধুপুর গড়ের নিম্নভূমি থেকে শুরু করে কিছু অঞ্চল লাল মাটি দ্বারা গঠিত। উত্তরে শীতলক্ষ্যা নদীর উৎস থেকে লাল মাটি ঢাকা শহরের কিছু অঞ্চলসহ নারায়ণগঞ্জে বিস্তৃত। বর্তমানে নারায়ণগঞ্জ শহরে লাল মাটি খুজে পাওয়া দুস্কর। কারন নারায়ণগঞ্জের নিম্নাঞ্চল ভরাট করার প্রক্রিয়ায় লালমাটি স্তর ভূ-ত্বকের নীচে চলে গেছে।

সীমানা

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম একটি ব-দ্বীপ। নারায়ণগঞ্জ জেলাটিও একটি ছোট ব-দ্বীপ। এই ব-দ্বীপ অঞ্চলটিকে ঘিরে রয়েছে জালের মতো অসংখ্য নদ-নদী। এই নদ-নদীগুলো এই অঞ্চলের ভূমি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাংলার নগর প্রধানত দুইটি বৈশিষ্ট্য যথা প্রশাসনিক কেন্দ্র ও বাণিজ্য কেন্দ্র নিয়ে গড়ে উঠে। স্বাভাবিকভাবে সোনারগাঁও এই দুইটি বৈশিষ্ট্য ধারণ করেই গড়ে উঠেছিল। পরবর্তীতে রাজনৈতিক ক্ষমতার হস্তান্তর ছাড়াও নদীর গতিপথ পরিবর্তন সোনারগাঁয়ের

Dhaka University Institutional Repository

পতনের কারন বলে প্রতীয়মান হয়। পরবর্তীতে বর্তমান নারায়ণগঞ্জ শহর মূলত গড়ে উঠে নদীর চরের উপর। বর্তমানে নারায়ণগঞ্জ জেলার উত্তর দিক ব্যতীত বাকী তিনদিকেই নদী পরিবেষ্টিত। দক্ষিণ দিকে ধলেশ্বরী ও মেঘনা নদী পূর্ব দিকে মেঘনা নদী, পশ্চিম দিকে বুড়িগঙ্গা ও বালু নদী। নারায়ণগঞ্জের বুক চিরে পশ্চিম-দক্ষিণ দিকে শীতলক্ষ্যা নদী এবং পূর্ব-দক্ষিণ দিকে ব্রহ্মপুত্র নদ প্রবাহিত। নারায়ণগঞ্জ তথা সোনারগাঁয়ের ভৌগলিক অবস্থানের সুবিধাগত দিক এর সাথে বহির্বিশ্বের ও উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে যোগাযোগের পথ উন্মোচিত করেছিল।[৪]

বিস্তীর্ণ নারায়ণগঞ্জ জেলার নদীগুলোর মধ্যে মূলত বর্তমানে পদ্মা, করতোয়া, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা । গঙ্গা নদী রাজমহলের মধ্য দিয়ে বৃহৎ বাংলায় প্রবেশ করার পর প্রাচীন গৌড় নগর থেকে পঁচিশ মাইল দক্ষিণে ভাগীরথী ও পদ্মা নদী নামে দুইভাগে বিভক্ত হয়েছে। ভাগীরথী সরাসরি দক্ষিণে "রাঢ়" অঞ্চলের ভিতর প্রবাহিত।[৫] এই রাঢ়েই সুলতানী আমলের সাতগাঁও অবস্থিত। গঙ্গার অপর শাখা পদ্মা দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে আরও বিভক্ত হয়ে ধলেশ্বরী বুড়ীগঙ্গা নামে নারায়ণগঞ্জ জেলার দক্ষিণ এবং পশ্চিম দিকে প্রবাহিত। বুড়িগঙ্গা শীতলক্ষ্যার সাথে ও ব্রহ্মপুত্র মেঘনার সাথে মিলিত হয়ে দক্ষিণে এগিয়ে আবারও ধলেশ্বরীর সাথে মিশেছে চাঁদপুরে। এই মিলিত ধারা আরও দক্ষিণে সমুদ্রে মিশে গেছে। এই ধলেশ্বরী ও মেঘনার মিলিত ধারার তীরে ১৫৮৪ খৃঃ শ্রীপুর বন্দরের অবস্থান ছিল। আজ সেখানে এই নামে কোন স্থান নেই। আবার এই নদীর পশ্চিম তীরে অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র মেঘনার তীরে ১৩৪৫ খৃঃ এক বড় বন্দর বর্তমান নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁ নামে পরিচিত ছিল।[৬] আজ সেখানে কোন জাহাজ চলাচল করতে পারে না। ১৭৮৭ সালের নদী ধারা পরিবর্তনের মাধ্যমে ব্রহ্মপুত্র তার নতুন গতিপথে এগিয়ে যায়। এর প্রবাহ বর্তমান যমুনার ধারায় প্রবাহিত হয়ে গোয়ালন্দের নিকটে পদ্মার সাথে মিশেছে। সোনারগাঁয়ের ব্রহ্মপুত্র শুকিয়ে গেছে। এর এক শাখা শীতলক্ষ্যা নামে নারায়ণগঞ্জের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। ব্রহ্মপুত্র মধুপুরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে নানা শাখায় আজ বিভক্ত। মূল শাখা ভৈরব বাজারের

Dhaka University Institutional Repository

নিকট মেঘনা নদীর সাথে মিলিত হয়ে মেঘনা নামে দক্ষিণে প্রবাহিত। অন্যদিকে পদ্মা নদী নানা শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে মধুমতি, গড়াই, কুমার, ভৈরব নামে দক্ষিণে প্রবাহিত। এই ভৈরব নদী তীরে পঞ্চদশ শতকে খান জাহানের সীমান্ত শহর গড়ে উঠেছিল। ষোড়শ শতকে এই শহর 'খলিফাতাবাদ' নামে পরিচিত হয়ে উঠে। বর্তমান যমুনা, পদ্মা, ভৈরব, করতোয়া নদী ব্রহ্মপুত্র নদের মধ্যবর্তী স্থানই প্রাচীন বঙ্গের ও উপবঙ্গের ভূখন্ড এর উত্তরে কামরূপ কামতা রাজ্য দক্ষিণে সমুদ্র। এই বঙ্গ রাজ্যই সুলতানী আমলের সোনারগাঁ।[৭] এর মধ্য দিয়ে ব্রহ্মপুত্র নদ প্রবাহিত। এর তীরবর্তী পঞ্চমীঘাট, লাঙ্গলবন্দ নামক হিন্দু তীর্থস্থান আজও সকলের নিকট পরিচিত।[৮] এই নদীই প্রাচীনকাল থেকে দক্ষিণ বঙ্গ ও উত্তর বঙ্গের যোগাযোগ ব্যবস্থা অব্যাহত রেখেছে। এর অসংখ্য শাখা প্রশাখার তীরে বহু বন্দর নগর ও হাট গড়ে উঠেছে।

সোনারগাঁ রাজধানী এলাকা সম্ভবত: শীতলক্ষ্য নদীর পূর্বতীরে এবং ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিম তীরে অবস্থিত ছিল।[৯] প্রাদেশিক শাসকদের আবাসস্থল পঞ্চমীঘাট ও লাঙ্গলবন্দের নিকটে কুসির-আমরা নামক স্থানে হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী।[১০] প্রাথমিক বিজয়ের পরে মুঘলমানরা সাধারনত: নদী তীরে তীর্থস্থানগুলোতেই যাতায়াত ও বসবাসের সুবিধার জন্য বাসস্থান গড়ে তুলতেন। তাদের আবাস স্থল 'কুসাইর উমার বা কাসরা' বলা হত। 'কুসির আমরা' গ্রামটি কুসাইর উমারার বিকৃতরূপ বলে মনে হয় এবং এভাবেই মানচিত্রে বর্তমানে লিখিত হয়েছে।[১১] ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিমতীরে ও শীতলক্ষ্যা নদীর পূর্বতীরে রাজধানী শহরের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে পুরাতন বাণিজ্য কেন্দ্রে এক বন্দর নগরী গড়ে উঠেছিল। এখন সে স্থান বন্দর নামে পরিচিত। এই স্থান বর্তমান নারায়ণগঞ্জ শহরের বিপরীতে শীতলক্ষ্যার পূর্ব তীরে অবস্থিত। হাজি বাবা সালেহ এক সময় বন্দর নগরীর শাসক ছিলেন।[১২] তাঁর নির্মিত বেশ কয়েকটি ইমারত এখনও এখানে বিদ্যমান। মুঘল আমলে এখানে সোনাকান্দা দুর্গ তৈরী করা হয়েছে। এই নদীগুলো ছাড়াও নারায়ণগঞ্জ জেলায় রয়েছে অসংখ্য খাল-বিল। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সোনারগাঁয়ে অবস্থিত মেনিখালি খাল এবং ত্রিমোহনী ও

Dhaka University Institutional Repository

ত্রিবেনী খাল যা নারায়ণগঞ্জের নৌ-পরিবহনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ঢাকার ধোলাই খাল ডেমড়ায় বালু নদীর সাথে যুক্ত ছিল।[১৩]

আবহাওয়া

নারায়ণগঞ্জের আবহাওয়া মোটামুটি সমভাবাপন্ন। গরম ও শীত কালে গড় তাপমাত্রা ব্যবধান মাত্র ১৭°৫ ফা:। নভেম্বরে শীত শুরু, স্থায়িত্ব প্রায় ৪ (চার) মাস এবং জানুয়ারী মাসেই শীত বেশী পরিলক্ষিত হয়। মার্চ মাস থেকে গরম শুরু হয় এবং সেপ্টেম্বরের শেষাংশ থেকে অক্টোবর পর্যন্ত আবহাওয়া উষ্ণ থাকে। নারায়ণগঞ্জের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমান ৭২ইঞ্চি।[১৪]

অর্থনৈতিক অবস্থা

অতিপ্রাচীন কাল থেকেই নারায়ণগঞ্জ ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সমগ্র বঙ্গদেশ অঞ্চলে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। পাট-পাটজাত দ্রব্য, সুতা ও সুতীবস্ত্র এবং হোসিয়ারী শিল্পের জন্য এই শহরের আন্তর্জাতিক খ্যাতি সর্বজনবিদিত। সুদূর অতীতকাল থেকে এ বন্দর নগরী বিশ্ববাজারে বেশীরভাগ পাটের চাহিদা মিটিয়ে অজস্র মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। এ জন্য এ শহরকে প্রাচ্যের ড্যান্ডী বলে অভিহিত করা হতো।

আজকের নারায়ণগঞ্জ শীতলক্ষ্যার উভয় তীরে অবস্থিত হলেও এর পশ্চিম তীরই সব দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ দেখা যায়। কিন্তু অতীতের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, সোনারগাঁও তথা নারায়ণগঞ্জে সর্বপ্রথম অষ্ট্রিক এবং আর্য জাতির পদচিহ্ন পড়েছিল। কালিকাপুরাণে ব্রম্মপুত্রের অববাহিকায় যে আর্য এবং দ্রাবিড় গোষ্ঠির পদচারনা ছিল তা অনেক ঐতিহাসিকই স্বীকার করেছেন। তাদের মূলত পেশা ছিল শিকার এবং কৃষিকাজ করা। ব্যবসা বানিজ্যের তাগিদে সোনারগাঁ প্রাচীন বঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য বন্দর হিসেবেই পরিগনিত ছিল। বিভিন্ন ঐতিহাসিকের বর্ণনায় দেখা যায় পাল যুগে বাংলার মানুষের প্রধান আয়ের পথ ছিল ব্যবসা করা। কিন্তু তাম্রলিপ্ত বন্দরের বানিজ্য হ্রাস পাওয়ার সাথে সাথে বাংলার মানুষও কৃষিকার্যে ঝুকল। সুলতানী শাসকদের আমলে যখন সোনারগাঁও ছিল দক্ষিন-পূর্ব বাংলার রাজধানী তখন শীতলক্ষ্যার পূর্বপাড় অর্থাৎ কদমরসুল, বন্দর ও মদনগঞ্জ

Dhaka University Institutional Repository

এলাকাই ছিল ব্যবসা ও বাণিজ্যের জন্য সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী। এ সময় মরক্কোর বিখ্যাত পরিব্রাজক ইবনে বতুতা সোনারগাঁও ভ্রমন করেন। তিনি এখানে বহুদিন অবস্থান করে এখানকার সবকিছুর সাথে আন্তরিকভাবে পরিচিত হয়েছিলেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, সোনারগাঁ নগরীতে উপস্থিত হয়ে তৎকালীন বাণিজ্যিক এলাকা বন্দরে শীতলক্ষ্যার তীরে জাভা দ্বীপে গমনোদ্যত বাণিজ্য তরী দেখতে পান।[১৫] তার এ বর্ণনা থেকে শীতলক্ষ্যা অঞ্চলের বাণিজ্যিক প্রসারের একটা বিশদ ধারণা করা যায়। আর এসব বাণিজ্যতরী মসলিনের জন্যই ভিড় করত। তাছাড়া বিভিন্ন উৎপন্ন খাদ্য শষ্য এ বন্দর দিয়ে প্রচুর পরিমাণ রপ্তানী হত। এ বন্দর দিয়ে পরবর্তী কয়েক শতাব্দী ধরে নানা দেশে বিভিন্ন পণ্য দ্রব্যাদি প্রেরিত হত। সুপ্রসিদ্ধ ভ্রমনকারী রালফফিচ উল্লেখ করেন যে, সোনারগাঁয়ে ভারতবর্ষের সর্বোৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রস্তুত হতো[১৬]। আবুল ফজল তদীয় আইন -ই- আকবরী গ্রন্থে সোনারগাঁয়ের মসলিন ব্যবসা ও শীতলক্ষ্যা তীরের বাণিজ্য বন্দর এর কথা উল্লেখ করেছেন। এতে আজকের নারায়ণগঞ্জ মসলিন রপ্তানীর প্রাচীনতম বন্দর ছিল এটাই অনুমেয় হয়। শীতলক্ষ্যার পশ্চিম পাড় ব্যবসা কেন্দ্র হিসাবে জমে উঠে মীরজুমলার সময় থেকে। তার সময়ই ১৬৬৩ খৃঃ খিজিরপুর থেকে দাপা (ফতুল্লা) এবং পাগলাপুল হয়ে জাহাঙ্গীর নগরের সঙ্গে খিজিরপুর, হাজীগঞ্জ ও খানপুর এলাকার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। শায়েস্তাখাঁর আমলে শীতলক্ষ্যার উভয় তীরই ব্যবসা কেন্দ্র হিসাবে সম্প্রসারিত হয়।

ইংরেজ বেনিয়াদের আগমনের পূর্বেই বন্দর, খিজিরপুর প্রভৃতি বাজারসমূহ জমজমাট হয়ে উঠেছিল। পশ্চিম তীরে বিভিন্ন গুদাম নির্মিত হয়ে ছিল। ঢাকায় ইংরেজদের ব্যবসা কেন্দ্র স্থাপনের সংগে সংগে শীতলক্ষ্যার পশ্চিম তীরের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। ঢাকার সাথে সহজ যোগাযোগ পশ্চিম তীরেই ছিল বেশী। তাই পশ্চিম পাড়ের বাজার এলাকাগুলি রাতারাতি উন্নতি লাভ করতে থাকে। ১৯৭১ খৃঃ থেকে ১৯৪৭ খৃঃ পর্যন্ত নারায়ণগঞ্জ পাট ব্যবসা একচেটিয়া ভাবে চালিয়ে গেছেন। ১৯৭৫ খৃঃ নারায়ণগঞ্জের বাজারে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা হয়। দেখা গেল নারায়ণগঞ্জ থেকে পাটের বাজার ক্রমশঃ খুলনা, দৌলতপুরে চলে যেতে থাকে নারায়ণগঞ্জ আবার পাটবিহীন স্থবির শহর হয়ে যায় এবং কোন কর্মচাঞ্চল্য থাকে না।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

টীকা ও তথ্য নির্দেশ

১) ফারুক, এম, এম, আল (সম্পা.), *ঝিনাইদহের ইতিহাস,* ঝিনাইদহ, ১৯৯১, পৃ. ১

২) গোস্বামী, করুণাময় ও অন্যান্য (সম্পাদিত)। *নারায়নগঞ্জের ইতিহাস,* জেলা প্রশাসন ও সুধীজন পাঠাগার, নারায়নগঞ্জ, পৃ, ১৪

৩) ম্যাপ নং ৩

৪) করিম, রেজাউল (সম্পাদিত)। *সোনার গাঁয়ের ইতিহাস উৎস ও উপাদান,* ঢাকা, রহমান গ্রপ অব ইন্ডাষ্ট্রিজ, ১৯৯৩, পৃ. ৩৫

৫) ঐ

৬) মানচিত্র ২

৭) রায়, নীহাররঞ্জন। *বঙ্গের নদ-নদী,* কলিকাতা, ১৯৫৮, পৃ. ৭৩

৮) করিম, রেজাউল (সম্পাদিত)। *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩৫৩

৯) ঐ, পৃ. ৩৫৪

১০) ঐ, পৃ. ৩৫৪

১১) ম্যাপ নং ৩

১২) Ahmed, Shamsuddin. ***Inscriptions of Bengal,*** Vol - iv, Rajshahi, 1960, p . 48

১৩) গোস্বামী, করুণাময় ও অন্যান্য (সম্পাদিত)। *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৫

১৪) ঐ, পৃ. ১৬

১৫) চৌধুরী, শামসুদ্দোহা। *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৪০৯

১৬) গোস্বামী, করুণাময় ও অন্যান্য (সম্পাদিত)। *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২৩৫

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়
নারায়ণগঞ্জের স্থাপত্যিক বিবরন

সোনারগাঁ যেহেতু প্রাক মুসলিম, সুলতানী, মুঘল এবং ঔপনিবেশিক আমলে তাঁর প্রাধান্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল তাই এ অঞ্চলে আমরা তিন আমলের স্থাপত্যকীর্তির সন্ধান পাই। কালের বিবর্তনে সেগুলি ধ্বংসস্তুপে পরিনত হয়। নারায়ণগঞ্জের সর্বত্রই প্রাচীন স্থাপত্যকীর্তি সমূহের ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। প্রাকৃতিক ধ্বংসলীলা ছাড়াও অনেক ইমারতের ধ্বংসাবশেসের উপর বর্তমান কালের জনবসতি গড়ে উঠায় বা ধ্বংসস্তুপের ইট দ্বারা অনেকে অন্যত্র বাড়ীঘর নির্মাণ করার ফলে এখানকার অনেক স্থাপত্য নিদর্শনই আজ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তবুও এসব ধ্বংসস্তুপ এবং ধ্বংসস্তুপ সম্পর্কিত স্থানীয় জনশ্রুতি ঐতিহাসিকভাবে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ববিভাগ কিছু ধ্বংসপ্রাপ্ত ইমারত সংস্কার করেছে। ইমারতগুলির বেশীর ভাগই মসজিদ। এছাড়া রয়েছে দুর্গ, পুল বা সেতু, সমাধি , নহবতখানা, চিল্লাকোঠা ইত্যাদি। এসব স্থাপত্যের সাথে বাংলার সুলতানী ও মুঘল আমলের অন্যান্য স্থাপত্যের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে নারায়ণগঞ্জের বিদ্যমান স্থাপত্যকীর্তি তিন ভাগে ভাগ করা যায়:

১. সুলতানী আমলের স্থাপত্য

২. মুঘল আমলের স্থাপত্য

৩. ঔপনিবেশিক আমলের স্থাপত্য

Dhaka University Institutional Repository

(ক) সুলতানী আমলের স্থাপত্য

সুলতানী আমল বলতে সাধারণত বাংলায় মুসলিমদের বিজয়ের পর থেকে ১৫৭৬খৃঃ পর্যন্ত বুঝায়। কিন্তু নারায়ণগঞ্জের ইতিহাস যদিও এর পূর্ব থেকে শুরু হয়েছে তথাপি এখানে পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বের কোন স্থাপত্য দৃষ্টিগোচর হয় নাই। এখানে এক মাত্র গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ নির্মিত সমাধি ব্যতীত সুলতানী আমলে মসজিদ স্থাপত্যের সন্ধানই বেশী পাই। এই মসজিদগুলোতে সুলতানী আমলের স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য প্রায় নেই বললেই চলে। কেননা এই স্থাপত্য সমূহের উপাদান তেমন টেকসই ছিল না। পাথরের অপ্রতুলতা হেতু এ অঞ্চলের স্থাপত্য সমূহ শুধু মাত্র ইট, শুরকী ও চুন দিয়ে তৈরী করা হয়েছে। বর্তমানে সব ইমরাতই ভেঙে পড়েছে স্থানীয় সংস্কারকারীদের দ্বারা সংস্কার হওয়ায় অনেক ইমরতেরই আদি বৈশিষ্ট বিকৃত হয়েগেছে। তাই অনেক ইমারত সুলতানী আমলের হওয়া সত্ত্বেও সেগুলো দেখে এর আদি নির্মাণ কাল বুঝার উপায় নেই। নিম্নে তৎকালীন স্থাপত্যের বিবরণ দেয়া হল :

Dhaka University Institutional Repository

মুয়াজ্জমপুর শাহী জামে মসজিদ

ঢাকা চট্টগ্রাম মহা সড়কে মোগরা পাড়া বাসষ্টান্ড হতে পূর্ব দিকে সোনারগাঁ থানার জামপুর ইউনিয়নে মহজমপুর গ্রামে মুয়াজ্জমপুর শাহী জামে মসজিদটি অবস্থিত। বস্তুত: এই মসজিদকে একটি কমপ্লেক্স বলা যায় কেননা এখানে পশ্চিম দিকে একটি মসজিদ, পূর্ব দিকে কুয়া (বর্তমানে ব্যবহার যোগ্য) এবং শাহ লঙ্গরের (শাহ আলমের) সমাধি দক্ষিণ দিকে কবরস্থান ও উত্তর দিকে প্রবেশ তোরণ মিনার এবং একটি পুরাতন কুয়া রয়েছে।

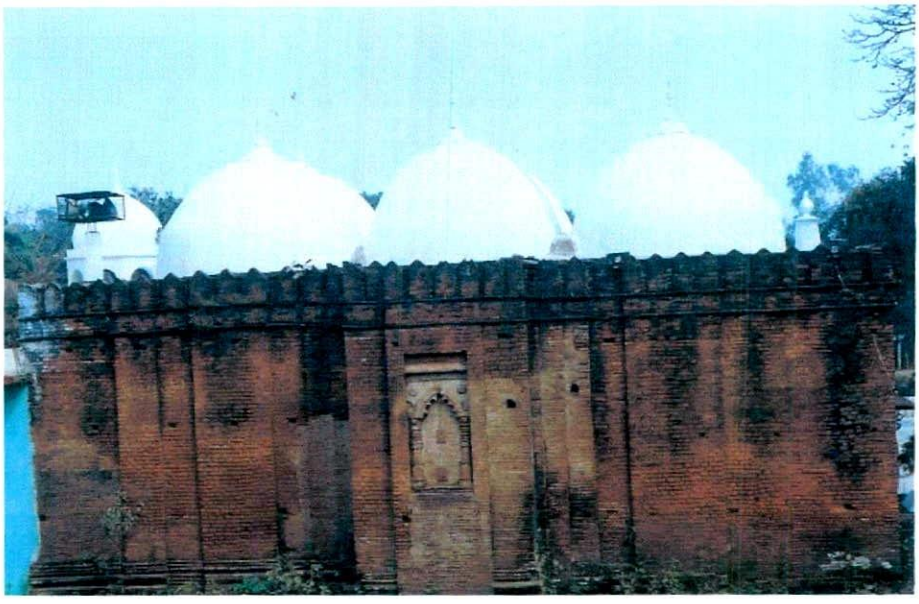

চিত্র নং- ১ মুয়াজ্জমপুর শাহী জামে মসজিদের পশ্চাৎ দেয়াল

গঠন প্রনালী ও ভূমি নকশা

মুয়াজ্জমপুর শাহী জামে মসজিদটি এ অঞ্চলের সর্ববৃহৎ আকৃতির এক মাত্র ছয় গম্বুজ সম্বলিত একটি আয়তাকার মসজিদ।[১] এ মসজিদের বহির্ভাগের পরিমাপ উত্তর ও দক্ষিণে ১২.৯৭ মিটার এবং পূর্ব ও পশ্চিমে ৯.৩০ মিটার। দেয়ালের পুরুত্ব ১.৬৭ মিটার। অভ্যন্তরের পরিমাপ উত্তর ও দক্ষিণে ৯.৫৭ মিটার এবং পূর্ব ও পশ্চিমে ৮.০৫ মিটার।[২]

Dhaka University Institutional Repository

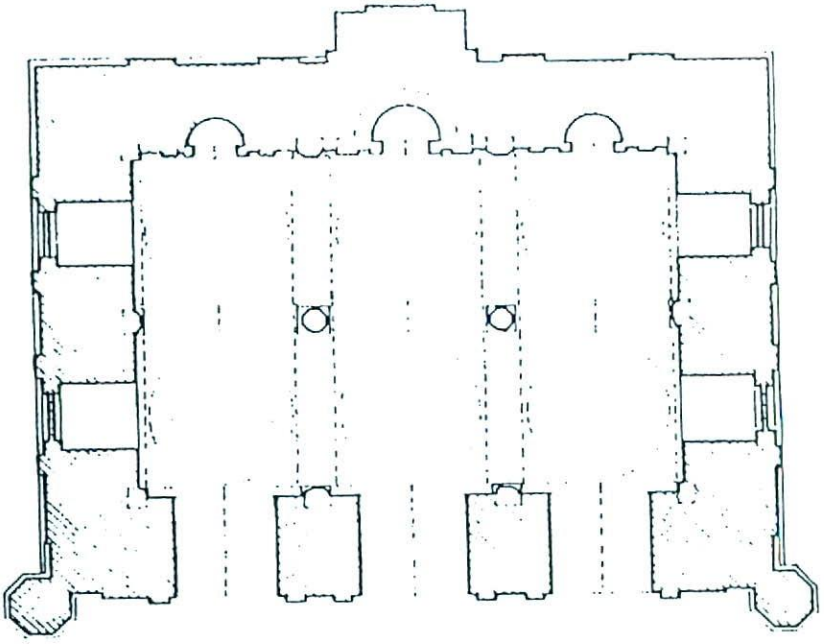

মুয়াজ্জমপুর শাহী মসজিদ

ভূমিনকশা - ১

Dhaka University Institutional Repository

প্রার্থনাগৃহে প্রবেশের জন্য পূর্ব দিকের দেয়ালে তিনটি প্রবেশ পথ রয়েছে। বর্তমানে দক্ষিণ দিকের প্রবেশ পথগুলো জানালা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। পূর্ব দিকের তিনটি প্রবেশ পথের মধ্যে কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথটি অপেক্ষাকৃত বড় এবং উত্তর দিকের প্রবেশ পথ অপেক্ষাকৃত ছোট। পূর্ব দিকের প্রবেশপথ বরাবর পশ্চিম দেয়ালে তিনটি মিহরাব রয়েছে। কেন্দ্রীয় মিহরাবটি অর্ধবৃত্তাকৃতির এবং তিনটি প্যানেলে বিভক্ত। কেন্দ্রীয় মিহরাবটি পার্শ্ববর্তীগুলো অপেক্ষা বড় এবং প্রস্তর নির্মিত। পার্শ্ববর্তী মিহরাবগুলো ইটের তৈরি এবং অর্ধবৃত্তাকৃতির। মিহরাবগুলো বহুখাঁজ খিলান দ্বারা নির্মিত। কেন্দ্রীয় মিহরাবের ডান দিকে ইটের তৈরী তিন ধাপ যুক্ত একটি আধুনিক মিম্বার রয়েছে।

চিত্র নং- ২ মুয়াজ্জমপুর শাহী জামে মসজিদের সম্মুখ দেওয়াল

Dhaka University Institutional Repository

প্রার্থনা গৃহটি ছয়টি গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত। গম্বুজগুলো দুটি অষ্টভোজাকার স্তম্ভ এবং পার্শ্বদেয়াল সংলগ্ন ছয়টি সংলগ্ন স্তম্ভের উপর নির্মিত হয়েছে। স্তম্ভগুলো গোলাকৃতির এবং সংলগ্ন স্তম্ভের ভিত ও শীর্ষ বর্গাকার এবং স্তম্ভের শীর্ষে নকশায় ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। গম্বুজগুলো নির্মাণে পেনডেনটিভ রীতি অনুসৃত হয়েছে। বর্তমানে দেয়ালগুলো আস্তরণ করায় পেনডেনটিভের প্রকৃত বৈশিষ্ট বুঝা মুশকিল। মসজিদটির সম্মুখের বহির্ভাগে(Facade) দুই পাশে দুটি অষ্টভুজ আকৃতির পার্শ্ববুরুজ রয়েছে; যা দেখে মনে হয় অন্য দুই পাশেও পূর্বে অনুরূপ পার্শ্ববুরুজ ছিল। পশ্চিম দেয়ালের কেন্দ্রীয় মিহরাবের বাহিরের দিকে সম্প্রসারিত দেয়ালে অতি নিপুন ও সুচারুরূপে সৃষ্ট মিহরাবের অলংকরণের অবিকল টেরাকোটা নকশা লক্ষণীয় যা একেবারেই বিরল। যদিও মুন্সিগঞ্জের বাবা আদম মসজিদের পশ্চাৎ দেয়ালের বাহিরের দিকে সম্প্রসারিত দেয়ালে অনুরূপ অলংকরণ রয়েছে। কিন্তু এই মসজিদের মিহরাবের অলংকরণের ন্যায় এত ব্যাপক আকারে দেখা যায় না।

নির্মাণকাল

সৈয়দ আওলাদ হোসেন কিছুটা ভগ্ন প্রাপ্ত শিলালিপি থেকে তিন ব্যক্তির নাম উদ্ধার করেছেন সুলতান আহমদ শাহ, আলী মুসাই এবং ফিরুজ খান।[৩] তাঁর মতে মসজিদটি তৈরী করেছেন ফিরুজ খান এবং আলী মুসাই সুলতান আহমেদ শাহ এর আমলে ১৪৩২-৩৬ খৃষ্টাব্দে/ ৮৩৬-৩৯ হিজরীতে এই মসজিদটি পুন:নির্মাণ করা হয়েছে এবং পূর্বদিকে একটি বারান্দা সংযোজন করা হয়েছে।

এই মসজিদের নির্মাণকাল নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কারণ শিলালিপিটি ভেঙ্গে যাওয়ায় এই মসজিদে সঠিক তারিখ পাঠ করা সম্ভব না হলেও এর নির্মাতার নাম লেখা আছে 'মসনদ শাহী - আহমদ শাহ'। ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে এই আহমদ শাহ বাংলার সুলতানী আমলের একমাত্র সুলতান জালাল উদ্দীনের পুত্র আহমদ শাহ কিন্তু ড. হাবিবা খাতুন মনে করেন যে, বাংলার বার ভুইঞা নেতা ঈসা খাঁ নিজে মসনদ শাহী শাসক ছিলেন।[৪] এই

Dhaka University Institutional Repository

উপাধি তাঁর কামানে উৎকীর্ণ রয়েছে। অতএব মসনদ শাহী আহমদ শাহ ঈসা খার বংশধর ছিলেন। তাছাড়া ঈসা খার শাসনের আওতাধীন ১৫৮২ সালে নির্মিত অষ্টগ্রাম মসজিদের অলঙ্করণের সাথে এই মসজিদের অলঙ্করণের যথেষ্ট মিল রয়েছে।[৫] তাছাড়া এই মসজিদের নামাজগৃহের স্তম্ভগুলির প্রস্তরগুলো অসংলগ্ন বেমানান দেখে মনে হয় একেকটা পাথর একেক সময় একেক স্থান থেকে এনে তৈরী করা হয়েছে। তাই মসজিদটির নির্মাণকাল নিয়ে দ্বিধা সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়াও মসজিদের ভিতরে ও বাহিরের দেয়াল মুঘল আমলের মসজিদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য প্যানেল অলঙ্করণ বিদ্যমান এতে ধারণা করা মুশকিল যে, এই মসজিদটি কোন সময় নির্মিত হয়েছে। এর সঠিক নির্মাণকাল নির্ণয় করার জন্য আরও গবেষণা প্রয়োজন।

সমাধি

মুয়াজ্জমপুর শাহী মসজিদ কমপ্লেক্সের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে শাহ লঙ্গর নামক এক দরবেশের সমাধি রয়েছে।[৬] সমাধিটি তথা মুয়াজ্জমপুর শাহী মসজিদ কমপ্লেক্সটি মূলত নদীর বাঁকে অবস্থিত। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ব্লকম্যান পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের বাঁকে উঁচু লালমাটির ভূমিতে সুলতানী আমলের ছয় গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ দেখেছিলেন। শাহ লঙ্গর নদীর বাঁকে নৌঘাটি স্থাপনের উপযুক্ত স্থান হিসেবে মুয়াজ্জমপুরকে বেছে নেন এবং পঞ্চদশ শতক হতে এই স্থানে অবস্থান করছিলেন। সম্ভবত তিনি এই নৌঘাটির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন ও মুয়াজ্জমপুরে মৃত্যুবরন করেন[৭] এবং এখানে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। তাঁর সমাধির কাছে আরও দুটি কবর রয়েছে এবং দক্ষিণ দিকে বর্তমানে একটি বড় কবরস্থান নির্মাণ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

কুয়া

মুয়াজ্জমপুর মসজিদের উত্তর দিকে একটি পুরাতন কুয়া আছে; যা থেকে এই মসজিদের মুসল্লীগণ ওজু করতো । বর্তমানে মসজিদের পূর্ব দিকে মসজিদ কমপ্লেক্সের ভিতরে নতুন একটি কুয়া খনন করা হয়েছে। পুরাতন কুয়াটি শুধু যে ওযুর পানির উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হত তা মনে হয় না কেননা কুয়াটি মসজিদ কমপ্লেক্সর বাহিরে অবস্থিত। যেহেতু এই মসজিদের অনতিদূরে একটি নদীর ঘাট ছিল এবং বর্তমানে ও তা বিদ্যমান আছে তাই ধারণা করা হয় এক সময় এই ঘাট দিয়ে প্রচুর লোক যাতায়াত করতঃ এবং সম্ভবত এই পথ দিয়ে কোন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে যাওয়া যেত। পুরাতন কুয়াটি বর্তমানে ব্যবহার করা হয় না। তবে এক সময় এই কুয়ার পানি এ স্থান দিয়ে চলাচলকৃত মানুষ ব্যবহার করত।

চিত্র নং- ৩ মুয়াজ্জমপুর শাহী জামে মসজিদের পশ্চাৎ দেওয়ালে ছককাটা নক্শা।

Dhaka University Institutional Repository

অলঙ্করণ

মুয়াজ্জমপুর শাহী মসজিদটির ভিতর ও বাহির অলঙ্কারাবৃত। ভিতরের দেয়াল প্যানেল নকশাবৃত এবং প্রধান মিহরাবটিও প্যানেল নকশা দ্বারা অলকৃত। মিহরাবের নকশার ন্যায় মসজিদের পশ্চাৎ দিকের দেয়ালে মিহরাব যে দেয়াল হতে উদগত হয়েছে সে অংশটিতে প্যানেলের মধ্যে একটি আয়তকার প্যানেল খিলান আকৃতির নকশার নীচে সমান্ত রালভাবে রয়েছে দুই সারি পদ্ম পাঁপড়ির নকশা, দুই পার্শ্ব হতে উদগত হয়েছে দুটি অলংকৃত স্তম্ভ। উপরে খিলানের শীর্ষ ভাগ হতে নীচের দিকে উৎকীর্ণ করা হয়েছে ঝুলন্ত শিকলের সাথে ঘন্টা নক্শা।

চিত্র নং- ৪ মুয়াজ্জমপুর শাহী জামে মসজিদের পশ্চাৎ দেওয়ালে শিকল ঘন্টা নকশা

Dhaka University Institutional Repository

খিলানের উপরের দুই দিকে রয়েছে দুইটি চক্রাকার রোজেট। নীচে স্থাপন করা হয়েছে একটি ছোট খোপের মধ্যে দুইটি চমৎকার তরঙ্গায়িত গুল্মের নকশা। এই নকশাটি ব্যতিক্রম এবং এখনও কোন ইমারতে এ ধরণের নক্শা দেখা যায়নি। মসজিদের বহি দেয়ালের উপরের অংশ বন্ধ মারলন নকশা দ্বারা অলংকৃত এবং চারপার্শ্বের দেয়াল প্যানেল নকশা দ্বারা অলংকৃত। দেয়ালের নীচের অংশে এক সারি সরু প্যানেল ছককাটা নকশা দ্বারা অলংকৃত। দুটি কারণে এই মসজিদের অলংকরণ উল্লেখযোগ্য। প্রথমত: এখানে মসজিদের পশ্চাৎ দেয়ালকে নকশার জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত : বাংলার প্রকৃতি হতে আহরিত লতাগুল্মের মোটিফকে অলংকরণে অতি প্রাঞ্জলরূপে উৎকীর্ণ করা হয়েছে।

সাধারণ আলোচনা

মুয়াজ্জমপুর শাহী মসজিদের ন্যায় ছয় গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ বাংলার সুলতানী ও মুঘল স্থাপত্যে আরও লক্ষ্য করা যায়, যেমন: সুলতানী আমলে নির্মিত চট্টগ্রামের হাট হাজারী মসজিদ (১৪৭৪-৮১খৃ:), রাম পালের বাবা আদম মসজিদ (১৪৮৩খৃ:) গৌড়ের ঝনঝনিয়া মসজিদ, বাগের হাটের রেজাখোদা মসজিদ (পঞ্চদশ শতাব্দী), নওগাঁর কুসুম্বা মসজিদ (১৫৫৮খৃ:)[৮] এবং মুঘল আমলে নির্মিত চট্টগ্রামের মোল্লাহ মিসকিন শাহ মসজিদ, ওয়ালী খান মসজিদ[৯] প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। সুলতানী আমলেই ছয় গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ বেশী নির্মিত হয়েছে।

এই মসজিদের শিলালিপিটি ভাঙ্গা অবস্থায় পাওয়া গেছে বলে এর নির্মাতার নাম এবং নির্মাণকাল সঠিক কিনা তা নিয়ে মতভেদ দেখা দিয়েছে এছাড়াও এই মসজিদের দেয়ালের বিভিন্ন প্যানেল নকশা বিভিন্ন অলংকরণ, বক্রাকার কার্নিশের পরিবর্তে সোজা কার্নিশ এবং ব্যাটেলম্যান্টের ব্যবহার দেখা যায় যা মুঘল আমলের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। এই মসজিদের সবচেয়ে আকর্ষণীয় এবং ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সব মসজিদই সাধারণত সম্মুখভাগ অলংকৃত থাকে কিন্তু এই মসজিদটি পশ্চাত্যের দেয়াল অলংকৃত, এই বৈশিষ্ট্য অন্য কোন মসজিদে এত ব্যাপকভাবে দেখা যায় না। শুধুমাত্র বাবা আদম মসজিদের পশ্চাৎ

Dhaka University Institutional Repository

দেয়ালে সামান্য পরিমানে অলংকরণ দেখা যায়। বর্তমানে এই মসজিদের সম্মুখভাগে নদী রয়েছে। পূর্বে এই নদীটি খুব সম্ভবত মসজিদের পিছনের দিক দিয়ে প্রবাহিত ছিল। যেহেতু এখানে একটি ঘাট ছিল এবং অনেক মানুষের যাতায়াত ছিল তাই মসজিদের পশ্চাৎ দেয়ালটিকেই বেশী অলংকৃত করা হয়েছে।

বন্দরশাহী মসজিদ

নারায়ণগঞ্জের প্রাচীন মসজিদগুলোর মধ্যে অন্যতম বন্দর শাহী মসজিদ। এই মসজিদটি নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দর উপজেলার অবস্থিত।

নির্মাণ কাল

বন্দরশাহী মসজিদ হতে প্রাপ্ত আরবী শিলালিপি হতে জানা যায় যে, এই মসজিদটি সুলতান আবুল মুজাফ্ফর ফতেহ শাহের সময় মালিক-আল-মুয়াজ্জাম বাবা সালেহ কর্তৃক ১৪৮১/১৪৮২ খৃষ্টাব্দে/ ৮৮৬ হিজরীতে নির্মিত হয়েছে।[১০] এটি পূর্বে একটি এলাকা ভিত্তিক মসজিদ ছিল বর্তমানে জামে মসজিদে পরিণত হয়েছে।

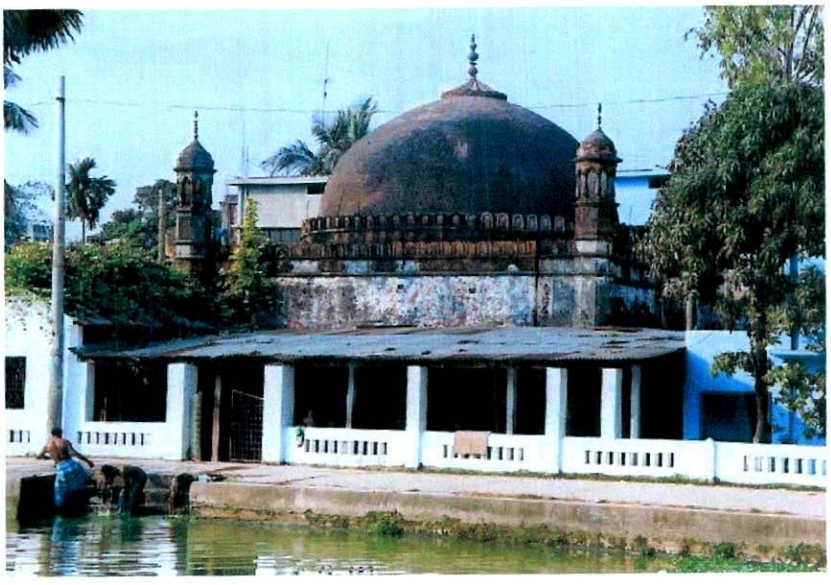

চিত্র নং - ৫ বন্দর শাহী মসজিদ

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান অবস্থা

মসজিদটির পুনঃসংস্কার করা হয়েছে ও উত্তর, পূর্ব, দক্ষিণ দিকে বারান্দা সংযোজন করা হয়েছে। পশ্চিম দিকে মুয়াজ্জিনের বসবাসের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু বর্তমানে এটি মসজিদ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। অভ্যন্তরভাগের আস্তর এবং রঙ কিছুটা অবিকৃত রয়ে গেছে।

গঠন প্রনালী ও ভূমি নকশা

এই মসজিদটি বর্গাকার এক গম্বুজ বিশিষ্ট। প্রার্থনা গৃহের পরিমাণ ৬.১৬ বর্গ মিটার এবং ১.৭২ মিটার পুরু ইটের দেয়াল বেষ্টিত। মসজিদে প্রবেশের জন্য পূর্বদিকে তিনটি খিলানযুক্ত প্রবেশ পথ আছে কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথটি পাশ্ববর্তীগুলো অপেক্ষা বড়। প্রবেশ পথ গুলো সুঁচালো খিলানযুক্ত, উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে একটি করে উন্মুক্ত স্থান এবং উন্মুক্ত স্থানের দুই পার্শ্বে দুটি করে ১৮ সেঃ মিঃ চওড়া আয়তাকার কুলঙ্গি আছে, কিবলা দেয়ালের মিহরাব তিনটি প্রবেশপথের বরাবর। মিহরাবে পূর্বের টেরাকোটা অলংকরণ এখনও বিদ্যমান রয়েছে। কেন্দ্রীয় মিহরাব কুলঙ্গি অন্যান্যগুলো অপেক্ষা বড় এবং বহির্ভাগে উদগত অংশ রয়েছে চারপার্শ্বে চারটি অষ্টকোণাকার টারেট আছে এবং টারেটগুলো কিউপোলা দ্বারা আচ্ছাদিত। প্রত্যেকটি দেয়ালে দুটি করে পাথরের স্তম্ভ আছে। যা প্রত্যেক কোনায় নির্মিত স্কুইঞ্চ তৈরীতে সহায়তা করেছে। স্কুইঞ্চের উপর ড্রাম এবং ড্রামের উপর মসজিদের একমাত্র গম্বুজটি নির্মিত হয়েছে। পিপায় মুঘল অলংকরণ পরিলক্ষিত হয়। মসজিদের বহির্ভাগ মুঘল আমলে পুন:নির্মাণ করা হয়। এ সময় মসজিদের বক্রাকার কার্নিশ সরলাকার ধারন করে। মসজিদের বহির্ভাগের নির্মাণশৈলী প্রমাণ করে এটি মুঘল আমলে পুন:নির্মিত হয়েছে। কিন্তু অভ্যন্তরিনভাগ এখনও অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে। বর্তমানে মসজিদটি তিনদিকে বারান্দা নির্মাণ করা হয়েছে। বর্তমানে মসজিদের দক্ষিণ দিকে একটি নতুন মসজিদ ও ঈদগাহ নির্মাণ করা হয়েছে। মসজিদটি প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আওতাধীন হলেও স্থানীয় একটি কমিটি দ্বারা মসজিদের সমস্ত কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে ।

Dhaka University Institutional Repository

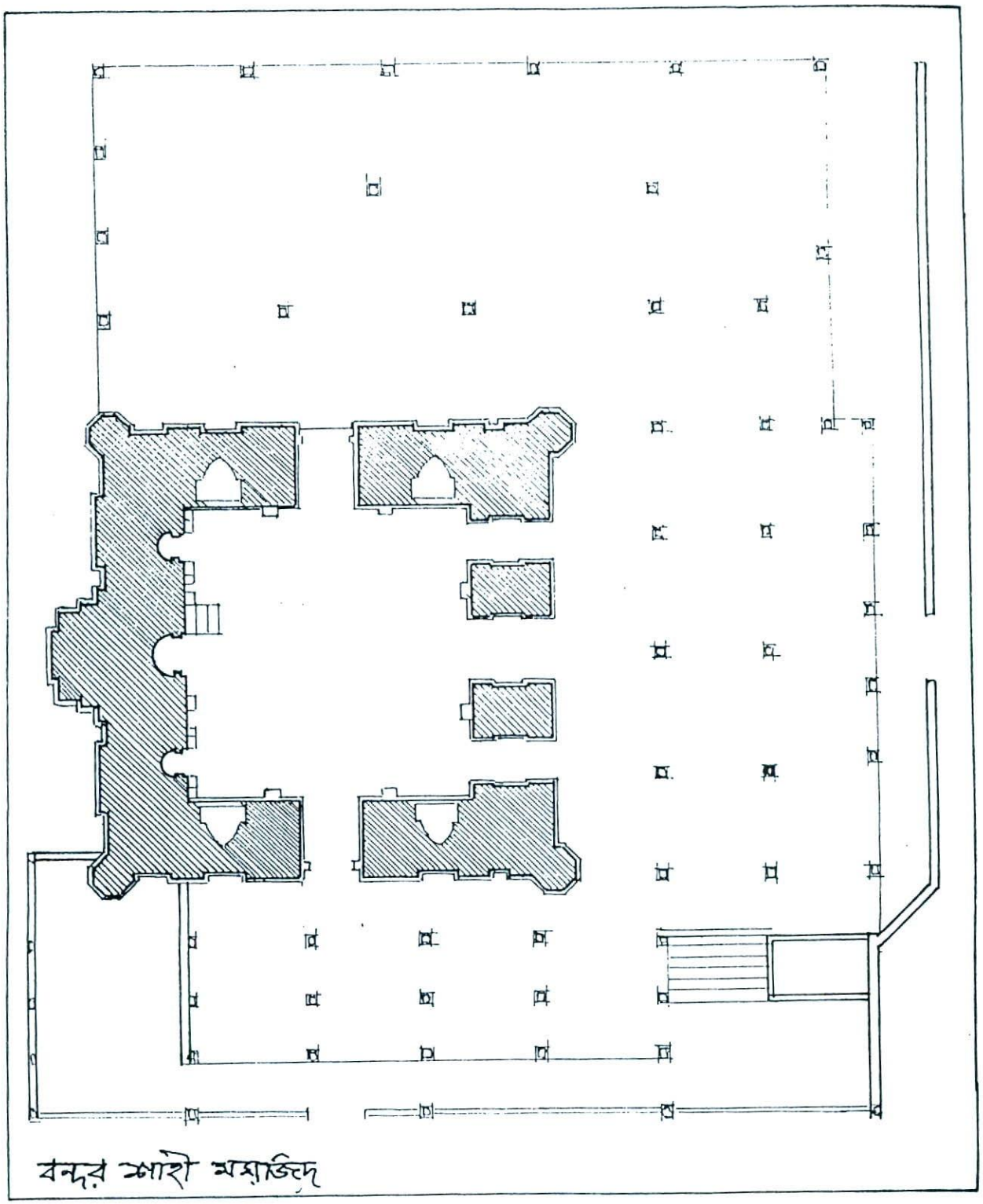

ভূমিনকশা - ২

Dhaka University Institutional Repository

ফতেহ শাহ্ মসজিদ

নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁ উপজেলার মোগরাপাড়া ইউনিয়নের নগর সাদীপুর গ্রামে ফতেহশাহ মসজিদটি অবস্থিত। এই মসজিদে দুটি শিলালিপি রয়েছে। যার একটি বর্তমানে পূর্বদিকে অবস্থিত প্রাচীন কবরস্থানের পশ্চিম দেয়ালে গ্রথিত রয়েছে এবং মানত হাসিলের জন্য ভক্তরা এর উপর চুনের প্রলেপ দিতে দিতে শিলালিপিটিকে এমন অবস্থায় এনেছে যে তার পাঠ উদ্ধার করা অসম্ভব ব্যাপার। কানিংহাম মসজিদের শিলালিপির ব্লকম্যান কর্তৃক প্রদত্ত যে পাঠ উল্লেখ করেছেন তাতে মসজিদের নির্মাতার নাম "মালিকমুদ্দীন" উৎকীর্ণ। তিনি সুলতান জালাল-উদ-দীন ফতেহ শাহর রাজত্বকালে প্রাসাদের বাইরে রাজকীয় পোশাকের তত্ত্বাবধায়ক, মোয়াজ্জমাবাদ বা মাহমুদাবাদ নামেও পরিচিত সেই অঞ্চলের প্রধান সেনাপতি ও উজীর এবং লাউর থানার সেনাপতি ছিলেন।[১১]

চিত্র নং- ৬ ফতেহ শাহ মসজিদ

Dhaka University Institutional Repository

নির্মাণকাল

এই শিলালিপিতে উল্লেখ রয়েছে যে, মালিকমুদ্দীন সুলতান কর্তৃক ৮৮৯ হিজরী/ ১৪৮৪ খৃ: এই মসজিদটি নির্মিত হয়েছে। বর্তমানে মসজিদের ভিতরে প্রবেশ পথের উপর আরেকটি শিলালিপি প্রোথিত আছে, যাতে তারিখ আছে ১৭০০ খৃ:/ ১১১২ হিজরী।[১২] একই মসজিদে দুই সময়কার দুটি শিলালিপির অবস্থান দেখে মনে হয় মসজিদটি প্রথমে সুলতান জালাল উদ্দীন ফতেহ শাহর সময় নির্মিত হয়েছিল। পরে মসজিদটি জরাজীর্ণ অবস্থায় থাকায় মুঘল আমলে মসজিদটি পুনরায় নির্মাণ করা হয়। সেজন্য মসজিদটিতে কিছু মুঘল আমলের স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যও পরিলক্ষিত হয়। মুঘল আমলে মসজিদটি পুন:নির্মাণ করলেও সুলতানী আমলের স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য মসজিদের গম্বুজে এবং বক্রাকার মূল কার্নিশে এখনও বিদ্যমান।

ভূমি নকশা ও গঠন প্রনালী

ফতেহ শাহ মসজিদটি আয়তাকার একটি ইমারত যার অভ্যন্তরভাগের পরিমাপ ৭.৭০ মিটার × ৫.২৭ মিটার এবং বহির্ভাগের পরিমাপ ১০.৩৫মিটার × ৭.৯৫ মিটার।[১৩] এই মসজিদে মোট পাঁচটি প্রবেশ পথ ছিল যার মধ্যে উত্তর দিকের প্রবেশ পথটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। পূর্ব দিকের তিনটি প্রবেশ পথের মধ্যে কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথটি অন্যগুলোর তুলনায় বড়। কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথটির দৈর্ঘ্য ২.১৬ মিটার × ১.১৭ মিটার। পার্শ্ববর্তী প্রবেশ পথগুলোর দৈর্ঘ্য ১.৫২ মিটার × ১.০৪ মিটার। এই মসজিদের পশ্চিম দেয়ালে তিনটি মিহরাব রয়েছে। কেন্দ্রীয় মিহরাবটি পাথরের এবং পার্শ্ববর্তী মিহরাবগুলো অপেক্ষা বড়।

অলংকরণ

সুলতানী আমলে নির্মিত প্রস্তর স্তম্ভগুলির উপরে এই মসজিদের গম্বুজটি নির্মিত হয়েছে। পরে মুঘল আমলে গম্বুজটি উত্তর ও দক্ষিণ দিকে দুটি ছোট পিপাকৃতির ছাদে

Dhaka University Institutional Repository

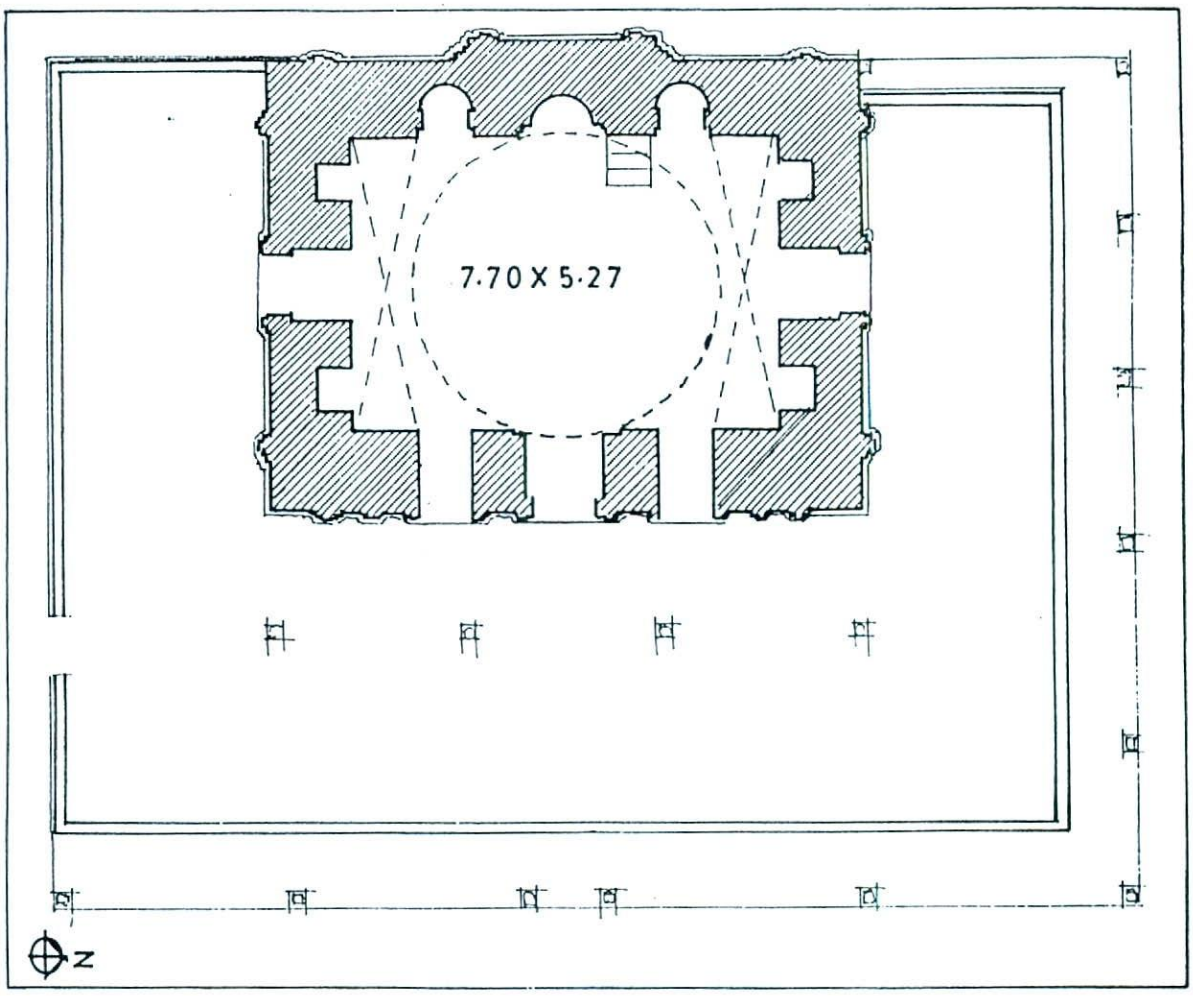

GROUND PLAN
FATH SHAH MOSQUE

ভূমিনকশা - ৩

Dhaka University Institutional Repository

আড়াআড়ি খিলানের সাহায্যে পেনডেনটিভ নির্মাণ করে পিপার উপরে গম্বুজ স্থাপন করা হয়েছে।

চিত্র নং-৭ ফতেহ শাহ মসজিদের বক্র কার্ণিশ

বর্তমানে মসজিদটির সম্মুখভাগে একটি বারান্দা সংযোজন করা হয়েছে। বহির্ভাগের দেয়াল আস্তরযুক্ত আয়তাকার প্যানেল নকশা দ্বারা অলংকৃত যা পরবর্তী মুঘল সময়ের একটি বৈশিষ্ট্য। বর্গাকার কার্নিশের উপরে প্যারাপেট সংযুক্ত করা হয়েছে যা চারপাশ থেকে দেখা যায়। কেন্দ্রীয় মিহরাবের উত্তর দিকে একটি মিম্বার নির্মাণ করা হয়েছে। মসজিদটি বর্তমানে জামে মসজিদ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

ইউসুফ গঞ্জ মসজিদ

নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁ উপজেলার মোগরা পাড়া ইউনিয়নের ইউসুফগঞ্জ গ্রামের সদর রাস্তার উত্তর পার্শ্বে এই পুরাতন মসজিদটি অবস্থিত। পানাম নগর বাস স্টেশন থেকে দরগা বাড়ী যেতে রাস্তার ডান পার্শ্বে ইউসুফগঞ্জ মসজিদটির অবস্থান।

ভূমি নকশা ও গঠন প্রনালী

ইউসুফগঞ্জ মসজিদটি পূর্বে এক গম্বুজ বর্গাকার মসজিদ ছিল। বর্তমানে এই মসজিদের দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এই মসজিদের দক্ষিণ দিকে সম্প্রসারিত অংশে মসজিদের ছাদে যাওয়ার সিঁড়ি রয়েছে। প্রাচীন মসজিদটির আয়তন অভ্যন্তরভাগের আয়তন ৫.৫০বর্গ মিটার এবং বহির্ভাগের আয়তন ৯ বর্গ মিটার।[১৪]

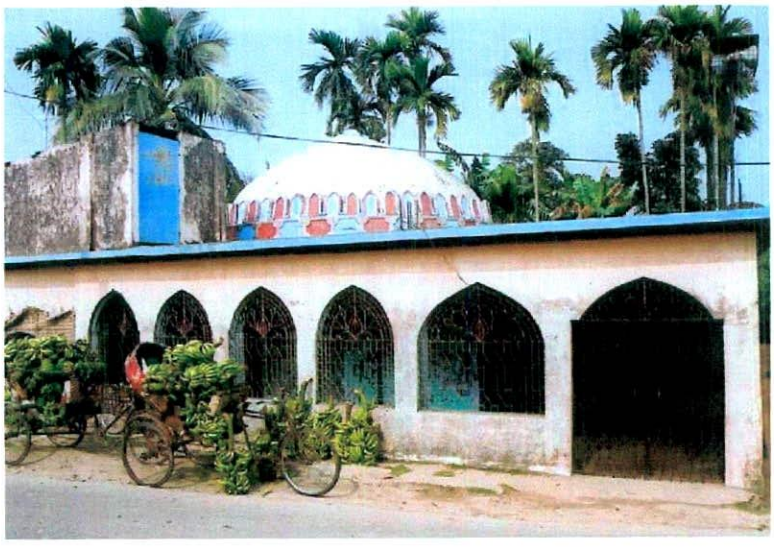

চিত্র নং-৭ ইউসুফ গঞ্জ মসজিদ

এই মসজিদের পূর্ব দিকের দেওয়ালে তিনটি প্রবেশ পথ রয়েছে। কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথটি পার্শ্বের দুটি থেকে অপেক্ষাকৃত বড়। উত্তর ও দক্ষিণ দিকে একটি করে মোট দুটি প্রবেশ পথ ছিল যা বর্তমানে জানালায় পরিণত করা হয়েছে। এই মসজিদের কিবলা দেয়ালে তিনটি মিহরাব রয়েছে। কেন্দ্রীয় মিহরাবটি অন্য দুটির চেয়ে বড় এবং আয়তাকার

Dhaka University Institutional Repository

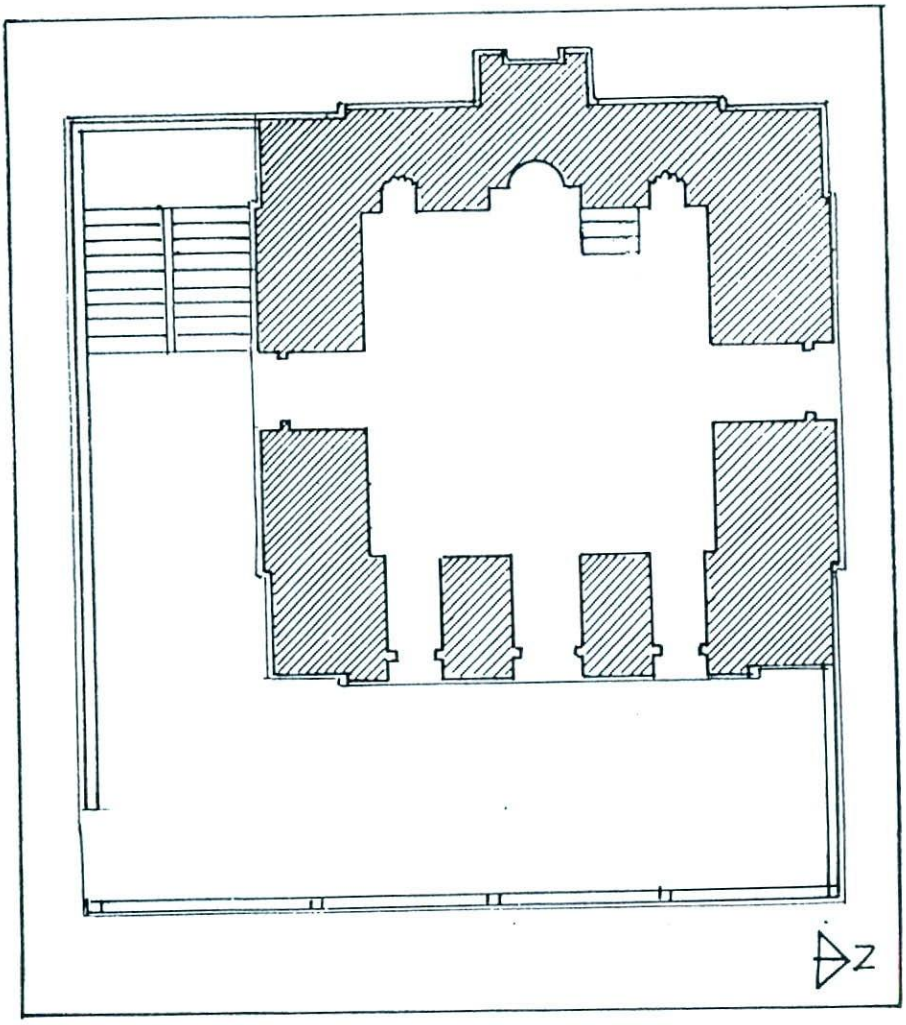

GROUND PLAN
YUSUFGANJ MOSQUE

ভূমিনকশা - ৪

Dhaka University Institutional Repository

ফ্রেমের মধ্যে অবতলাকার। মসজিদের বহির্ভাগে কেন্দ্রীয় মিহরাবটি উদগত হয়ে আছে। অন্য দুটি মিহরাব ঢালু কৌনিক খিলান দ্বারা নির্মিত। কিন্তু মসজিদটি সংস্কারের ফলে কৌনিক খিলানের প্রকৃত আকার নষ্ট হয়ে গেছে।[১৫]

ইউসুফগঞ্জের মসজিদটির একমাত্র অতি নীচু গম্বুজটি স্কুইঞ্চ এর উপর নির্মিত।[১৬] গম্বুজের গায় ড্রামের ভিত মারলন নকশা দ্বারা অলংকৃত। বর্তমানে এই মসজিদটি বহির দেয়াল খিলানাকৃতির জানালা দ্বারা আচ্ছাদিত এবং আপাত দৃষ্টিতে এই প্রাচীন মসজিদটিকে সম্পূর্ণ একটি আধুনিক যুগের মসজিদ হিসেবে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এই মসজিদের অভ্যন্তরে প্রাচীন মসজিদটির সকল বৈশিষ্ট্যই সুলতানী আমলের অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দীর নির্মিত মসজিদ বলে ধরে নেওয়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository

দেওয়ানবাগ শাহী জামে মসজিদ

নারায়ণগঞ্জের রহস্যাবৃত মসজিদ হচ্ছে দেওয়ানবাগ শাহী মসজিদ। এই মসজিদটিকে এলাকার জনগন মাটির নীচের মসজিদ বলেও অভিহিত করেন। জনশ্রুতি থেকে জানা যায় যে, এই মসজিদটি এক সময় সম্পূর্ণ মাটির নীচে চাপা ছিল। মরহুম মওলানা আব্দুল সামাদ খন্দকারের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় স্থানীয় জনগনের সহায়তায় ১৯৫১ খৃ: এই মসজিদটি পুনরুদ্ধারের সময় মসজিদটির গম্বুজের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছিল যা ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে পুন:নির্মাণ করা হয়। ১৯৯১ খৃষ্টাব্দে মসজিদের পূর্বদিকের বারান্দা সম্প্রসারিত করা হয়। এই মসজিদটি নারায়ণগঞ্জ জেলার মুয়াজ্জমাপুর ইউনিয়নের দেওয়ান বাগ গ্রামে অবস্থিত। বার ভুঁইয়া প্রধান ঈসা খানের বংশধর দেওয়ান মনোয়ার খানের নামানুসারে এই অঞ্চলের দেওয়ান বাগ নামকরণ করা হয়েছে বলে অনুমিত হয়।

নির্মাণকাল

গঠন কাঠামোর অবস্থান বিচারে মসজিদটি প্রাক মুঘল আমলের বলে প্রতীয়মান হয়। প্রস্তর নির্মিত খিলান, মিহরাব, দেয়ালের প্যানেল নকশা, দেয়ালের পুরুত্ব এসবই প্রমাণ করে যে, মসজিদটি প্রাক মুঘল আমলে নির্মিত। এই মসজিদের মিহরাবগুলি সুলতানী রীতিতে বহু খাঁজ বিশিষ্ট এবং এরূপ মিহরাব দেখা যায় সাধারনত প্রাক মুঘল আমলের মসজিদ স্থাপত্যে।[১৭] মুয়াজ্জমাপুর মসজিদ, ফতেহ শাহের মসজিদ ও গোয়লদী মসজিদের স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যের সাথে বিশেষ করে মিহরাব অলংকরণের সাদৃশ্য বিদ্যমান। কালের দিক থেকে বিবেচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, এই মসজিদটি গোয়লদি মসজিদের সমসাময়িক ষোড়শ শতাব্দীর একটি মসজিদ।

গঠন প্রণালী ও ভূমি নকশা

দেওয়ানবাগ শাহী জামে মসজিদটি বর্গাকৃতির এবং সামনে বারান্দাযুক্ত। জনশ্রুতি থেকে জানা যায় আদিতে এ বারান্দায় এক সারিতে ছোট তিনটি গম্বুজ ছিল। কিন্তু এই মসজিদের গঠনশৈলী এবং সমসাময়িক মসজিদগুলি লক্ষ্য করলে বুঝা যায় যে, এই

Dhaka University Institutional Repository

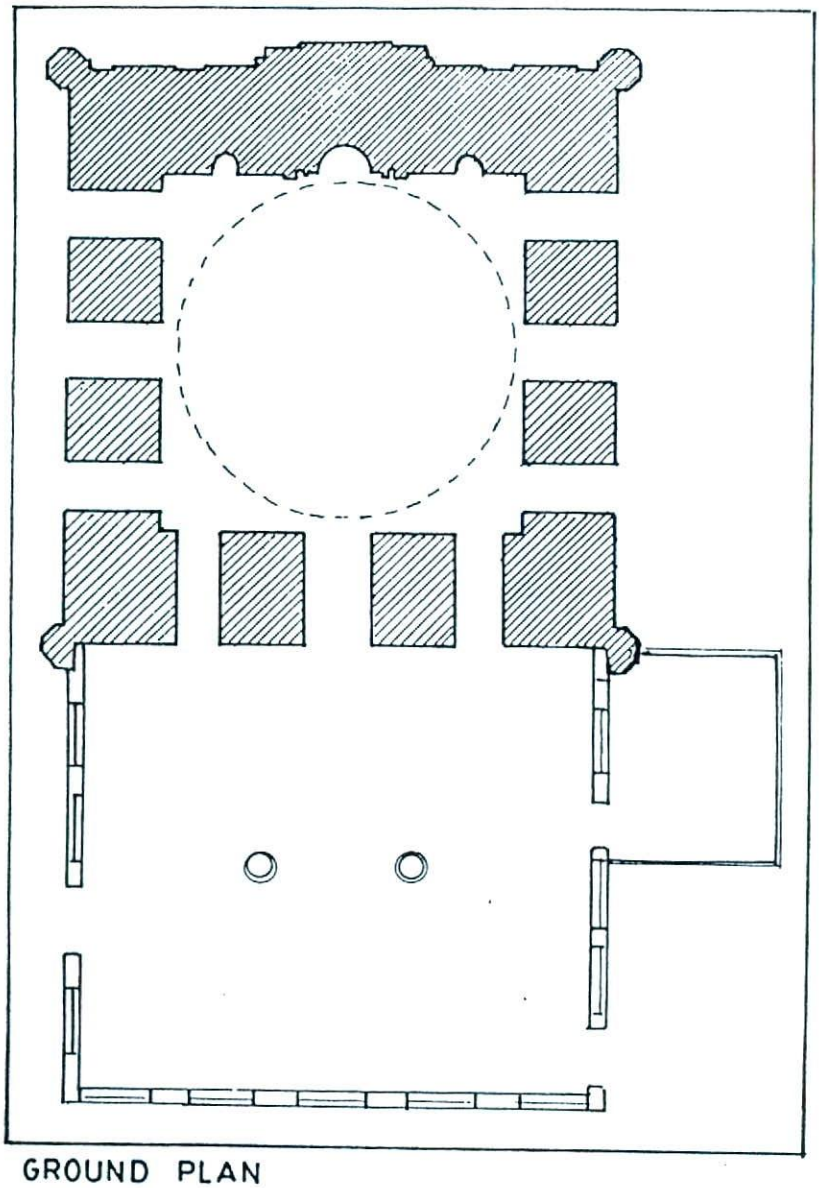

GROUND PLAN
DEWANBAGH MOSQUE

ভূমিনকশা - ৫

Dhaka University Institutional Repository

মসজিদের বারান্দার দুই প্রান্তে এবং মধ্যভাগে তিনটি ছত্রী ছিল যাকে স্থানীয় জনগন ছোট গম্বুজ বলে ধারনা করেছে।[১৮]

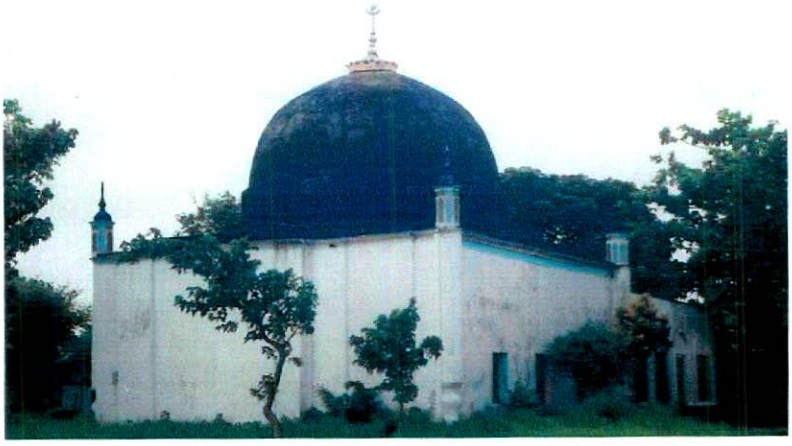

চিত্র নং-৮ দেওয়ান বাগ শাহী জামে মসজিদ

প্রাচীন মসজিদটিতে একটিমাত্র গম্বুজ রয়েছে যা কিনা ১৯৫১ খৃ: পুনর্নির্মিত হয়। স্কুইঞ্চের উপর চুন সুরকী এবং কংক্রিট দ্বারা নির্মিত বর্গাকার ভিত ও অষ্টকোণাকার ড্রামের উপর সুডৌল আকৃতির গম্বুজ বিদ্যমান। গম্বুজের ভিতরের ড্রামের মধ্যে প্রথমে একসারি লতাপাতা ও ফুল নকশা, এবং নীচের সারিতে ইটের নকশা রয়েছে। এই ধরনের ইটের অলংকরণ ছোট সোনা মসজিদ ও গোয়ালদি মসজিদেও দেখা যায়। বাংলার স্থাপত্যের একটি অভিনব অলংকরণ বৈশিষ্ট্য মসজিদের চারকোণে অষ্টকোণাকার বুরুজ আছে। এই বুরুজের ভিতের অংশে কলসাকৃতির নকশা রয়েছে এবং বুরুজের শিরোভাগ কিয়স্ক দ্বারা আচ্ছাদিত। এই মসজিদের প্রধান মিহরাবটি অবতলাকৃতির। এবং দুপাশে দুটি মিহরাব কুলঙ্গি রয়েছে। কিবলা কোঠার প্রধান মিহরাবটি 'ব্যাসল্ট' পাথরে নির্মিত এবং অধিকমাত্রায় অলংকৃত। অন্য দুটি মিহরাব কুলঙ্গি বর্তমানে আলমিরা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। মুঘল আমল এবং তৎপরবতীকালে নির্মিত স্থাপত্যের বিশেষ বিশেষ অংশে ব্যাসাল্ট পাথরের ব্যবহার দেখা গেলেও এই মসজিদের মত এত বিস্তৃতভাবে পাথরের ব্যবহার পূর্বে চোখে পড়েনি। এখানেই এই মসজিদের চমৎকারিত্ব। মূল মিহরাব প্যানেলের সমস্ত অংশই ব্যাসাল্ট পাথর দ্বারা নকশাকৃত।[১৯] মিহরাবের নকশার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ও ব্যাতিক্রমধর্মী গঠন বৈশিষ্ট্য লুকিয়ে রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

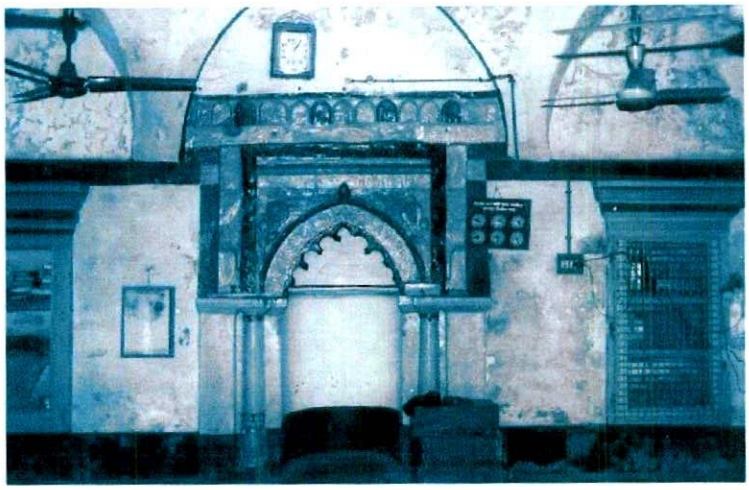

চিত্র নং- ৯ দেওয়ান বাগ মসজিদের মিহরাব

এই মিহরাবের অবতলাকৃতির ছাদের ভিতরের অংশে মিহরাবের বাহিরের কিনারা ঘেষে অবতলাকৃতির ছাদে খিলানাকৃতি ফোকরের মধ্যে সম্পূর্ণ পৃথক ব্যাসাল্ট পাথরের নির্মিত একটি রোজেট নকশা দৃষ্টিগোচর হয় । এটি দেখে প্রতীয়মান হয় যে, রোজেটটি একটি ফাঁকা জায়গার উপর বসানো কোন পাত্রের তলদেশে খচিত। এ ধরনের অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য অন্যকোন মসজিদের মিহরাবে ইতিপূর্বে দেখা যায়নি।

প্রাচীন মসজিদের পূর্বদিকে তিনটি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিকে একটি করে মোট পাঁচটি প্রবেশপথ ছিল। বর্তমানে উত্তর ও দক্ষিণ দিকের দরজা জানালায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। পূর্বদিকের তিনটি প্রবেশপথের মধ্যে মাঝের প্রবেশপথটি অধিকতর প্রশস্ত। এবং দুই প্রান্তের প্রবেশপথ দুটি উত্তর দক্ষিণ দিকের দরজার সমান।

দেওয়ানবাগ শাহী জামে মসজিদটি আলাদী ওয়াকফা সম্পত্তির উপর নির্মিত। এ সম্পত্তিটি দান করেছেন লাল মিয়া খন্দকারের পিতা। মসজিদটি বর্তমানে স্থানীয় মসজিদ কমিটির তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

বাবা সালেহ মসজিদ কমপ্লেক্স

সোনারগাঁয়ের উন্নতির সাথে সাথে বন্দর উপজেলার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৩৪৬ সালে যখন ইবনে বতুতা সোনারগাঁয়ে আগমন করেন তখন বন্দর সমৃদ্ধশালী ছিল এবং আইন-ই-আকবরীতে এ বন্দরকে সোনারগাঁ সরকারের একটি মহাল হিসেবে দেখানো হয়েছে। বন্দরের উন্নতির সাথে সাথে এই অঞ্চলে বিভিন্ন ইমরাত গড়ে উঠে তার মধ্যে বাবা সালেহ মসজিদ অন্যতম।

চিত্র নং-১০ বাবা সালেহ মসজিদ কমপ্লেক্স

নির্মাণকাল

বাবা সালেহ মসজিদটি নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দর থানায় অবস্থিত। এই মসজিদ হতে প্রাপ্ত শিলালিপি অনুযায়ী এটি ১৫০৫/১৫০৬ খৃ:/ ৯১১ হিজরীতে হাজী বাবা সালেহ কর্তৃক নির্মিত হয়েছে।[২০]

ভূমি নকশা ও গঠন প্রনালী

বাবা সালেহ সুলতান হোসেন শাহের সময় সোনারগাঁয়ের গভর্ণর ছিলেন।[২১] মসজিদটি একটি কমপ্লেক্স যার চারপাশেই উঁচু প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। বেষ্টনী প্রাচীরের ভিতরে বাবা সালেহের সমাধি, মসজিদ এবং কিছু নতুন স্থাপনা রয়েছে। মসজিদটি

Dhaka University Institutional Repository

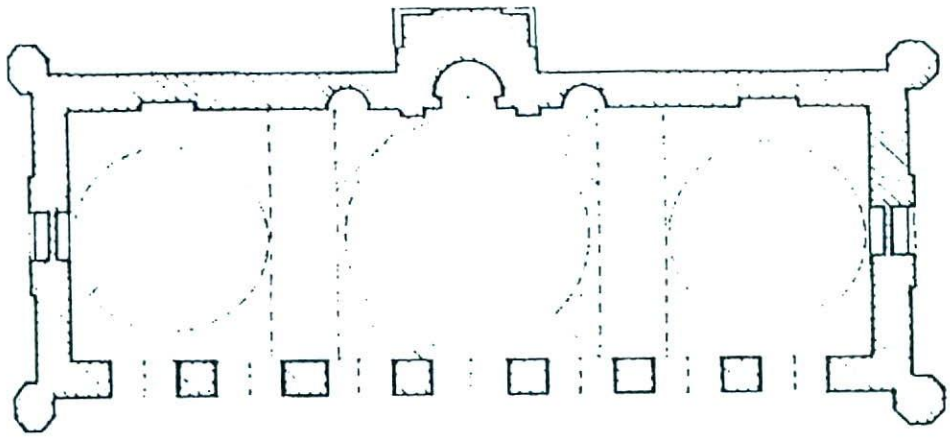

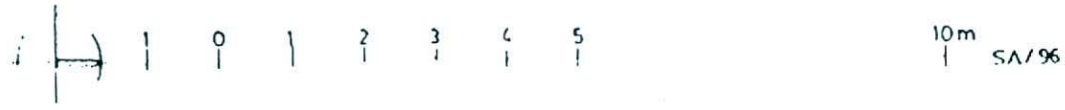

বাবা সালেহ মসজিদ

ভূমিনকশা - ৬

Dhaka University Institutional Repository

সম্পূর্ণরূপে পুন:নির্মাণ এবং সম্প্রসারণ করা হয়েছে। বর্তমানে এটি একটি বর্গাকার ইমারত। এর সম্মুখভাগে একটি বড় বারান্দা নির্মাণ করা হয়েছে।

চিত্র নং- ১১ বাবা সালেহ মসজিদের গম্বুজ

ড. পারভীন হাসানের মত অনুসারে মূল মসজিদটি একটি বর্গাকার কক্ষ ছিল।[২২] যার অভ্যন্তরভাগের পরিমাপ ৩.৬ বর্গ মিটার। এই কক্ষের উত্তর ও দক্ষিণ দিকের অংশ পরবর্তীতে নির্মাণ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় গৃহটিতে প্রবেশের জন্য পূর্বদিকে তিনটি প্রবেশ পথ এবং প্রবেশ পথ বরাবর কিবলা দেয়ালে তিনটি মিহরাব আছে। কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথ এবং মিহরাবটি পার্শ্ববর্তীগুলো অপেক্ষা কিছুটা বড়। বর্গাকার কক্ষটির কোনার বুরুজের অনুকরণে নতুন প্রার্থনা গৃহের ভিতর এবং বহির্ভাগ নতুন করে আস্তর করায় দেয়ালের পুরুত্ব অনেক হ্রাস পেয়েছে। তাই এই মসজিদের মূল বৈশিষ্ট্য খুব একটা চোখে পড়ে না। কেন্দ্রীয় গম্বুজটি স্কুইঞ্চ এর উপর নির্মাণ করা হয়েছে। নতুন গম্বুজগুলোর নির্মাণ শৈলী ভিন্ন। মসজিদের আকার আকৃতি থেকে বুঝা যায় এই প্রার্থনা গৃহটি জনসাধারনের জন্য নির্মিত হয়নি এটি বাবা সলেহের ব্যাক্তিগত প্রার্থনা গৃহ ছিল বলে ধারনা করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

গোয়ালদী মসজিদ

মোগরাপাড়া পানাম রাস্তা যেখানে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অতিক্রম করেছে সেখান থেকে কিছু উত্তরে বর্তমান লোকশিল্প যাদুঘর চোখে পড়ে। সেখান থেকে কিছু দূর উত্তরে একটি সরু পথ পশ্চিম উত্তর দিকে গেছে। এই রাস্তা ধরে ১২০০ মিটার উত্তর পশ্চিম দিকে রাস্তার পাশে গোয়ালদী মৌজায় একটি প্রাচীন মসজিদ চোখে পড়ে। এই মসজিদটি গ্রামের নামানুসারে গোয়ালদী মসজিদ নামে পরিচিত।

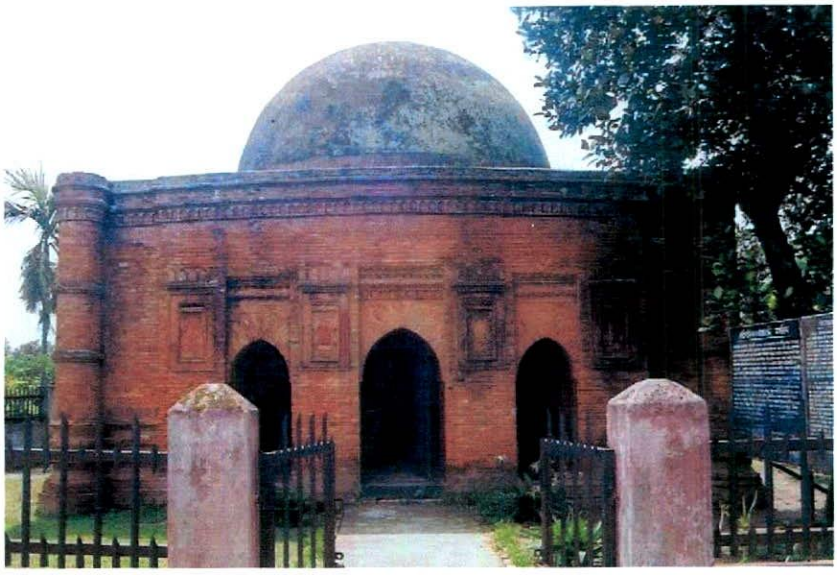

চিত্র নং-১২ গোয়ালদি মসজিদ

নির্মাণ কাল

এই মসজিদে প্রাপ্ত শিলালিপি হতে জানা যায় এই মসজিদটি ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে আলাউদ্দীন হুসেন শাহের রাজত্বকালে মোল্লা হিজবর আকবর খান কর্তৃক নির্মিত হয়েছে।[২৩] একসময় মসজিদের প্রবেশ পথের উপরে একটি শিলালিপি গ্রোথিত ছিল। বর্তমানে যা কলকাতার যাদুঘরে রক্ষিত আছে।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান অবস্থা

বর্তমানে গোয়ালদী মসজিদটি প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে রয়েছে। এটি বর্তমানে অব্যবহৃত অবস্থায় আছে। গোয়ালদী মসজিদটি সম্পূর্ণ ভাবে পুনঃনির্মাণু করা হয়েছে। পুনঃগঠনের পূর্বে গম্বুজ এবং উত্তর পূর্ব এবং দক্ষিণ দিকের বেশীর ভাগ অংশ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। বর্তমানে পূর্ব দিকে বেষ্টনী দেয়ালসহ একটি প্রবেশ পথ আছে।

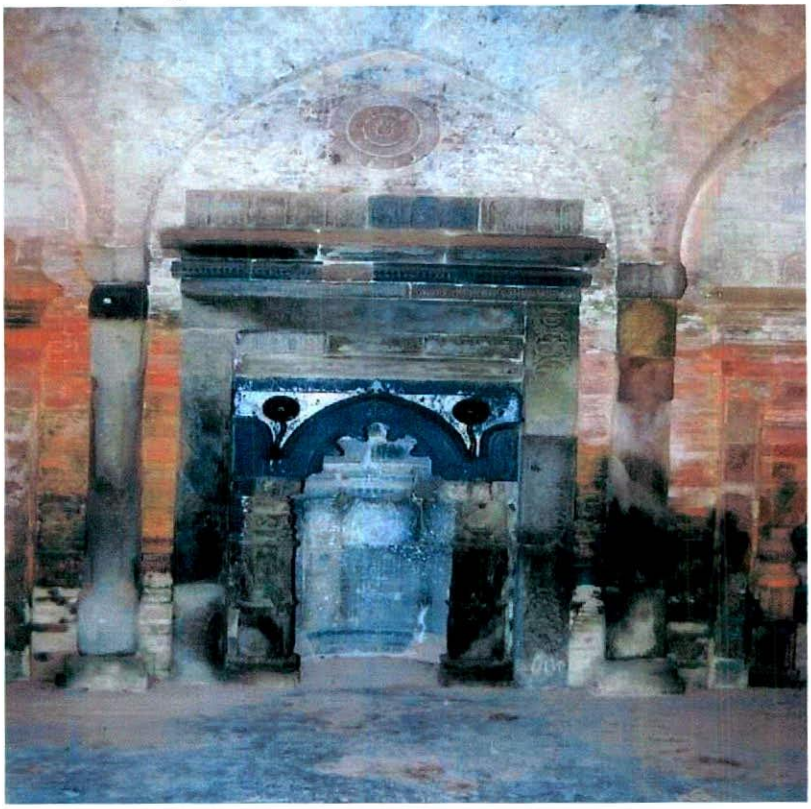

চিত্র নং-১৩ গোয়ালদি মসজিদের মিহ্‌রাব

গঠন প্রণালী ও ভূমি নকশা

গোয়ালদী মসজিদটি বর্গাকার এক গম্বুজ বিশিষ্ট ইমারত। প্রার্থনা গৃহটির আয়তন অভ্যন্তরে ৫ বর্গ মিটার এবং বহির্ভাগসহ ৭.৮৫ বর্গ মিটার বিশিষ্ট ইমারত এবং দেয়াল গুলো ৩ মিটার প্রশস্থ।[২৪] পূর্বদিকে তিনটি প্রবেশ পথ এবং উত্তর ও দক্ষিণে একটি করে প্রবেশ

Dhaka University Institutional Repository

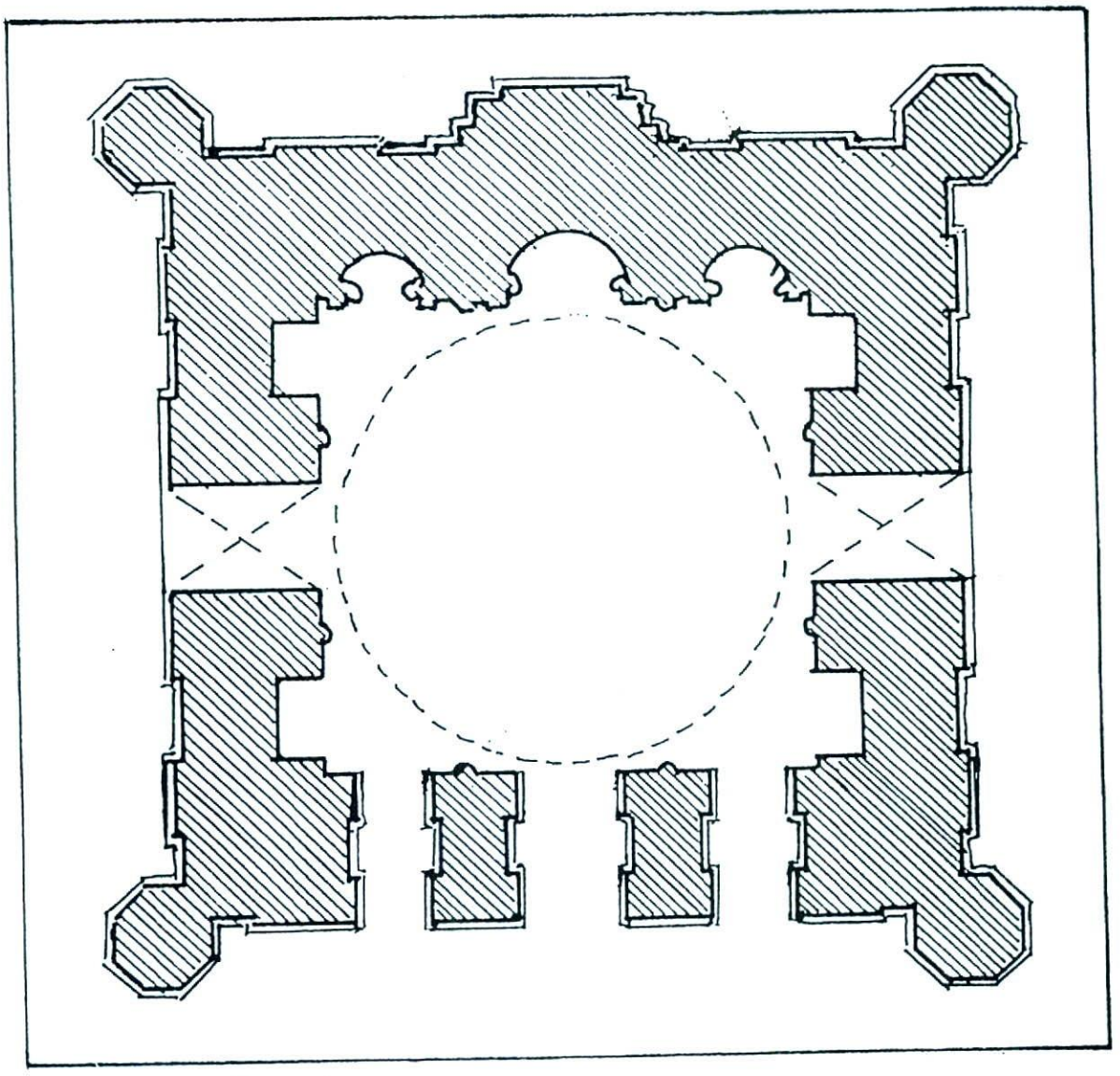

GROUND PLAN
GOALDI MOSQUE

ভূমিনকশা - ৭

Dhaka University Institutional Repository

পথ আছে। এই মসজিদে ব্যবহৃত সমস্ত খিলানই দ্বি-কেন্দ্রিক। পূর্বদিকের প্রবেশ পথসহ উত্তর ও দক্ষিণ দিকের প্রবেশ পথ গুলো ১·১০ মিটার প্রশস্থ। প্রধান প্রবেশ পথের পার্শ্ববর্তী প্রবেশ পথ দুটি ৮৪ সেন্টিমিটার প্রশস্থ। উত্তর ও দক্ষিণের বন্ধ কুলঙ্গি গুলো একই পরিমাপের। কিবলা দেয়ালের মিহরাব তিনটি পূর্বদিকের প্রবেশ পথের সমান্তরালে অবস্থিত এবং কেন্দ্রীয় মিহরাবটি পার্শ্ববর্তী মিহরাবগুলো অপেক্ষা বড়। মধ্যবর্তী প্রবেশ পথটিও অপেক্ষাকৃত বড়। কেন্দ্রীয় মিহরাবের ফাসাদ কালো ব্যাসাল্ট পাথরে তৈরী এবং পার্শ্ববর্তী মিহরাব গুলো ইটের তৈরী, প্রত্যেকটি মিহরাবই কারুকার্য খচিত। আহমদ হাসান দানীর মতে কেন্দ্রীয় মিহরাবটি অ্যারাবেস্ক নকঁশা দ্বারা অলংকৃত ছিল।[২৫]

চিত্র নং-১৪ গোয়ালদি মসজিদের পশ্চাৎ দেয়াল

মসজিদের দেয়ালের চারকোণে চারটি বৃত্তাকার বুরুজ আছে, বুরুজের নীচের অংশে অলংকৃত ব্যান্ড দেখতে পাওয়া যায়। বুরুজ নির্মাণের রীতি হতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে বুরুজের তলদেশ এবং কোণার দেয়াল পরস্পরের মধ্যে আবদ্ধ নয়। শুধু কোণার দেয়ালের

Dhaka University Institutional Repository

সংলগ্ন হয়ে আছে এবং এই স্থান হতে অবশিষ্ট গোলাকৃতিটি দৃষ্টিগোচর হয়। নির্মাণের এই রীতিটি খুব সম্ভবতঃ ভুল এবং পুনঃনির্মাণের সময় এই ভুলটি হয়েছে।[২৬] প্রত্যেক দেয়ালে নির্দিষ্ট দূরত্বে দু'টি করে পাথরের স্তম্ভ আছে।

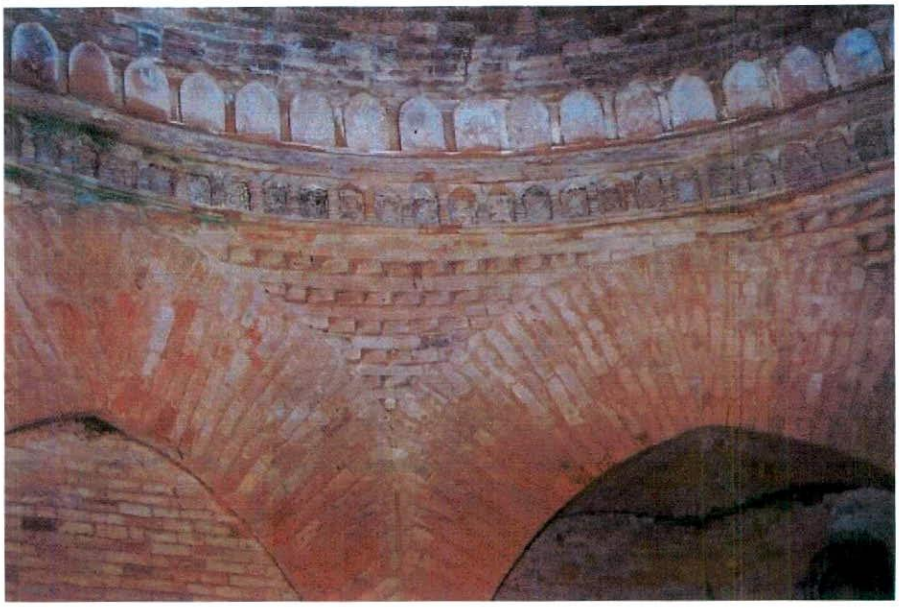

চিত্র নং- ১৫ গোয়ালদি মসজিদের বাংলা পেন্ডেটিভ

বর্গকার মসজিদটিতে গম্বুজ নির্মাণের জন্য 'স্কুইঞ্চের' দ্বারা মসজিদের অভ্যন্তর দিকে অষ্টকোণাকার করা হয়েছিল এবং প্রত্যেক কোণে ছিল খিলান। পরে কিছুটা ঢালু 'পেনডেনটিভ' তৈরী করা হয়েছে যার উপর গোলকবৎ গম্বুজটি নির্মাণ করা হয়েছিল। এখানে ব্যবহৃত পেনডেনভটি 'বাংলা পেনডেনটিভ' নামে পরিচিত।[২৭] গম্বুজের নীচের অংশ অত্যন্ত মনোরম ভাবে মারলন নকশা করা হয়েছে। মসজিদের অভ্যন্তরে মোট আটটি সরু থাম আছে যা মূলতঃ অলংকরণের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণ আলোচনা

মধ্যযুগে দক্ষিন-পূর্ব বাংলার রাজধানী ছিল সোনারগাঁও। সুতরাং এই অঞ্চলকে কেন্দ্র করে সেসময় এখানে প্রচুর স্থাপত্য ইমারত গড়ে উঠেছে। মুঘল আমল থেকেই সোনারগাঁয়ের গুরুত্ব হ্রাস পেতে থাকে। ফলে একসময়ের শিক্ষা দীক্ষা জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই কেন্দ্রটি তার উজ্জ্বল্য হারাতে থাকে। রাজধানী সোনাগাঁয়ের অনেক স্থাপত্য ইমারতই কালের গর্ভে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে। সে সময়ের কম স্থাপত্যই এখন টিকে আছে। সেই গৌরবময় দিনের স্মৃতি হিসেবে ইংরেজ আমলে গড়ে উঠা পানাম নগরকে কেন্দ্র করে সোনারগাঁ তথা নারায়ণগঞ্জ আবার নতুন ভাবে পরিচিতি লাভ করেছে। যে সব ইমারত কালের গ্রাস থেকে রক্ষা পেয়েছে বর্তমানে সে গুলোই বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের তালিকাভূক্ত। এই তালিকার মধ্যে গোয়ালদী মসজিদ অন্যতম।

Dhaka University Institutional Repository

সুলতান গিয়াসউদ্দীন আযম শাহ নির্মিত সমাধি

অবস্থান

বাংলাদেশে সুলতানী আমলের টিকে থাকা একটি প্রচীন সমাধি। প্রস্তর নির্মিত শবাধার সম্বলিত এ সমাধিটি সোনার গাঁ উপজেলার মোগরা পাড়া ইউনিয়নের শাহচিল্লাপুর গ্রামের স্থানীয় ভাবে মগদিঘি নামে পরিচিত একটি মজা পুকুরের পাড়ে অবস্থিত । এটি বাংলার ইলিয়াস শাহী বংশের তৃতীয় সুলতান গিয়াসউদ্দীন আযম শাহ এর সমাধি বলে কথিত আছে।[২৮]

নির্মাণ তারিখ ঃ–

সমাধিটিতে কোন শিলালিপি পাওয়া যায়নি। ঐতিহাসিকদের মতে এটি আদিনা মসজিদের অলংকৃত নকশার অনুসরনে টিকে থাকা সর্বপ্রথম সৌধ।

চিত্র নং- ১৬ সুলতান গিয়াসউদ্দীন আযম শাহ নির্মিত সমাধি

Dhaka University Institutional Repository

স্থানীয় জনশ্রুতি মতে এটি সুলতান গিয়াস উদ্দিন আযম শাহের সমাধি। গিয়াস উদ্দিন আযম শাহ ১৪১১ খ্রীস্টাব্দে মৃত্যু বরণ করেন কাজেই সৌধটি পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নির্মিত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায়। সোনার গাঁয়ে নির্মিত এই সমাধিটিতে কে শায়িত আছেন তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে কারো কারো মতে এটি সিকান্দর সাহের সমাধি। কারণ সেকান্দর সাহ কর্তৃক নির্মিত আদিনা মসজিদের অলংকরণের সাথে এই সমাধি অলংকরণের সাদৃশ্য রয়েছে। স্থানীয় জনশ্রুতি অনুযায়ী এটি সিকান্দর সাহের পুত্র গিয়াস উদ্দিন আযম সাহের সমাধি। অলংকরণ রীতি থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় সমাধিটি স্থানীয় কোন প্রভাবশালী ব্যক্তির।

বর্তমান অবস্থা ঃ

বর্তমানে ইমারতটি প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর এবং জাদুঘরের তত্ত্বাবধানে সংরক্ষিত আছে। সম্প্রতি এই সমাধি সৌধের উপর একটি বর্গাকার কক্ষ তৈরী করায় সমাধিটি আধুনিক সমাধি সৌধের রূপ ধারণ করেছে।২৯

চিত্র নং- ১৭ সুলতান গিয়াসউদ্দীন আযম শাহ নির্মিত সমাধির বর্তমান অবস্থা

Dhaka University Institutional Repository

গঠন প্রনালী ও ভূমি নকশা

প্রাচীন সমাধিটি প্রস্তর দ্বারা নির্মিত। সমাধিটির দৈর্ঘ্য ২.৬৪ মিটার × ১.৪০ মিটার। ভিত হতে সমাধিটি ১.২২ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট। সমাধি ফলকটি অর্ধ বৃত্তাকার প্রস্তর সমন্বয়ে সৃষ্টি। এই সমাধিটির উপরের ফলকটি নীচে একটি টেবিলের আকৃতির পাথরের খন্ডের উপরে স্থাপিত। কালো পাথরের সম্প্রসারিত বর্গকারে উপরিভাগ সুক্ষ্ম খাঁজ নকশার সাথে মুক্তদানার নকশা দ্বারা অলংকৃত। অনুরূপ নকশা আদীনা মসজিদের বাদশাহ কা তখত" এ পরিলক্ষিত হয়। সমাধি গাত্রে পূর্ব ও পশ্চিম পার্শ্বে একটি করে প্যানেল রয়েছে। প্রতিটি প্যানেলে ত্রিখাঁজ খিলান কুলঙ্গি ও মধ্যভাগে ঝুলন্ত শিকল ঘন্টা মোটিফ দ্বারা সজ্জিত। এটি দেখতে খিলান যুক্ত জানালার ছাদ হতে ঝুলন্ত সিকা নকশার মতো দেখায় এবং আহমদ হাসান দানী একে একটি প্রদীপের মোটিফ বলে বর্ণনা করেছেন।

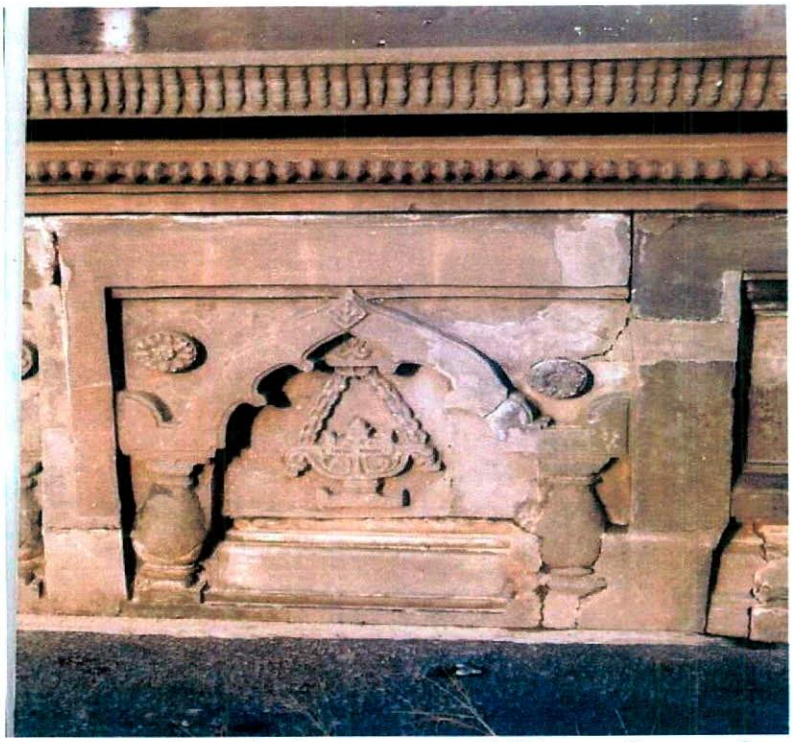

চিত্র নং- ১৮ সুলতান গিয়াসউদ্দীন আযম শাহ নির্মিত সমাধিতে প্রদীপদানি নকশা।

Dhaka University Institutional Repository

এ মোটিফের সঙ্গে আদিনা মসজিদ, সোনারগাঁ এর মুয়াজ্জমপুর মসজিদের পশ্চাৎ দেয়ালের মোটিফের এবং গোয়ালদী মসজিদের মোটিফের সাদৃশ্য রয়েছে। এর একমাত্র পার্থক্য হচ্ছে যে এখানে মসজিদ গুলিতে দুটি ঝুলন্ত শিকল আর আদিনা মসজিদের মিহরাবে একটি ঝুলন্ত শিকল । উত্তর দিকে এবং সমাধির অগ্রভাগে একটি বেলে পাথরের পিলার আছে যাতে একটি চেরাগদানী রয়েছে । নকশার ধরন এবং খোদাই কর্ম থেকে এটি আদিনা মসজিদের সমসাময়িক।

সাধারণ আলোচনা

এ প্রস্তর নির্মিত সমাধি সৌধে শায়িত ব্যক্তির শনাক্তকরণ সম্পর্কে পন্ডিতদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। স্থানীয় জনশ্রুতির ভিত্তিতে থেকে জানা যায় এটি গিয়াসউদ্দীন আযম শাহের সমাধি বলে মনে করেন। কিন্তু বুকানন লিখেছেন যে তাকে হযরত পন্ডিয়ার এক লাখী সমাধি সৌধে সমাহিত করা হয়েছিল সাহিত্যিক উৎস থেকে জানা যায় যে সুলতান সিকান্দার শাহ সোনার গাঁ হতে প্রায় বিশ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত সুননগর গ্রামের কাছে তার পুত্র গিয়াসউদ্দীনের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন। স্থানটি সাবেক ঢাকা জেলার জাফরা বাদ মৌজার বর্তমান সনগার ও কাঁটা সুরের নিকটবর্তী হতে পারে। গিয়াসউদ্দীন এ বিয়োগান্ত ঘটনায় শোক ভারাক্রান্ত হলেও তার পরিষদবর্গের উপর পিতার দাফনের দায়িত্ব ন্যাস্ত করে সিংহাসনে তার উওরাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি পান্ডুয়ার দিকে ধাবিত হন। এটাই অধিকতর সম্ভাব্য বলে মনে হয় যে সিকান্দার শাহকে তড়িঘড়ি করে সোনারগাঁয়ে দাফন করা হয়েছিল। আদিনা মসজিদের পেছনে যে প্রকোষ্ঠটিকে সাধারনত সিকান্দার শাহের কবর বলে শনাক্ত করা হয় তা মোটেও কবরের মত নয়। এক সময় এটি একটি নয় গম্বুজ বিশিষ্ট প্রকোষ্ঠ ছিল । বর্তমানে গম্বুজ গুলির কোন অস্থিত্ব নেই। এ প্রকোষ্ঠে কোন প্রস্তর নির্মিত কবর নেই সম্ভবত এটা ছিল একটা বিশ্রামাগার এবং এমন একটি স্থান যেখান হতে সুলতানের অশ্ব পেছনের একটি দরজা দিয়ে মসজিদের দ্বিতীয় তলায় পৌছতে পারত। এ

Dhaka University Institutional Repository

পথে মসজিদের মধ্যে সুলতানের জন্য সুরক্ষিত বেষ্টনী বাদশা কা তখত" এ যাওয়া যেত এ বৈশিষ্ট্যটি ছোট সোনা মসজিদ ও দরাসবাড়ি মসজিদ এর সঙ্গে অভিন্ন।

মুঘল আমলের স্থাপত্য

মুঘল আমলে সপ্তদশ শতকে ঢাকাকে প্রাদেশিক রাজধানী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করলে সোনারগাঁয়ের তথা নারায়ণগঞ্জের গুরুত্ব অনেকটা কমে আসে এবং ঢাকায় নির্মিত স্থাপত্য ইমারত সমূহের সাথে নারায়ণগঞ্জের স্থাপত্য ইমারতের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দী অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ কারণ এসময় মুঘলরা মসজিদের পাশাপাশি পবিত্রস্থান (যেখানে নবীজির পায়ের ছাপ এবং একজন ধার্মীক ব্যক্তির কবর আছে), দুর্গ,প্রবেশ তোরণ এবং সেতু নির্মাণ করে স্থাপত্য ক্ষেত্রে বৈচিত্র এনেছিল। গোয়ালদীর আব্দুল হামিদ মসজিদ ও বন্দরে নির্মিত কদম-রসূল মসজিদের শিলালিপি অনুযায়ী নির্মাণকাল পাওয়া যায়। তারিখ সমৃদ্ধ এ সকল ইমারতগুলো সহজেই মুঘল ইমারত হিসেবে চেনা যায়। সুলতানী স্থাপত্যের উপর মুঘল আমলে যে পুনঃসংস্কার হয়েছে বা বৃদ্ধি করা হয়েছে তা সহজেই বুঝতে পারা যায়। সুলতানী আমলে নির্মিত স্থাপত্যের প্রাদেশিক রীতি বেশী পরিলক্ষিত হলেও মুঘল আমলের নির্মিত স্থাপত্যে দিল্লী আগ্রার রাজকীয় স্থাপত্যের ছাপ পড়েছে। বাংলার মুঘল শাসন দৃঢ়করণের সাথে সাথে পূর্বাঞ্চলের সাথে উত্তরাঞ্চলের অনেক শতাব্দী পরে একটা যোগসূত্র স্থাপিত হয়। বাংলা ১৬১০ খ্রীঃ মুঘলদের অধীনে আসে এবং পরবর্তী বৎসর গুলোতে স্থাপত্যে তাদের প্রভাব পড়ে।

Dhaka University Institutional Repository

পাঁচ পীরের মসজিদ

সোনারগাঁ উপজেলার মোগরাপাড়া ইউনিয়নের ভগলাপুর গ্রামে পাঁচ পীরের সমাধি সংলগ্ন মসজিদটি অবস্থিত। স্থানীয় ভাবে এটি পাঁচ পীরের মসজিদ নামে পরিচিত। কেননা পাঁচ পীরের সমাধির উত্তর-পূর্ব দিকে এই মসজিদটি অবস্থিত। মসজিদটির স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য মুঘল আমলের স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্য থাকায় ধারণা করা যায় যে মসজিদটি সপ্তদশ শতকের শেষের দিকে এবং অষ্টদশ শতকের প্রথম দিকে নির্মিত হয়েছে।

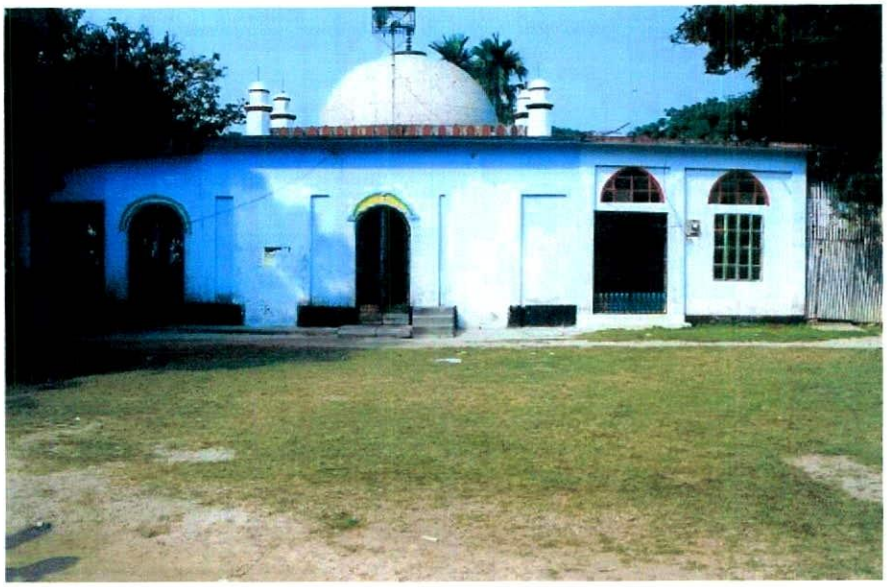

চিত্র নং- ১৯ পাচঁ পীরের মসজিদ

বর্তমান অবস্থা

পাঁচ পীরের মসজিদটি কয়েকবার পুনঃসংস্কার এবং সম্প্রসারণ করা হয়েছে বর্তমানে এটি স্থানীয় মসজিদ কমিটি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। প্রকৃত মসজিদটি ছিল একতলা বিশিষ্ট একটি প্রার্থনা গৃহ। পূর্বদিকে পরবর্তীতে একটি বারান্দা সংযোজন করা হয়েছে কিছু দিন পূর্বে মসজিদটি আবার পূর্বদিকে এবং দক্ষিণ দিকে বারান্দা সংযোজন করা হয়েছে।[৩০] উত্তর-পূর্ব কোনে একটি মিনার নির্মাণ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

গঠন প্রণালী ও ভূমি নকশা

প্রকৃত মসজিদটি ছিল এক গম্বুজ বিশিষ্ট বর্গাকার একটি ইমারত[৩১]। চারকোণে চারটি অষ্টভূজাকারে কর্ণার বুরুজ আছে এবং কোন বারান্দা ছিল না অভ্যন্তরভাগ ৫·৪০ মিটার বর্গাকার।[৩২] পূর্বদিকে তিনটি প্রবেশপথ আছে এবং কেন্দ্রীয় প্রবেশপথটি পার্শ্ববর্তী প্রবেশপথগুলো অপেক্ষা বৃহৎ এবং প্রশস্থ। প্রবেশপথগুলো ১·১৪ মিটার প্রশস্থ। উত্তর দক্ষিণের প্রবেশপথের পরিমাপ ৮৬ সেন্টিমিটার। এখানে ব্যবহৃত খিলান গুলো মুঘলরীতি অনুযায়ী চর্তুর্কেন্দ্রিক কিন্তু খুব নীচু। বহির্ভাগের দেয়াল অন্তরযুক্ত এবং প্যানেল নকশাকৃত। অভ্যন্তরভাগে নীচু চর্তুর্কেন্দ্রিক খিলান যার সাথে প্রবেশ পথে ব্যবহৃত চর্তুর্কেন্দ্রিক খিলানের মিল আছে।

গোলকবৎ গম্বুজটি একটি অষ্টভুজাকার ড্রামের উপর নির্মিত হয়েছে। গম্বুজের উপরিভাগে পদ্মফুল নকশা এবং কলস আকৃতি 'ফিনিয়েল' দ্বারা সজ্জিত। 'প্যারাপেটে' একসারি 'মারলন' নকশাকৃত 'ব্যান্ড' আছে। কোনার বুরুজগুলো 'প্যারাপেটের' উপর উঠে গেছে এবং 'কিউপোলা' 'ফিনিয়েল' দ্বারা আচ্ছাদিত। প্রবেশদ্বারের উপরিভাগে একটি পাথরের স্লাব আছে। অভ্যন্তরভাগে আটটি স্তম্ভ আছে যার উপরিভাগ অলংকৃত এবং মধ্যভাগ ট্যাপারীং করা। স্তম্ভের উপরিভাগ থেকে অভ্যন্তরভাগের খিলানগুলো উঠে গেছে এবং গম্বুজটি স্কুইঞ্চের উপর নির্মিত হয়েছে। কিছুটা গোলাকৃতি মিহরাবের খিলান গুলো নীচু এবং অন্যান্য খিলানের মতই চতুর্কেন্দ্রিক। কেন্দ্রীয় মিহরাবটি অন্যান্য গুলো অপেক্ষা বৃহৎ এবং আয়তাকার প্যানেলের মধ্যে নির্মিত। আয়তাকার প্যানেলের পিলার গুলো ট্যাপারীং করা।

Dhaka University Institutional Repository

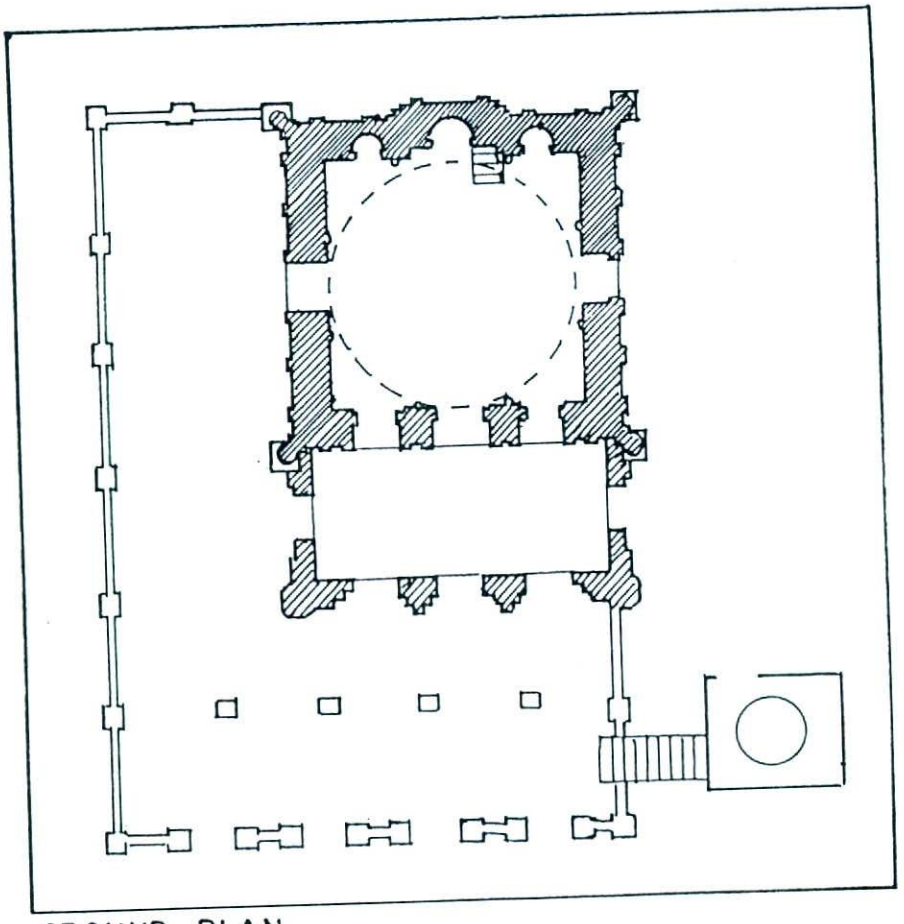

GROUND PLAN
PANCH PIR MOSQUE

ভূমিনকশা - ৮

Dhaka University Institutional Repository

আব্দুল হামিদ মসজিদ

সোনারগাঁ উপজেলার আমিনপুর ইউনিয়নের গোয়ালদী গ্রামে গোয়ালদী শাহী মসজিদের উত্তর দিকে আব্দুল হামিদ মসজিদটি অবস্থিত।

নির্মাণকাল

আব্দুল হামিদ মসজিদের প্রধান প্রবেশদ্বারের উপরিভাগে একটি শিলালিপি গ্রোথিত রয়েছে। এই শিলালিপি অনুযায়ী ১৭০৫ খ্রীঃ সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় জনৈক আব্দুল হামিদ কর্তৃক মসজিদটি নির্মিত হয়েছে।[৩৩]

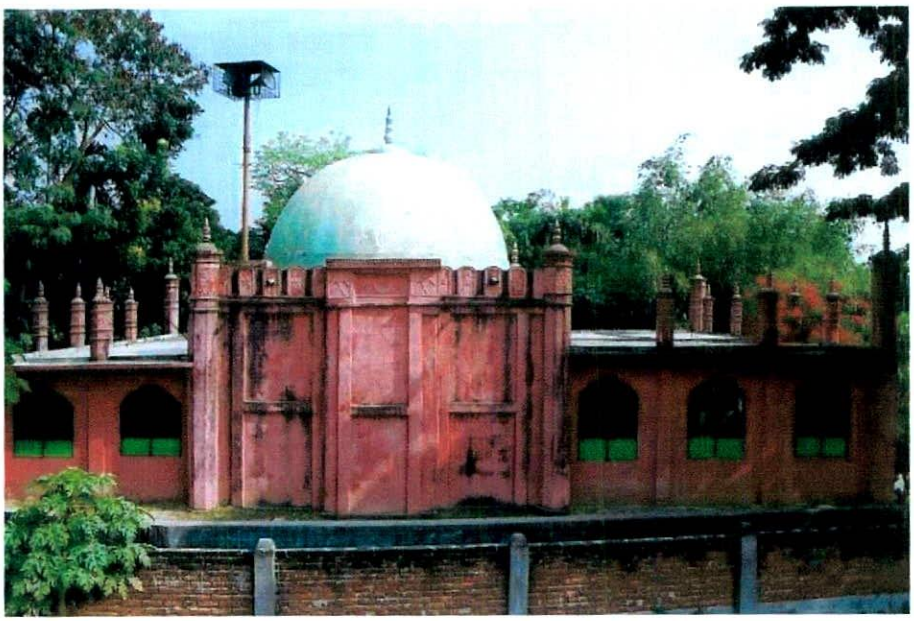

চিত্র নং- ২০ আবদুল হামিদ মসজিদ

পরিকল্পনা ও বর্ণনা

আব্দুল হামিদ মসজিদটি প্রকৃত পক্ষে একটি বর্গাকার এক গম্বুজ মসজিদ। বর্তমানে এই বর্গাকার মসজিদের তিন দিকে অর্থাৎ পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণ দিকে বারান্দা নির্মাণ করা হয়েছে। যার ফলে মসজিদটিকে আয়তাকার মনে হয়। বর্গাকার মসজিদের চার কোনে চারটি অষ্টকোনাকার বুরুজ রয়েছে যা বর্তমানে বাহ্যিক ভাবে দেখা যায় না কিন্তু মসজিদের

Dhaka University Institutional Repository

অভ্যন্তরভাগে দেখা যায়।[৩৪] মসজিদটির অভ্যন্তর ভাগের পরিমাপ ৫·০২ মিটার এবং বহির্দেওয়াল সহ ৬·৭৫মিটার।

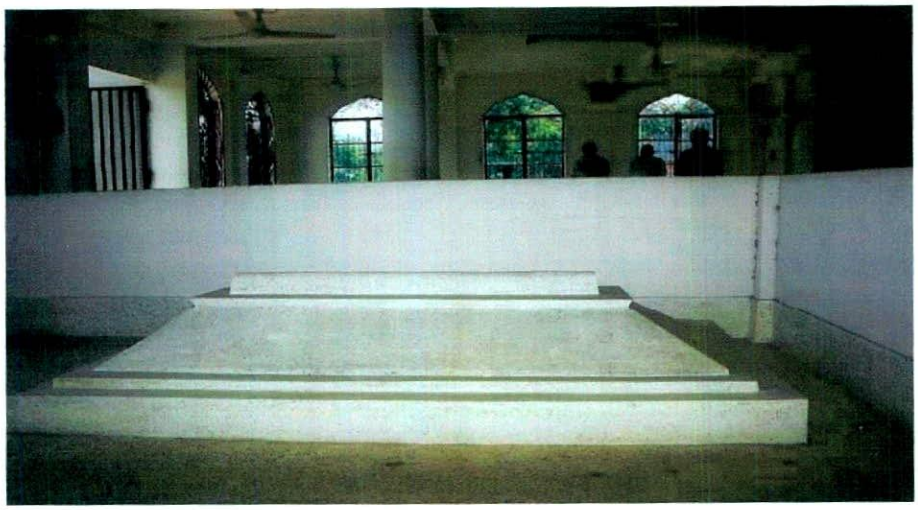

চিত্র নং- ২১ আবদুল হামিদ মসজিদের অভ্যন্তরের কবর

বর্গাকার মসজিদটিতে মোট পাঁচটি প্রবেশ পথ রয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণ দিকে একটি করে এবং পূর্ব দিকে তিনটি। পূর্বদিকের তিনটি প্রবেশ পথের মধ্যে কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথটি অন্যগুলো অপেক্ষা বড়। কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথটির দৈর্ঘ্য ১·৯২ মিটার এবং সম্মুখ ভাগে একটি কাল পাথরের খন্ড রয়েছে। মসজিদটিতে তিনটি মিহরাব রয়েছে। কেন্দ্রীয় মিহরাবটি অন্য দুটি অপেক্ষা বড় এবং অলংকৃত । মসজিদটি এত বেশী সংস্কার করা হয়েছে যে মিহরাবটি দেখতে একেবারে আধুনিক মনে হয়।

এ মসজিদের দক্ষিণ পূর্ব কোণে একটি কবর রয়েছে। এই কবরটি খুব সম্ভবত মসজিদ নির্মাণকারীর কবর। মসজিদের পশ্চিম দিকে বর্তমানে একটি মাদ্রাসা ও একটি এতিমখানা রয়েছে যা একটি কমিটি দ্বারা পরিচালিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

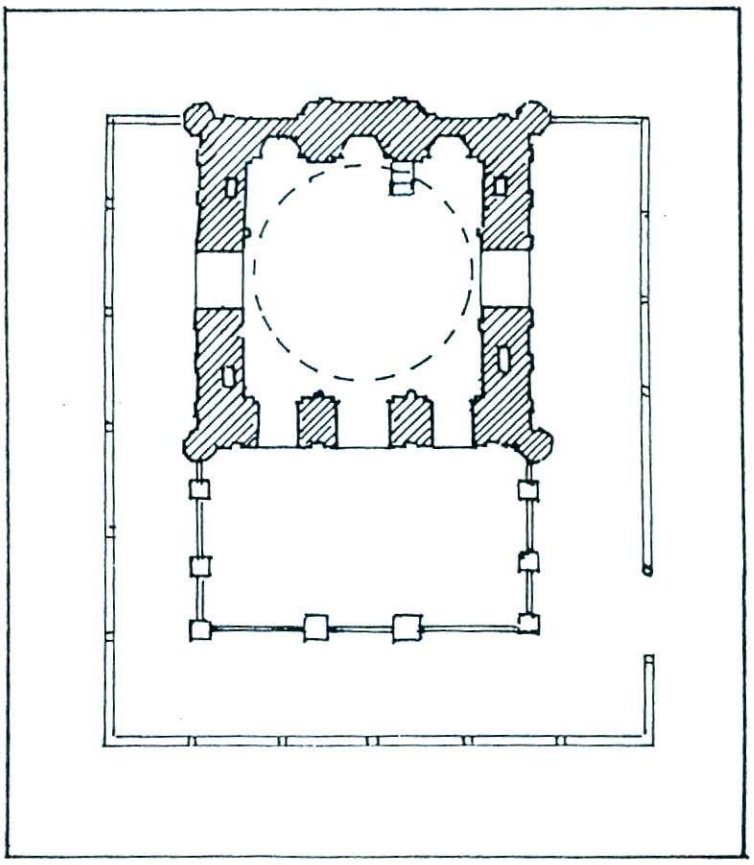

GROUND PLAN
ABDUL HAMID MOSQUE

ভূমিনকশা - ৯

Dhaka University Institutional Repository

বিবি মরিয়মের মসজিদ কমপ্লেক্স

নারায়ণগঞ্জ শহরের উত্তর সীমায় শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে হাজীগঞ্জ এলাকায় যে হাজীগঞ্জ দুর্গটি রয়েছে তার অনতি দূরে দক্ষিণদিকে খানপুর এলাকায় বিবি মরিয়মের সমাধি সৌধটি অবস্থিত।[৩৫] বিবি মরিয়মের মসজিদ সমাধি সৌধ কমপ্লেক্সটি এক বিস্তৃত পরিসর চত্বরে সন্নিবেশিত। এর মধ্যে রয়েছে মসজিদ, সমাধি সৌধ, অভ্যর্থনাগার প্রবেশ ফটক, মেকী কবর ইত্যাদি এদের সমন্বয়ে এই স্থানকে মসজিদ কমপ্লেক্স বলা চলে।

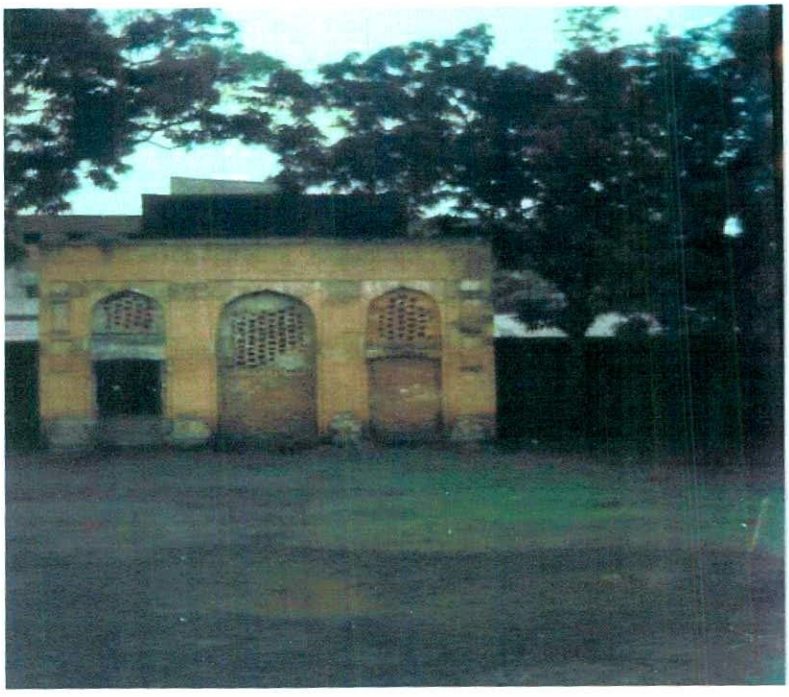

চিত্র নং-২২ বিবি মরিয়মের মসজিদ কমপ্লেক্সের প্রধান ফটক

মারলন অলংকরণে প্রাচীর ফটক সম্বলিত বিবি মরিয়মের মসজিদ কমপ্লেক্সের পশ্চিমে তিন গম্বুজ বিশিষ্ট বিবি মরিযমের মসজিদ এবংপূর্ব দিকে প্রবেশ তোবণসহ অতিথি অভ্যর্থনাগার । এই তিনটি ইমারত অর্থাৎ মসজিদ, সমাধি ও অভ্যর্থনাগার একই লাইনে নির্মীত । ইমারতগুলো প্রাচীর বেষ্টিত চত্বরের মাঝখানে অবস্থিত এবং এই সকলই ইমারতে একটি হতে আরেকটিতে যাওয়ার জন্য (অভ্যর্থনাগার হতে সমাধি ও সমাধি হতে মসজিদে) একটি জাফরী ইটের রাস্তা ছিল যার ধ্বংসাবশেষ আজও বিদ্যমান। উত্তর দিকে বেষ্টনী

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীরের মধ্যভাগে সমাধির কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথের সমান্তরালে এই প্রাঙ্গনের প্রবেশের প্রধান ফটক। প্রধান ফটকটি খিলান ও প্যানেল নকশা সমৃদ্ধ এবং উপরে ছোট গম্বুজ যুক্ত। এর তিনটি বন্ধ খিলান রয়েছে যার ফলে বর্তমানে তিনটি কক্ষের সৃষ্টি হয়েছে। এর তিনটি কক্ষের বাহির ও ভিতর দিকের খিলান তিনটি উম্মুক্ত ছিল যা দিয়ে ভিতর থেকে বাহিরে যাওয়া যেত। তিনটি খিলানের ফলে ৩ × ২ = ৬টি দরজার উদ্ভব হয়। বর্তমানে বাহিরের খিলান তিনটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অভ্যন্তর ভাগের খিলানগুলোর মধ্যে মধ্যবর্তী খিলানটি পার্শ্ববর্তীগুলো অপেক্ষাকৃত বড়। বর্তমানে পশ্চিম দিকের ছোট খিলানটি খোলা বাকী খিলান দুটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।। এই ইমারতটি প্যানেল আকৃতির নকশা সম্বলিত এবং ভল্ট (volt) আকৃতির ছাদ যুক্ত। বর্তমানে এটা দিয়ে যাতায়াত করা যায়না। এ খিলান গুলি কর্বেল পদ্ধতিতে নির্মিত। সম্ভবত এরূপ প্রবেশ ফটক দক্ষিণ দিকেও ছিল কেননা শীতলক্ষা নদীর বাঁক ঘোরার মোরে এই সমাধিটি অবস্থিত । সমাধিটি দক্ষিণমূখী তাই ধারনা করা হয় দক্ষিণ দিকে একটি প্রবেশ ফটক ছিল এবং খুব সম্ভব এটাই ছিল এই স্থানের প্রধান প্রবেশ ফটক; কেননা কোন ইমারতের পিছনের দিকে প্রধান প্রবেশ ফটক থাকে না। বর্তমানে যে প্রধান প্রবেশ ফটক আছে তা দেখে মনে হয় এটি প্রধান ফটক ছিল না। কেননা উত্তর দিকে একটি খাল আছে যা দিয়ে শীতলক্ষ্যা নদী হতে বুড়িগঙ্গা নদীতে যাওয়া যায়। খালের উত্তর পশ্চিম কোণে হাজীগঞ্জ দুর্গ অবস্থিত। সম্ভবত এই দুর্গ হতে সমাধিতে আসার জন্য উত্তর দিকের প্রবেশ ফটক ব্যবহার করত। এছাড়া সমাধির পূর্বে একটি অভ্যর্থনা কক্ষ আছে যাতে একটি ফটক আছে। ধারনা করা যেতে পারে এই ফটক আগে থেকেই ছিল। নদী ও খালের সংযোগস্থলের সাথেই অভ্যর্থনা কক্ষের অবস্থান থেকে অনুমিত হয় ফটক নদীপথে কেউ এই কমপ্লেক্সে আসতে চাইলে পূর্ব দিকের ফটক দিয়েই আসতে পারত।

Dhaka University Institutional Repository

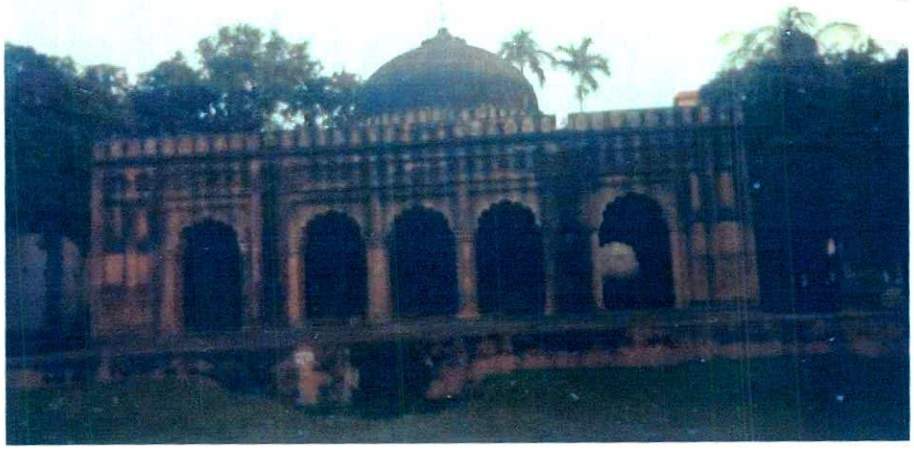

চিত্র নং- ২৩ বিবি মরিয়মের মসজিদ কমপ্লেক্সের সমাধি সৌধ

বিবি মরিয়মের সমাধিঃ–

বিবি মরিয়মের সমাধিটি এক গম্বুজ বিশিষ্ট ইমারত। এর প্রতি বাহু ১৫ মিটার ১৮ সেন্টিমিটার।[৩৬] মূল কেন্দ্রীয় গম্বুজ বিশিষ্ট কক্ষটির একেক দিকের দৈর্ঘ্য ৬ মিটার ৬২ সেন্টিমিটার। কেন্দ্রীয় শবাধার সম্বলিত কক্ষটি চার পার্শ্বে ৩ মিটার ৩০ সেন্টিমিটার প্রশস্থ বারান্দা দ্বারা পরিবেষ্টিত।[৩৭] চারদিকের টানা বারান্দা ভল্ট নির্ভর ছাদ দ্বারা আবৃত। এই ইমরতের দেয়াল প্রায় ৭৮ সেন্টিমিটার। এই মাজারের ভিত্তিমূল কাল ব্যাসাল্ট পাথরে নির্মিত। শবাধারটি পাথরে নির্মিত তবে কি পাথর তা বুঝা যাচ্ছে না কেননা পাথরের উপরে রূপালী রং ব্যবহার করা হয়েছে। অনেকে মনে করেন এই শবাধারটি সাদা মার্বেল পাথরের তৈরী। এ ধরনের সাদা মার্বেল পাথরের ব্যবহার বিবি পরীর সমাধি ও কুমারপুর (রাজশাহী) এর সমাধিতে প্রত্যক্ষ করা যায়। এই শবাধার জ্যামিতিক বৃত্ত সম্বলিত নকশা ও ফুল লতা-পাতা নকশা যুক্ত। এই সমাধির প্রধান নির্মাণ উপাদান ইট হলেও পাথরের ব্যবহার

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখযোগ্য এবং শবাধারটি ছয় ধাপ বিশিষ্ট ও সর্ব উপরের ধাপে নকশা রয়েছে। শবাধারটির চার দিকে বর্তমানে কাঠ ও গ্রীল দ্বারা বেষ্টনী দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় কক্ষের দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে রয়েছে খিলান দ্বারা সৃষ্ট প্রবেশ পথ। উত্তর ও পশ্চিমে ও প্রবেশ পথ আছে কিন্তু বর্তমানে সেগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ দিকের প্রধান প্রবেশ পথটির অলংকরণ থেকে বুঝা যায় প্রধান প্রবেশ পথটি ব্যাসাল্ট পাথরের খিলান আকৃতির। এতে পদ্মফুল, রোজেট ও দড়ি নকশা রয়েছে । বাকী তিন দিকের প্রবেশ পথের লিনটেল সাদা পাথরের । প্রত্যেক দিকে তিনটি করে খিলান নকশায় বিভক্ত অংশ আছে। বারান্দার বহির্দেয়াল পাঁচটি খিলানে বিভক্ত এবং খিলানগুলি বহু খাঁজ বিশিষ্ট সূঁচালো রীতির । ফাসাদে প্রথম ও চতুর্থ খিলানের পার্শ্বে দেয়ালে প্রবিষ্ট দুটি কুলঙ্গি রয়েছে। একমাত্র গম্বুজটি সুডৌল আকৃতির যা মুঘল স্থাপত্যে বিকশিত গম্বুজের নিদর্শণ। গম্বুজটি অষ্টকোণাকার মারলন নকশায় অলংকৃত। ড্রামের উপর নির্মিত গম্বুজের শীর্ষে রয়েছে পদ্মা পাপড়ি নকশা। এই স্থানের মারলন নকশায় বাংলার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য বিধৃত হয়েছে। কেন্দ্রীয় কক্ষের বারান্দার পূর্ব দিকে দুটি কবর এবং পশ্চিম দিকে চারটি কবর আছে যাদের একটিতে একজনের নাম কবর ফলকে লিপিবদ্ধ আছে। তাঁর নাম হযরত মাওলানা শহীদ আব্দুল লতিফ চিস্তী (রাঃ) গুজরাটি।

বিবি মরিয়মের সমাধিটি একটি উঁচু ভিত্তি মূলের উপর নির্মিত। সমাধিটির বারান্দা ভিত্তিমূল হতে একটু উঁচু এবং শবাধার কক্ষটি তার চেয়ে আরেকটু উঁচু এর কালো ব্যাসাল্ট পাথরে নির্মিত শবাধারটি আজও সম্পূর্ণ অবিকৃত ও অপরিবর্তিত অবস্থায় আছে। ঢাকায় প্রায় সব মুঘল ইমারতেই উচু মঞ্চের ভিত্তি প্রত্যক্ষ করা যায়। বেগম বাজারের করতলব খানের মসজিদ (১৭০৪ খ্রীঃ), সাত গম্বুজ মসজিদ (১৭শ শতাব্দী), মৃধার মসজিদ (১৭০৬ খ্রীঃ), হাইকোর্টের হাজী খাজা শাহবাজের মসজিদ ও সমাধি (১৬৬৯ খ্রীঃ) এই সব ইমারত বিবি মরিয়মের সমাধির ভিত্তিভূমির অনুরূপ উচ্চ ভিত্তি মঞ্চের উপরে নির্মিত।

Dhaka University Institutional Repository

এখানে ভিত্তি মঞ্চ নির্মাণে মুঘল সমাধি সৌধের বৈশিষ্ট্যই অনুসরণ করা হয়েছে। দিল্লীর হুমায়ুনের সমাধির ও আগ্রার তাজমহলের নির্মাণ পদ্ধতির প্রভাব এখানে সুস্পষ্ট।

সমাধির পূর্ব দিকে অতিথি অভ্যর্থনাগার (মেহমান খানা) মতান্তরে রক্ষীরুম। অভ্যর্থনাগারটির ছাদ ভল্ট দ্বারা আচ্ছাদিত এবং এতে তিনটি কক্ষ রয়েছে। মাঝের কক্ষটি প্রবেশ পথ হিসাবে ব্যবহৃত হত বলে (বাস্তব পর্যবেক্ষণ) জানা যায় এবং নির্মাণ পদ্ধতিতেও সেরূপ লক্ষণীয়। প্রবেশপথ হতে অভ্যর্থনা কক্ষ দু'টিতে যাওয়ার জন্য দু'টি খিলান বিশিষ্ট প্রবেশপথ রয়েছে। গঠনগত দিক থেকে কক্ষ দুটি একই রকম। এই কক্ষে রয়েছে পশ্চিম, পূর্ব ও উত্তর দিকে খিলান সম্বলিত প্রবেশ পথ বর্তমানে উত্তর দিকের প্রবেশপধ ছাড়া অন্য দুটি বন্ধ। যেহেতু এই কক্ষের তিন দিক খোলা ছিল এবং শীতলক্ষ্যা নদী ও খালের সংযোগ স্থলের দিক খোলা ছিল তাই আমরা একে অভ্যর্থনা কক্ষের চেয়ে রক্ষী রুম বলাটাই অধিক যুক্তি সংঙ্গত মনে করি। এই ইমারতের সামনের দিকে মোট পাঁচটি খিলান। বর্তমানে যার মাঝের খিলান খোলা বাকীগুলি গ্রিল দ্বারা বন্ধ। এই ইমারতের কার্নিশ ঢালু এবং এতে মোল্ডিং করে ঢেউ নকশা করা হয়েছে। ছাদের রেলিং জ্যামিতিক বৃত্ত সম্বলিত নকশা দ্বারা সজ্জিত। এই ইমারতের খিলানগুলি খাঁজ কাটা এবং এতে প্যানেল নকশা অধিক পরিমানে ব্যবহৃত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

বিবি মরিয়ম মসজিদ

বিবি মরিয়মের সমাধির প্রায় ৫০ মিটার পশ্চিমে বিবি মরিয়মের মসজিদ বা হাজীগঞ্জ মসজিদটি অবস্থিত। অনেকে এটাকে কিল্লা শাহী মসজিদও বলে থাকে। উত্তর দক্ষিণে লম্বা এই মসজিদের আয়তন বাইরের দিকে ১৫.২৪ মিটার × ৭ মিটার। পশ্চিম ও পূর্ব দিকের কেন্দ্র স্থলে ৬ মিটার আয়তনের একটি উদগত অংশ আছে। মসজিদের উত্তর ও দক্ষিণ দেয়াল দুটি মোটামুটি ০.৯১ মিটার পুরু। মসজিদটিতে এক আইল বিশিষ্ট সাহন নির্মাণ করা হয়েছে। এই মসজিদের উত্তর দিকে ৩ তলা মিনার এবং দক্ষিণ দিকে অযুর ব্যবস্থা করা হয়েছে। বর্তমানে মসজিদটি দ্বিতল করা হয়েছে।

চিত্র নং - ২৪ বিবি মরিয়ম মসজিদ

মূল মসজিদটির পূর্ব দিকে তিনটি উত্তর ও দক্ষিণ দিকে একটি করে মোট পাঁচটি প্রবেশপথ রয়েছে এবং প্রবেশপথগুলো খিলানাকৃতির। কিন্তু বর্তমানে উত্তর ও দক্ষিণ দিকের প্রবেশপথকে জানালায় রূপান্তর করা হয়েছে। ভিতরে পশ্চিম দেয়ালে আছে তিনটি মিহরাব। কেন্দ্রীয় মিহরাবটি পাশের দু'টি থেকে আকারে বড় এবং মিহরাবত্রয় পাঁচটি প্যানেলে বিভক্ত

Dhaka University Institutional Repository

এবং অবতলাকার। প্রধান মিহরাবটি জ্যামিতিক নকশা ও টাইলস দ্বারা অলংকৃত এবং এতে খিলান আকৃতির নকশাও ফুল পাপড়ি নকশা পরিলক্ষিত হয়।

মিহরাবের এক কোণে রয়েছে কাঠের তৈরী তিন ধাপ বিশিষ্ট মিম্বার যদিও এটা আধুনিক কালে সংযোজন করা হয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালের প্রবেশ পথ দুটি বাইরের দিকে সংকীর্ণ কিন্তু ভিতরের দিকে বেশ স্ফীত। দরজা জানালাগুলি দ্বিকেন্দ্রিক খিলান আকৃতির।

এই মসজিদে কুলঙ্গির ব্যবহার অধিক দেখা যায়। পশ্চিম দেয়ালে পাঁচটি উত্তরে দুটি দক্ষিণে দুটি ও পূর্বে দুটি করে মোট এগারটি কুলঙ্গি রয়েছে। মূল মসজিদটির মোটা স্তম্ভ রয়েছে। মোটা স্তম্ভের নীচের দিক অষ্টকোণাকার এবং মোল্ডিং নকশাযুক্ত। এই মসজিদের চারকোণায় চারটি টারেট আছে যা বর্তমানে সংস্কার করা হয়েছে।[৩৮] মসজিদের প্যারাপেট ও কার্নিশ সরল রেখায় নির্মিত যাতে মারলন নকশা রয়েছে। ছাদের উপরে আছে তিনটি গম্বুজ। কেন্দ্রীয় গম্বুজটি আকারে অন্য দুটির চেয়ে বড়। গম্বুজত্রয়ের ভিতরে ড্রামের মধ্যে বন্ধ খিলান রয়েছে এবং এই গম্বুজের ভার সম্পূর্ণ স্তম্ভের উপর পড়েছে সেই জন্য স্তম্ভ গুলি খুব মোটা করে নির্মাণ করা হয়েছে। বাইরের দিকে গম্বুজত্রয় অষ্টকোণাকার ড্রামের উপর স্থাপিত এবং ড্রামে মারলন ও মোল্ডিং নকশা বিশিষ্ট। গম্বুজ গুলিতে পদ্ম পাঁপড়ির নকশা রয়েছে এবং এগুলি চতুর্কেন্দ্রিক বা পেয়ারা আকৃতির গম্বুজ। আধুনিক অংশটি সমতল ছাদ দ্বারা আচ্ছাদিত।

মসজিদটি অসংখ্য প্যানেলে বিভক্ত। এবং এটির গম্বুজ ও গম্বুজ নির্মাণের পদ্ধতি অলংকরণ ইত্যাদি দেখে মনে হয় এটা মুঘল আমলের মসজিদ। বর্তমানে মসজিদটি সম্প্রসারণ করা হয়েছে ফলে মসজিদের প্রাচীন অংশ অপেক্ষা আধুনিক অংশটি বেশী দেখা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

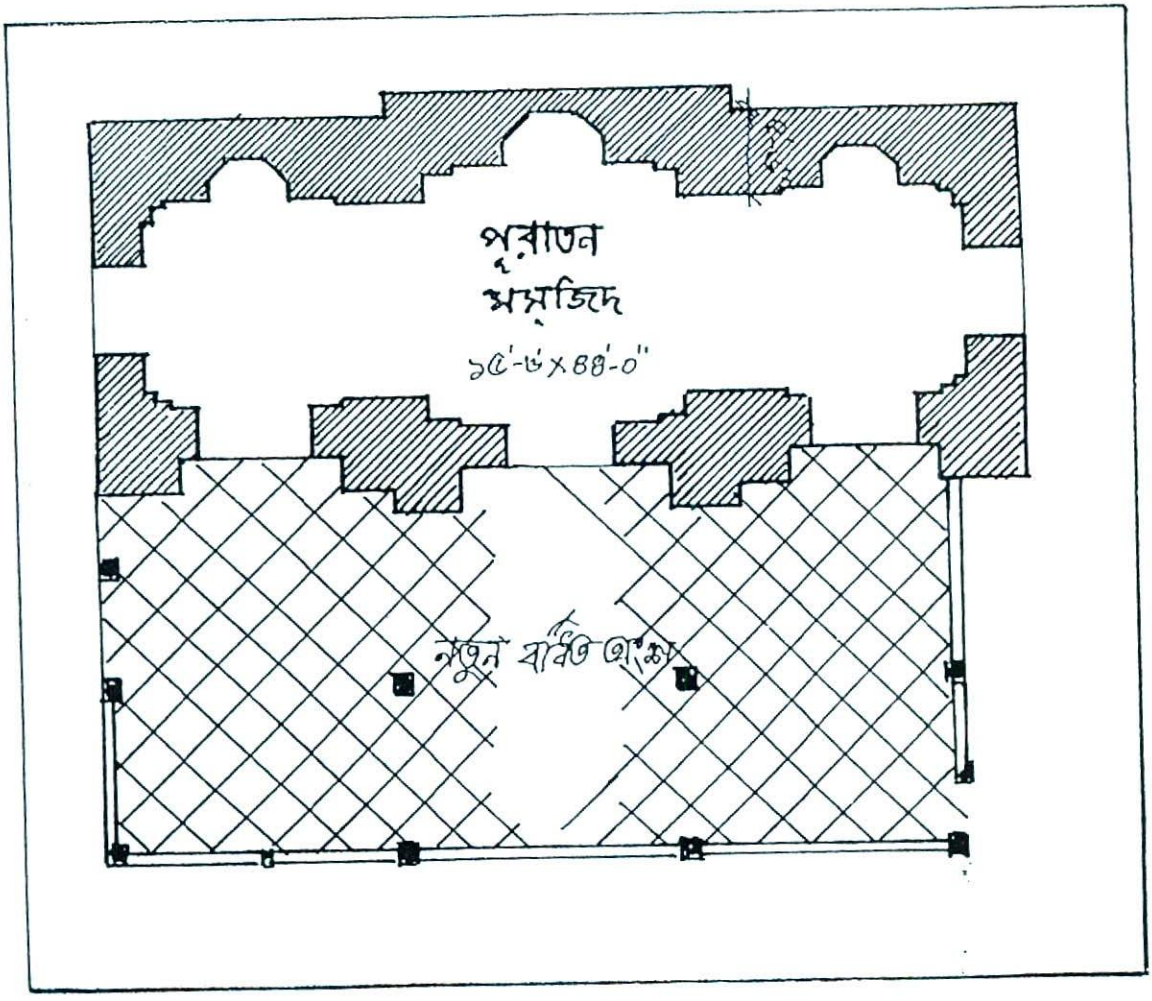

GROUND PLAN
BIBI MARIAM MOSQUE

ভূমিনকশা - ১০

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র নং- ২৫ মেকি খিলান

বিবি মিরিয়মের সমাধি চত্বরের পশ্চিম উত্তর কোনের প্রাচীরের বাইরে একটি কবরের মত ইমারত দেখা যায়, যা নিয়ে বহু মতভেদ আছে। বাস্তব পর্যবেক্ষণে মনে হয় এটা একটা মেকি কবর। এই কবরের দিকে যাওয়ার জন্য প্রাচীরে একটি ছোট প্রবেশ পথ আছে। (যা দিয়ে একজনের মত লোক যাতায়াত করতে পারবে) এবং মেকি কবরটি মূলত একটি কক্ষের ছাদে নির্মিত। তাই কক্ষের ভিতরে একটি কবর আছে বলে অনেকে মনে করেন কিন্তু বাস্তব পর্যবেক্ষনে দেখা যায় এতে কোন কবর নেই।[৩৯] এই কক্ষের উত্তর ও পশ্চিম দিক দিয়ে ছিল খাল এবং খালের কিছু দূরেই ছিল হাজীগঞ্জ দূর্গ তাই ধারণা করা হয় এই কক্ষটি হচ্ছে হাজীগঞ্জ দূর্গ হতে পালানোর একটি পথ যা দিয়ে এই সমাধি চত্বরে আসা যেত। তা ছাড়া এই সমাধি চত্বরের মাটির নীচে পালানোর জন্য কোন কক্ষ ছিল কিনা তা শুধু প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের মাধ্যমেই তা পরিস্কার বুঝা যাবে। কবর কক্ষটি তিনটি প্যানেলে বিভক্ত এবং ভিতরের দেয়ালগুলি বন্ধ খিলানাকৃতির এবং ছাদে রয়েছে একটি মেকি কবর। যাতে বাইরের থেকে বুঝা যায় ইহা একটি কবর।

Dhaka University Institutional Repository

আবার যেহেতু এটির পিছনে খাল আছে তাই মনে হয় নদীর সঙ্গে সংযোগ পূর্ণ পয়ঃপ্রনালীর ব্যবস্থা ছিল। সম্প্রতি প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে লাল বাগ দুর্গে পরিকল্পিত পয়ঃপ্রনালী ব্যবস্থার সন্ধান পাওয়া গেছে। হাজীগঞ্জের এ সমাধি কমপ্লেক্সের ক্ষেত্রে অনুরূপ ধারনা করা মোটেও অপ্রাসঙ্গিক হবে না। অনুমান করা হয় এই সমাধি প্রাঙ্গনে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের মাধ্যমে ঐ রূপ পয়ঃপ্রনালীর পরিকল্পনার সন্ধান পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। সম্পূর্ণ পরিকল্পনাকে স্থাপত্যের অঙ্গীভূত করা হয় বিবি মরিয়মের সমাধিতেও সম্ভবত সেই রীতি অনুসৃত হয়েছে। হাজীগঞ্জে বিবি মরিয়মের সমাধি কমপ্লেক্সের অবস্থান তাৎপর্যপূর্ন। হাজীগঞ্জের পূর্ব নাম ছিল খিজিরপুর। খিজিরপুর (হাজীগঞ্জ) দুর্গের পার্শ্বে এই সমাধির অবস্থান সমাধিটির গুরুত্ব সম্বন্ধে ইঙ্গিত প্রদান কছে। খিজিরপুর শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে যেখানে ধলেশ্বরী, মেঘনা ও বুড়িগঙ্গা একসঙ্গে মিলিত হয়েছে ঠিক সেখানেই অবস্থিত।

বিবি মরিয়মের পরিচয় নিয়ে মতভেদ আছে। কে এই বিবি মরিয়ম? নিশ্চয়ই কোন সুলতান সুবেদার, নওয়াব কিংবা সেই সময়ের গুরুত্বপূর্ণ পদে সমাসীন কোন ব্যক্তির তিনি বোন অথবা স্ত্রী হয়ে থাকবেন। সৈয়দ মোহাম্মদ তাইফুরের মতে বিবি মরিয়ম ছিলেন ঈশা খানের স্ত্রী। তাঁর মৃত্যুর পরে ঈশা খান এই সমাধি সৌধ নির্মাণ করেন। তাইফুরের মতে বিবি মরিয়ম সোনারগাঁয়ের ইব্রাহীম দানিশমন্দের কন্যা অথবা পৌত্রী ছিলেন।[৪০] বাংলার সুবেদার নওয়াব শায়েস্তা খানের এক কন্যার নাম সম্ভবত বিবি মরিয়ম।

সপ্তদশ শতকে নির্মিত বিবি পরীর সমাধি সৌধের স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্যের সাথে বিবি মরিয়মের সমাধি সৌধের স্থাপত্যিক বিশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ধারণা করা হয় সমাধি সৌধ দুটি প্রায় একই সময়ে নির্মিত হয়েছে। সাধারণ ভাবে বিবি মরিয়ম নওয়াব শায়েস্তা খানের একজন কন্যা। অতি প্রিয় কন্যার সমাধি বেষ্টিত মসজিদ সম্বলিত কমপ্লেক্সটি ঢাকায় অসংখ্য স্থাপত্যের নির্মাতা শায়েস্তা খান সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে নির্মাণ করেন। বিবি মরিয়মের সমাধি ইমারতের ভূমি নকশা নির্মাণ উপাদান, গম্বুজের আকৃতি পলেস্তরাকৃত দেয়াল প্যানেলের নকশা, বহু খাঁজ বিশিষ্ট খিলা অভ্যন্তরীণ ও বহির্ভাগে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ নির্মাণ সর্বোপরি সামগ্রিক স্থাপত্য শৈলীর পরিপ্রেক্ষিতে এই সমাধিটি সুপরিকল্পিত। বিবি মরিয়মের সমাধি সৌধের সাথে বিবি পরী ও শাহ নিয়ামত উল্লাহর সমাধির কিছু সাদৃশ্য রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

হাজীগঞ্জ মসজিদ

নারায়ণগঞ্জের হাজীগঞ্জ মৌজায় তল্লা এলাকায় একটি তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ আছে। পূর্বে এর নাম ছিল হাজীগঞ্জ মসজিদ কিন্তু বাস্তব পর্যবেক্ষনে দেখা যায় এর নাম তল্লা বড় মসজিদ।[৪১]

নির্মাণকাল

হাজীগঞ্জ মসজিদে কোন শিলালিপি না থাকায় এর প্রকৃত নির্মাণকাল জানা সম্ভব হয় নাই কিন্তু এই মসজিদের নির্মাণশৈলী থেকে ধারনা করা হয় এটি পঞ্চদশ শতকে নির্মিত হয়েছে।

বর্তমান অবস্থা

তল্লা হাজীগঞ্জ মসজিদটি কয়েকবার পুনঃসংস্কার করা হয়েছে এবং প্রবেশ পথ, জানালা ও বারান্দা সংযোজন করা হয়েছে।

পরিকল্পনা ও বর্ণনা

তল্লা হাজীগঞ্জ মসজিদটি আদিতে উত্তর দক্ষিণে লম্বা। আয়তন বাইয়ের দিকে দৈর্ঘ্য ৬ মিটার ও প্রস্থে ৭ মিটার। ব্রিটিশ আমলে এ মসজিদ ৩মিটার ৪৮ সেন্টিমিটার বর্ধিত করা হয় এবং বর্তমানে এই মসজিদকে আরও বর্ধিত করে পূর্ণ মসজিদটির লম্বা ১৮ মিটার ২৯ সেন্টিমিটার ও প্রস্থ ১৭ মিটার ৩৭ সেন্টিমিটার করা হয়।[৪২] ফলে আদি মসজিদটি নতুনের ভিড়ে দেখাই যায় না।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র নং-২৬ হাজীগঞ্জ মসজিদ

আদি মসজিদটির চার কোণায় চারটি অষ্টভুজাকার বুরুজ রয়েছে এবং প্রধান মিহরাবের দুই দিকে দুটি জোড়া স্তম্ভ রয়েছে। ব্রিটিশ আমলে বর্ধিত অংশে ছয়টি স্তম্ভ রয়েছে এবং আদি মসজিদের সামনে তিনটি প্রবেশপথ এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিকে দুটি প্রবেশপথ ছিল যা বর্তমানে জানালা হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। পূর্ব দিকে প্রবেশ পথের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পশ্চিম দেয়ালে রয়েছে দুটি প্রবেশপথ এবং একটি মিহরাব। পশ্চিম দেয়ালের প্রবেশপথ দিয়ে জানাজা দেওয়ার স্থানে যেতে হয় যা এই মসজিদের একটি ব্যতিক্রমধর্মী বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যটি অন্য কোন মসজিদে দেখা যায় না। অনেক মসজিদে কিবলা দেয়ালে একটি প্রবেশ পথ দেখা যায় ঈমাম সাহেবের মসজিদে প্রবেশের জন্য

এই মসজিদের মিহরাবটি অবতলাকার কালো ব্যাসাল্ট পাথরে নির্মিত এবং অধিক অলংকৃত। এই মিহরাবটির প্রস্থ ৯১ সেন্টিমিটার উচ্চতা ২ মিটার ১৩ সেন্টিমিটার গভীরতা ১ মিটার। এই মিহরাবটি খাঁজ কাটা খিলানের নকশায় নির্মিত তাছাড়া ফুল লতা-পাতা দ্বারা

Dhaka University Institutional Repository

অলংকৃত করা হয়েছে। এই অলংকরণ ১৪৮২ খৃষ্টাব্দে নির্মিত খন্দকারবাগ মসজিদের অলংকরণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

চিত্র নং-২৭ হাজীগঞ্জ মসজিদের কোণার বুরুজ

ব্রিটিশ আমলে মসজিদটি বর্ধিত করা হয়। নতুন বর্ধিত অংশে পূর্ব দিকে পাঁচটি এবং উত্তর ও দক্ষিণে দুটি করে প্রবেশপথ রয়েছে বর্তমানে দক্ষিণ দিকের প্রবেশপথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অনেক গ্রন্থে আছে এ মসজিদটি চারটি গম্বুজ বিশিষ্ট একটি মসজিদ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে (কিবলা কক্ষের গম্বুজ + বারান্দার ৩টি গম্বুজ)। বাস্তব পর্যবেক্ষণে দেখা যায় এতে তিনটি গম্বুজ রয়েছে।[৪৩] মাঝের গম্বুজটি পার্শ্বের দুটি গম্বুজ থেকে বড়। গম্বুজত্রয় অষ্টকোণাকার ড্রামের উপর নির্মিত এবং মারলন নকশায় অলংকৃত। বুরুজ চারটি ছোট 'কিয়স্কযুক্ত'। বিবি মরিয়মের মসজিদের ন্যায় এই মসজিদের গম্বুজের শীর্ষ পদ্ম পাপড়ির নকশা সম্বলিত ফিনিয়ালযুক্ত। গম্বুজত্রয়ের ভিতরের দিকে ড্রামে এক সারি বন্ধ খিলান নকশা তার উপর এক সারি মারলন নকশা এবং শীর্ষভাগে লতা-পাতা নকশা রয়েছে। এই গম্বুজত্রয় পেনডেনটিভগুলো লিনটেল থেকে উপরে উঠে গেছে যা আমার কাছে

Dhaka University Institutional Repository

নতুন মনে হয়েছে এবং এই লিনটেলে নকশা রয়েছে। গম্বুজ গুলি ভিতর থেকে দেখলে মনে হয় গম্বুজের ভার লিনটেলে পড়েছে।

চিত্র নং-২৮ হাজীগঞ্জ মসজিদের খাজ খিলান

আদি মসজিদটিতে বিবি মরিয়মের মসজিদের ন্যায় বহু কুলঙ্গি রয়েছে। এই মসজিদের চারদেয়ালে মোট আটটি কুলঙ্গি আছে। মসজিদের কার্নিশ সহজ ভাবে কোনার বুরুজের দিকে ঢালু। এর ফলে এটাতে এমন এক ধরনের চমৎকার অলংকারিক কৌশল আবিস্কৃত হয়েছে যা সুলতানী আমলের অলংকরণের সাথে সাধারণ সূত্রে গ্রথিত।

তারিখ বিহীন এই মসজিদটি বন্দরে ১৪৮২ খ্রীষ্টাব্দে বাবা সালেহ কর্তৃক নির্মিত। হাজী বাবা সালেহ মসজিদের সাথে সাদৃশ্য বজায় রেখেছে এই জন্যই মনে হয় এই মসজিদটি সেই যুগের পর্যায়ভূক্ত। জেমস ওয়াইজ এই মসজিদের অলংকরণের ভূয়সী

Dhaka University Institutional Repository

প্রসংশা করেছেন কিন্তু তিনিও এর নির্মাণ তারিখ সম্বন্ধে কিছু বলতে পারেন নি। তিনি মনে করেন যে এই মসজিদটি মীর্যা নাথান কর্তৃক নিমিত হয়েছিল।

এই স্থানটির নাম হাজীগঞ্জ। জনৈক হাজী বাবা সালেহ সুলতান জালাল উদ্দিন ফতেহ শাহের শাসনকালে সোনারগাঁয়ের এই অঞ্চলটির মালিক বা রাজ্যপাল ছিলেন। আর বন্দর ছিল এই সোনারগাঁ ইকলিমেরই অর্ন্তভুক্ত। বন্দরের হাজী সালেহ বাবার মসজিদটির সাথে এই মসজিদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে এই জন্যই মনে হয় একই সময় একই ব্যক্তি এই মসজিদ দুটি নির্মাণ করেছিলেন। এই স্থানের নাম সম্ভবত এই মসজিদ হতেই উৎপত্তি লাভ করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

দোলারদী মসজিদ

সোনারগাঁ উপজেলার সামন্দী ইউনিয়নের দোলারদী গ্রামে মসজিদটি অবস্থিত।[৪৩] গ্রামটির নামানুসারে মসজিদটির নাম করা হয়েছে। লাঙলবন্দ থেকে নৌকা যোগে নয়াপাড়া থেকে পঞ্চমীঘাট এবং সেখান থেকে ব্রহ্মপুত্র নদী এক কিলোমিটার অতিক্রম করে উত্তর দিকে গেলে এই মসজিদটি চোখে পড়ে। মসজিদের দক্ষিণ দিকে দুইটি পুরাতন কবর আছে।

নির্মানকাল

খুব সম্ভবত মসজিদটি সপ্তদশ শতকের শেষের দিকে বা অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে নির্মিত হয়েছে।

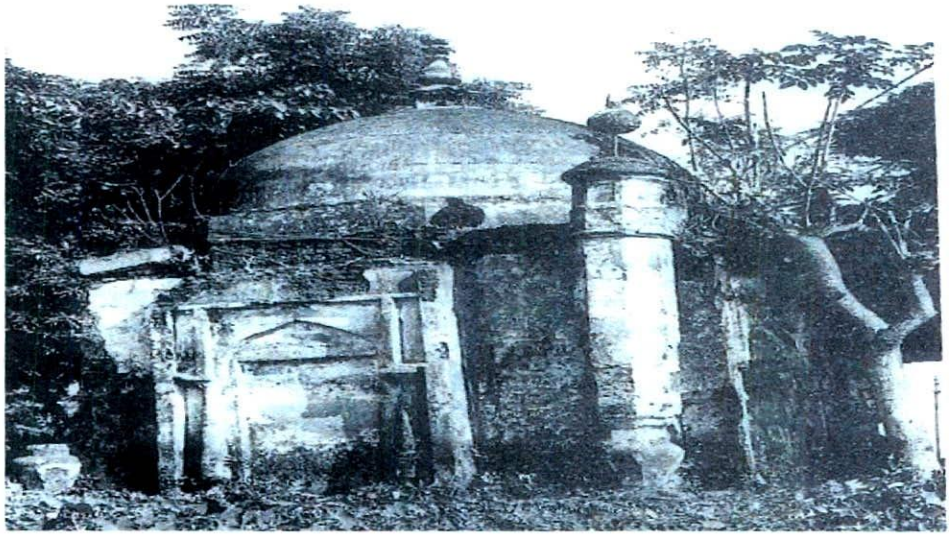

চিত্র নং ২৯ দোলারদী মসজিদ

বর্তমান অবস্থা

প্রায় ধ্বংস প্রাপ্ত মসজিদটি এখনও গ্রামবাসী শুক্রবার জুম্মার নামাজের জন্য ব্যবহার করে। একটি কমিটি এই মসজিদের দেখাশোনা করা সত্ত্বেও বর্তমানে মসজিদটি খুবই অবহেলিত অবস্থায় আছে। মসজিদটির মেঝে পাকা, কিন্তু বারান্দাটি টিন দ্বারা আচ্ছাদিত এবং স্তম্ভ হিসাবে বাঁশ ব্যবহার করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

পরিকল্পনা এবং বর্ণনা

খুবই ছোট ইমারতটি বর্হিদেয়ালসহ ৩·৮৫ বর্গ মিটার দীর্ঘ এবং অভ্যন্তর ভাগ ২·২৬ বর্গ মিটার দীর্ঘ।[৪৪] চার দিকে চারটি অষ্টভুজাকার কর্ণার বরুজ আছে। বুরুজের ভিত কলসাকৃতির যার একটি মাত্র বিদ্যমান আছে বাকীগুলো ভেঙে গেছে। মসজিদে প্রবেশের জন্য একটি মাত্র প্রবেশপথ আছে। প্রবেশ পথটি ৮০ সেন্টিমিটার প্রশস্থ এবং ১ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট। খিলানের বহির্ভাগে ঢেউ খেলানো নকশা সম্বলিত ষ্ট্যাকো নকশা পরিলক্ষিত হয় এবং দুই দিকে দুটি টারেট সংযুক্ত আছে। দক্ষিণ, পশ্চিম এবং উত্তর দিকের দেয়ালে আয়তাকার ফ্রেমের মধ্যে বন্ধ খিলান সারি এবং সংযুক্ত স্তম্ভ পরিলক্ষিত হয়। দক্ষিণ দিকের খিলানের স্প্যানড্রিল এবং চূড়ায় এখনও স্ট্যাকো নকশা পরিলক্ষিত হয়। গোলকবৎ উচ্চ গম্বুজটি একটি অষ্টভুজাকার ড্রামের উপর নির্মিত হয়েছে এবং গম্বুজের চূড়ায় পদ্মফুল নকশা এবং ফিনিয়েলে কলম নকশা পরিলক্ষিত হয়।

অভ্যন্তরভাগে গম্বুজটি কৌনিক ত্রিভুজাকার পেনডেনটিভ দ্বারা আচ্ছাদিত। মিহরাব সংলগ্ন স্তম্ভটি কিছুটা গোলাকার ছোট গম্বুজের আকৃতির তথা প্রবেশ পথের অনুরূপ, সবগুলো খিলানই চতুর্কেন্দ্রিক, কিন্তু প্রবেশ পথের খিলান পলেস্তরার জন্য সরল আকার ধারণ করেছে। এই মসজিদটিতে একসাথে ছয় জন লোক নামাজ পড়তে পারত খুব সম্ভব এই ধরনের মসজিদ ব্যক্তিগত মসজিদ ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

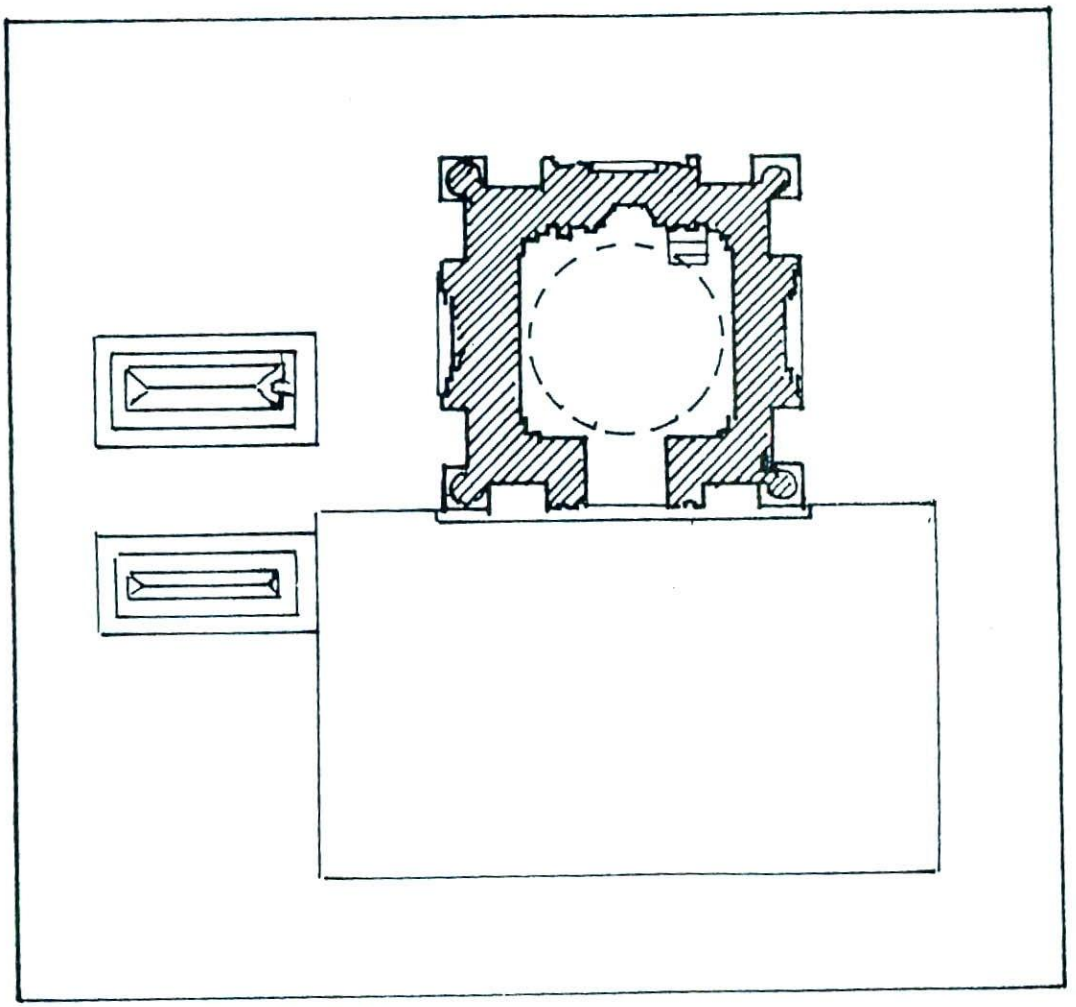

GROUND PLAN
DAULARDI MOSQUE

Dhaka University Institutional Repository

দরিকান্দি মসজিদ

সোনারগাঁ উপজেলার সামান্দী ইউনিয়নের ফতেহপুর মৌজার দরিকান্দি গ্রামে এই মসজিদটি অবস্থিত।[৪৫] এই মসজিদে যাওয়ার জন্য লাঙলবন্ধ থেকে নৌপথে আলীপুর বাজার এবং রিক্সা করে ৩ কি.মি. উত্তর পশ্চিমে গেলে গ্রামটিতে পৌছা যায়। দোলারদী মসজিদ থেকে নদীপথেও এই মসজিদে যাওয়া যায়।

চিত্র নং-৩০ দরিকান্দি মসজিদ

নির্মাণকাল

প্রকৃত মসজিদটি দেখতে দোলারদী মসজিদের মতই এবং সপ্তদশ শতকের শেষের দিকে এবং অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে নির্মিত।

Dhaka University Institutional Repository

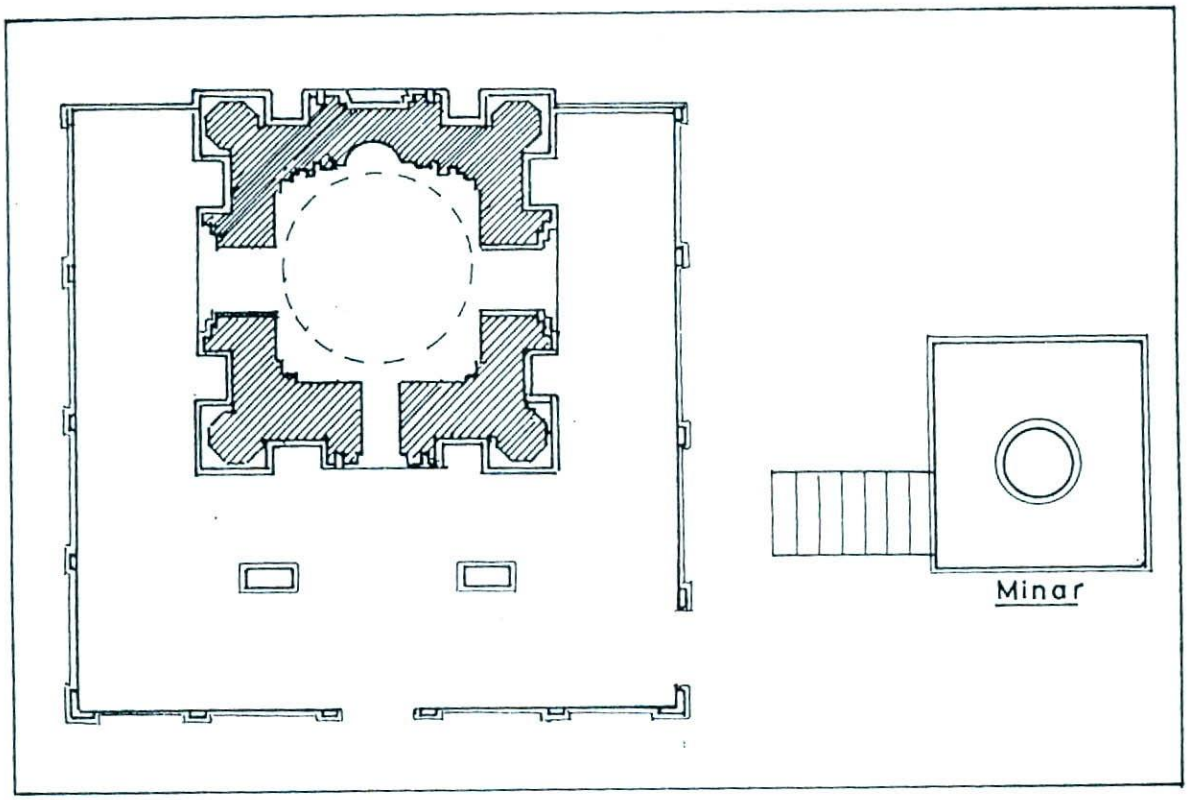

DARIKANDI MOSQUE
GROUND PLAN

ভূমিনকশা - ১২

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান অবস্থা

কয়েক বার পুনসংস্কার এবং বৃদ্ধি করা হয়েছে। উত্তর দক্ষিণ এবং পূর্বদিকে বারান্দা সংযোজন করা হয়েছে। উত্তর এবং দক্ষিণ দিকে প্রবেশ পথ আছে। একটি মাদ্রাসা এবং মিনার উত্তর দিকে আছে। বেশীর ভাগ সংস্কারই ১৯৪৫ সালে করা হয়েছিল। বর্তমানে এটি জামে মসজিদ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং একটি কমিটি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে।

পরিকল্পনা এবং বর্ণনা

দরিকান্দি মসজিদটি এক কক্ষ বিশিষ্ট বর্গাকার মসজিদ। এর চার কোনে চারটি অষ্টভূজাকার কর্ণার টাওয়ার আছে এবং টাওয়ার গুলো দেখতে দোলারদী মসজিদে নির্মিত টাওয়ারের অনুরূপ। অভ্যন্তর ভাগের পরিমাপ ২.২৫ বর্গ মিটার বর্গাকার।[৪৬] বেশীর ভাগ অংশই ধ্বংস হয়ে গেছে এবং বর্তমানে মেরামত আস্তর এবং রং করা হয়েছে পূর্বদিকে একটি আদি প্রবেশ পথ রয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণ দিকে প্রবেশ পথ দু'টি বর্তমানে জানালা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। মিহরাবের অভ্যন্তরভাগে ও রং করা হয়েছে গম্বুজটি পেনডেনটিভের উপর নির্মিত হয়েছে। মসজিদে ছয় জন লোকের নামাজ পড়ার ব্যবস্থা আছে। পশ্চিম দিকের দেয়ালে তিনটি মিহরাব আছে এবং কেন্দ্রীয় মিহরাবটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। উত্তর দিকের মিহরাবটি জানালা হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বহির্দেয়াল নতুন ভাবে আস্তর করে রং দেওয়া হলেও মুঘল আমলের আয়তাকার প্যানেল নকশা এখনও দৃষ্টিগোচর হয়। গম্বুজটি গোলকবৎ এবং পদ্মফুল ও কলস নকশা ফিনিয়েল যুক্ত এবং কার্নিশে একসারি মারলন নকশা আছে যা উজ্জ্বল রং করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

বাড়ি মজলিস জামে মসজিদ

অবস্থান

এই মসজিদটি বাড়ি মজলিস গ্রামে, ইউনিয়ন মোগরাপাড়া, থানা সোনারগাঁয়ে অবস্থিত এই গ্রামটি মোগরাপাড়া হতে অর্ধ কিলোমিটার উত্তর দিকে এবং চট্টগ্রাম মহাসড়কের পূর্ব দিকে অবস্থিত।

নির্মাণ কাল

বাড়ি মজলিস জামে মসজিদটিতে গম্বুজের নিচে সম্মুখ ভাগে এই মসজিদের শিলালিপিটি অক্ষত অবস্থায় দৃশ্যমান। অতীতে আলেক জান্ডার কানিংহোম ও ব্লখম্যান এই মসজিদের নিমার্ণ কাল ভুলবসত ১১৮২ হিজরী (১৯৬৮ খৃ:) উল্লেখ করেন।৪৭ ১৯৯৫ খৃ: এক জরিপে এই শিলালিপির শুদ্ধ পাঠ গ্রহণ করা হয়েছে। এ দেশের প্রতিষ্ঠিত এপিগ্রাফিষ্ট আবদুল কাদেরের পাঠ অনুযায়ী এই মসজিদের নির্মাতা ছিলেন। সোনারগাঁয়ের ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে মসজিল বস্ত্রের নিরীক্ষক শেখ গরীবুল্লাহ। এইজন্য মসজিদটি গরীবুল্লাহ্‌র মসজিদ নামেও পরিচিত।

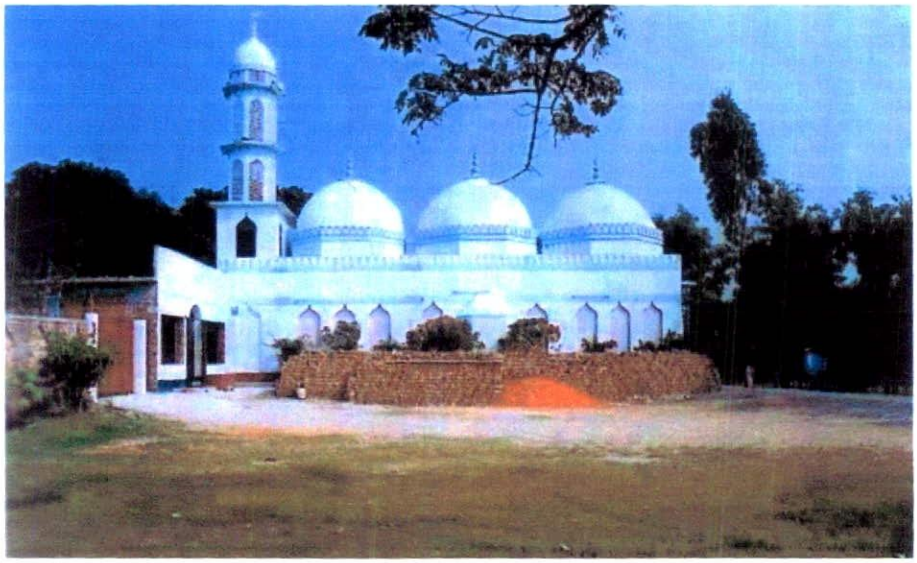

চিত্র নং- ৩১ বাড়ি মজলিস জামে মসজিদ।

Dhaka University Institutional Repository

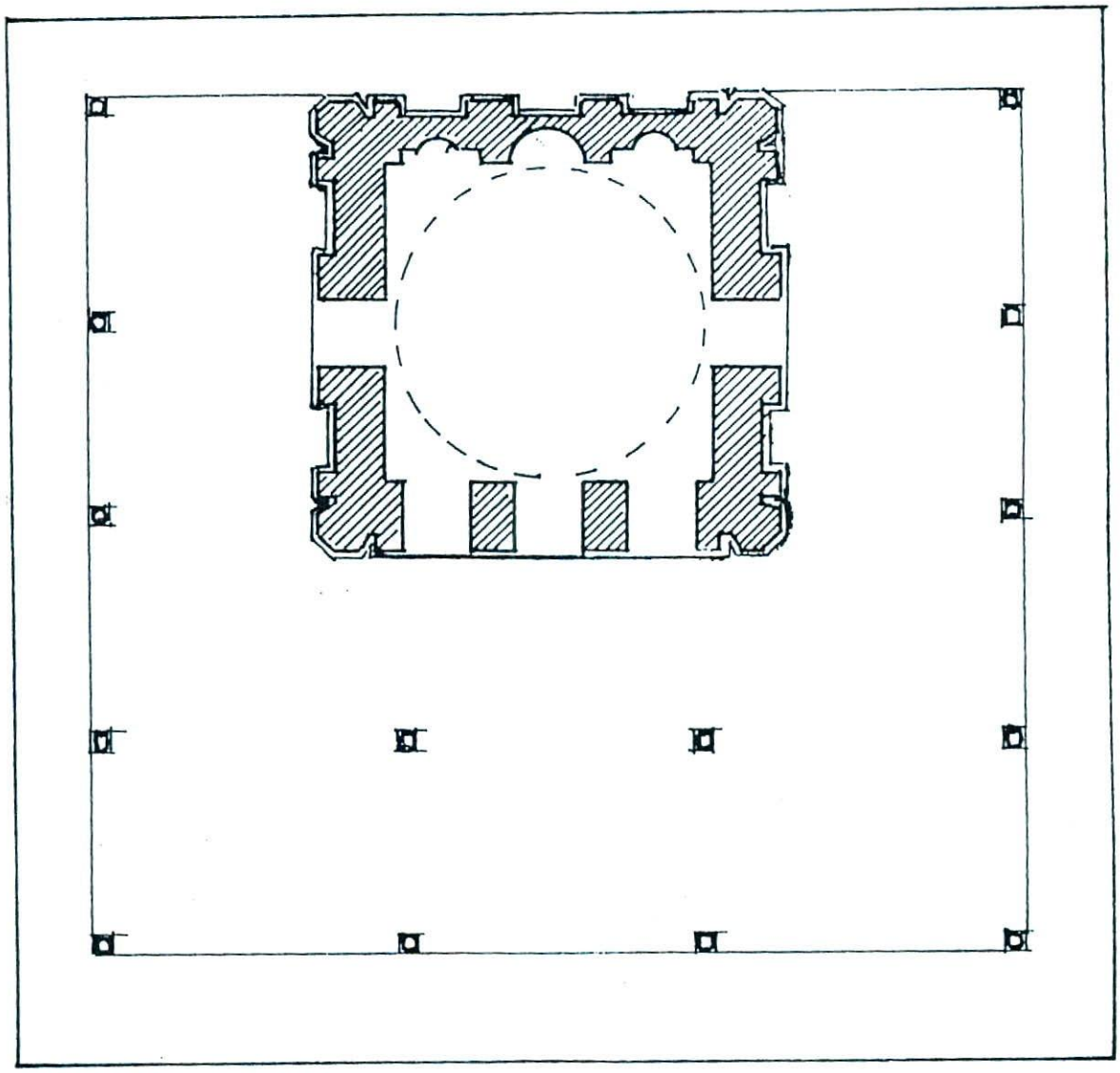

GROUND PLAN
BARI MAJLIS (Garibullah) MOSQUE

ভূমিনকশা - ১৩

Dhaka University Institutional Repository

ভূমি নকশা ও পরিকল্পনা

বাড়ি মজলিস জামে মসজিদটি প্রায় বর্গাকৃতির এক গম্বুজবিশিষ্ট এবং বহির্ভাগ হতে ইহার প্রতি পার্শ্বের মাপ ৫.০৭ × ৫.০৯ মিটার।[৪৮] সংস্কারের ফলে বারান্দা নির্মাণ করা হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। চার কোণে চারটি অষ্টভুজাকৃতির পার্শ্ব বুরুজ রয়েছে। সম্মুখ ভাগে তিনটি প্রবেশপথ এবং উত্তর ও দক্ষিণে একটি করে প্রবেশপথ রয়েছে। প্রধান কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথ ১.৯০ মিটার উচ্চতাবিশিষ্ট এবং ০.৮১ মিটার প্রশস্ত। পার্শ্ব দরজাগুলি অপেক্ষাকৃত কম উচ্চতাবিশিষ্ট (০.৪৫ মিটার) এবং ০.৮১ মিটার প্রশস্ত। খিলানগুলি অর্ধ-বৃত্তাকৃতির নকশা সম্বলিত। একমাত্র সুডৌল গম্বুজটি অষ্টভুজাকৃতির ড্রামের উপরে স্থাপিত এবং উপরে পদ্মাফুলের নকশা আকর্ষণীয় রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

পার্শ্ব বুরুজ ছাদের উপর পর্যন্ত দীর্ঘ এবং 'কিউপোলা যুক্ত। ছাদের উপরিভাগ এবং অষ্টভুজাকৃতি ড্রামের চারপাশে পদ্মাপাপড়ির 'মারলন' নকশায় অলংকৃত। অভ্যন্তরে তিনটি মিহরাব আছে কিন্তু তাতে কোন নকশা দেখা যায় না। মসজিদের গম্বুজটি 'স্কুইঞ্চ' পদ্ধতিতে তৈরী এবং ড্রামে ক্ষুদ্রাকৃতির বন্ধ খিলান নকশা পরিলক্ষিত হয়। বাড়ি মজলিস জামে মসজিদটি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক সংরক্ষিত নয়।

Dhaka University Institutional Repository

বালিয়া দীঘির পাড় মসজিদ

সোনাগাঁ উপজেলার বালিয়া দীঘির পাড় গ্রামে এই মসজিদটি অবস্থিত।[৪৯]

নির্মাণ কাল

বালিয়া দীঘির পাড় মসজিদের কোন শিলালিপি পাওয়া যায়নি। কিন্তু নির্মাণশৈলি থেকে ধারণা করা হয় এটি ঊনবিংশ শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছে।

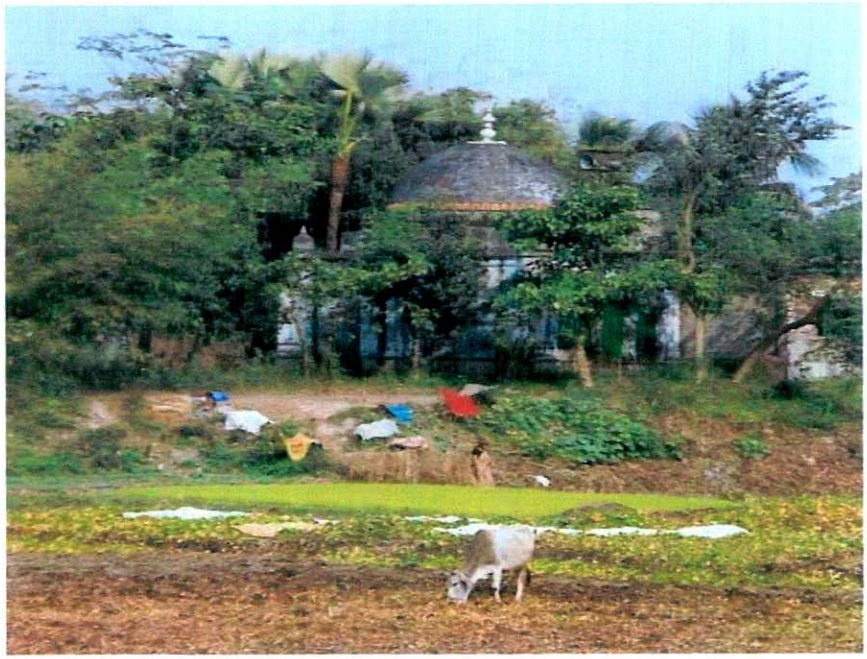

চিত্র নং-৩২ বালিয়া দিঘীর পাড় মসজিদ

বর্তমান অবস্থা

এই মসজিদটি কয়েকবার পুনসংস্কার করা হয়েছে। বারান্দা, দরজা এবং জানালা নতুন ভাবে সংযোজন করা হয়েছে। পূর্ব দিকে একটি পুকুর এবং পশ্চিম দিকে একটি কারখানা আছে। বর্তমানে বালিয়া দীঘির পাড় মসজিদটি জামে মসজিদ হিসাবে ব্যবহৃত হচেছ এবং স্থানীয় কমিটি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

পরিকল্পনা এবং বর্ণনা

প্রকৃত পক্ষে এটি একটি আয়তাকার এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ, অভ্যন্তরভাগ ৭·৩৫ মিটার × ৪·৪০ মিটার এবং বহির্দেয়ালসহ ৮·৫০× ৫·৬০ মিটার।[৫০] এই কক্ষটিতে প্রবেশের জন্য পূর্বদিকে তিনটি এবং দক্ষিণ দিকে একটি প্রবেশ পথ আছে। পশ্চিম দিকের দেয়ালে একটি মিহরাব আছে এবং মূল মিহরাবের দুই পার্শ্বে দুটি মিহরাব পূর্বে ছিল কিন্তু বর্তমানে তা নেই। সাময়িকভাবে একটি কাঠের মিম্বার আছে। উত্তর এবং দক্ষিণ দিক কিছুটা প্রশস্থ আড়াআড়ি ভাবে খিলান দেখতে অনেকটা অগভীর ব্যারেল ভল্টের মত নির্মাণ করা হয়েছে যার সাথে ফতেহ শাহ মসজিদের অভ্যন্তরভাগের সাদৃশ্য রয়েছে। গম্বুজের একসারি মারলন নকশা এবং অভ্যন্তরভাগের চূড়ায় ফুলেল নকশা পরিলক্ষিত হয়। বারান্দায় চারটি প্রবেশপথ আছে। এই মসজিদের সবগুলো খিলানই কিছুটা গোলাকার।

বর্হিদেয়াল ইটেরগুড়া ও চুন দ্বারা আস্তরযুক্ত এবং সাদা রং করা। এই মসজিদটির গম্বুজটি একটি ড্রামের উপর নির্মিত। ড্রামের গায়ে এক সারি মারলন নকশা পরিলক্ষিত হয়। গম্বুজে পদ্মফুল এবং ফিনিয়েলে কলস নকশা পরিলক্ষিত হয় যার উপরিভাগ মোজাইক দ্বারা অলংকৃত।

Dhaka University Institutional Repository

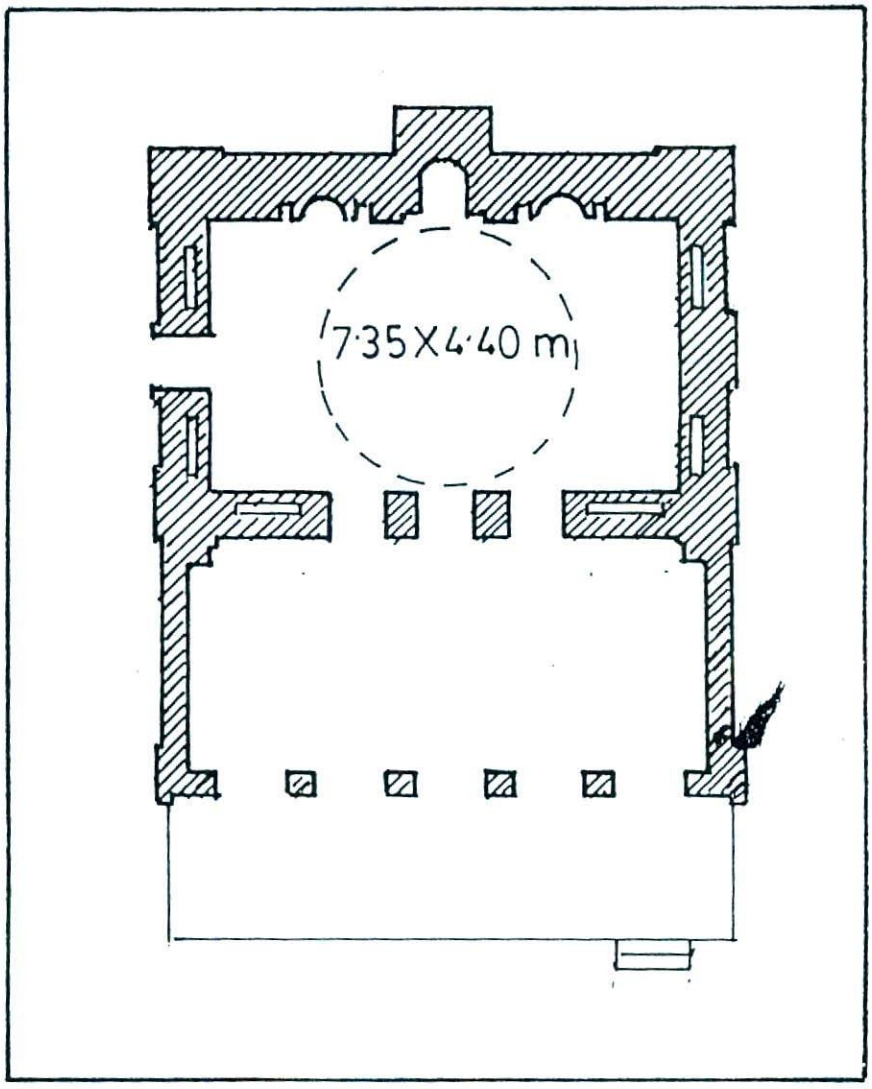

GROUND PLAN
BALIA DIGHIR PAR MOSQUE

Dhaka University Institutional Repository

পাঁচ পীরের সমাধি

সোনারগাঁ উপজেলার মোগরা পাড়া ইউনিয়নের ভোগলাপুর গ্রামে পাঁচ পীরের সমাধি অবস্থিত। পাঁচ পীর সমাধি মসজিদ থেকে ৪·৫০ মিটার উত্তর পশ্চিম দিকে পাঁচ পীরের দরগাহ অবস্থিত।

চিত্র নং- ৩৩ পাচঁ পীরের সমাধি

নির্মাণ তারিখ

এখানে শায়িত ব্যক্তিদের নাম অজ্ঞাত। মসজিদ সংলগ্ন কবরের স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য দেখে ধারনা করা হয় এগুলো সপ্তদশ শতকে নির্মিত।

বর্তমান অবস্থা

পাঁচ পীরের সমাধিতে পরিবেষ্টনকারী দেয়াল এখন ও আছে। পুনঃসংস্কারের সময় সিমেন্ট, রং এবং টাইলসের ব্যবহার করা হয়েছে, একমাত্র কবরের মাথার দিকে অবস্থিত চেরাগদানী এখনও আগের মতই আছে।৫১ অনেকেই এ স্থানকে পবিত্র জ্ঞান করে। বর্তমান সমাধি গুলোর উপর টিনের ছাউনি দেওয়া হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

পরিকল্পনা এবং বর্ণনা

পাঁচটি কবরই একে অপরের সমান্তরাল এবং ৯ মিটার × ১১·৮ মিটার উচুঁ সিঁড়িযুক্ত প্লাটফরমের উপর নির্মিত এবং ভূমি থেকে ২০ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট।[৫২] উত্তরে কবরের মাথার কাছে চুনসুরকী দ্বারা চেরাগদানী নির্মিত হয়েছে। দেখতে অনেকটা কুড়ে ঘরের মতো এটা দোঁচালা ছাদ দ্বারা আচ্ছাদিত।

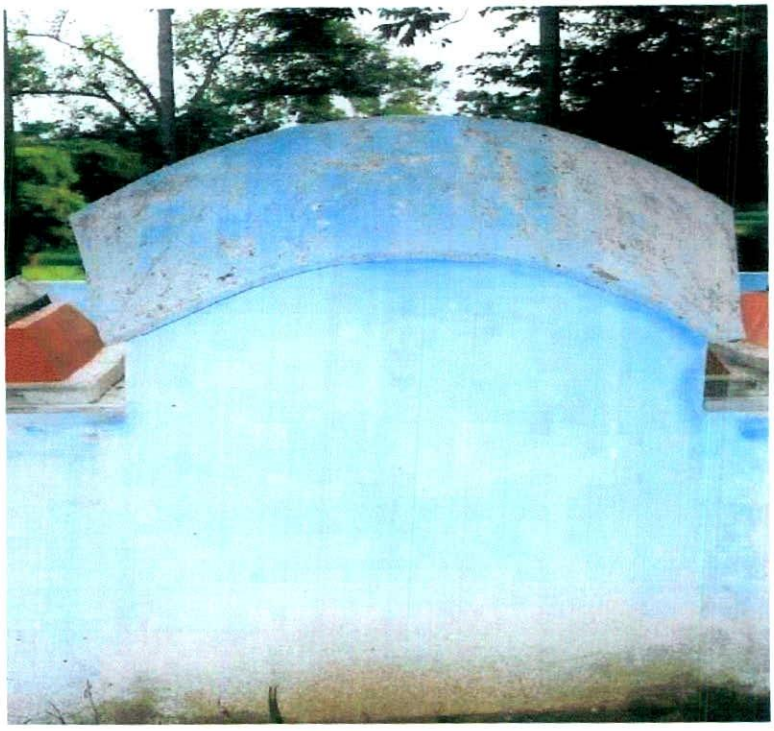

চিত্র নং-৩৪ পাচঁ পীরের সমাধির চেরাগদানী

এই ক্ষুদ্র দোচালাটি প্রকৃতপক্ষে পাঁচপীরের মাযার প্রাঙ্গণের বাতিদান ঘর যাকে "চেরাগদাণী" বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৫৩] এই চেরাগদানীর বিশেষ বৈশিষ্ট্যটি বাঙ্গালীর চিরকালের বাসগৃহ কুঁড়ে ঘরের দোচালার আদল হতে গৃহীত হয়েছে। ক্ষুদ্র দোচালাকৃতির বাতিদান ঘরে বাতি জ্বালাইয়ে রাখার জন্য কবুতরের প্রকোষ্ঠের ন্যায় পাঁচটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ রয়েছে। "চেরাগদানীর" ক্ষুদ্র দোচালা কক্ষটির আয়তন ১.২২ মি. × ০.৯১ মিটার (৪ × ৩ ফুট) এবং উচ্চতা ১.৫২ মিটার এর (৫ ফুটের) বেশী নয়।[৫৪] পাঁচপীরের সমাধির

Dhaka University Institutional Repository

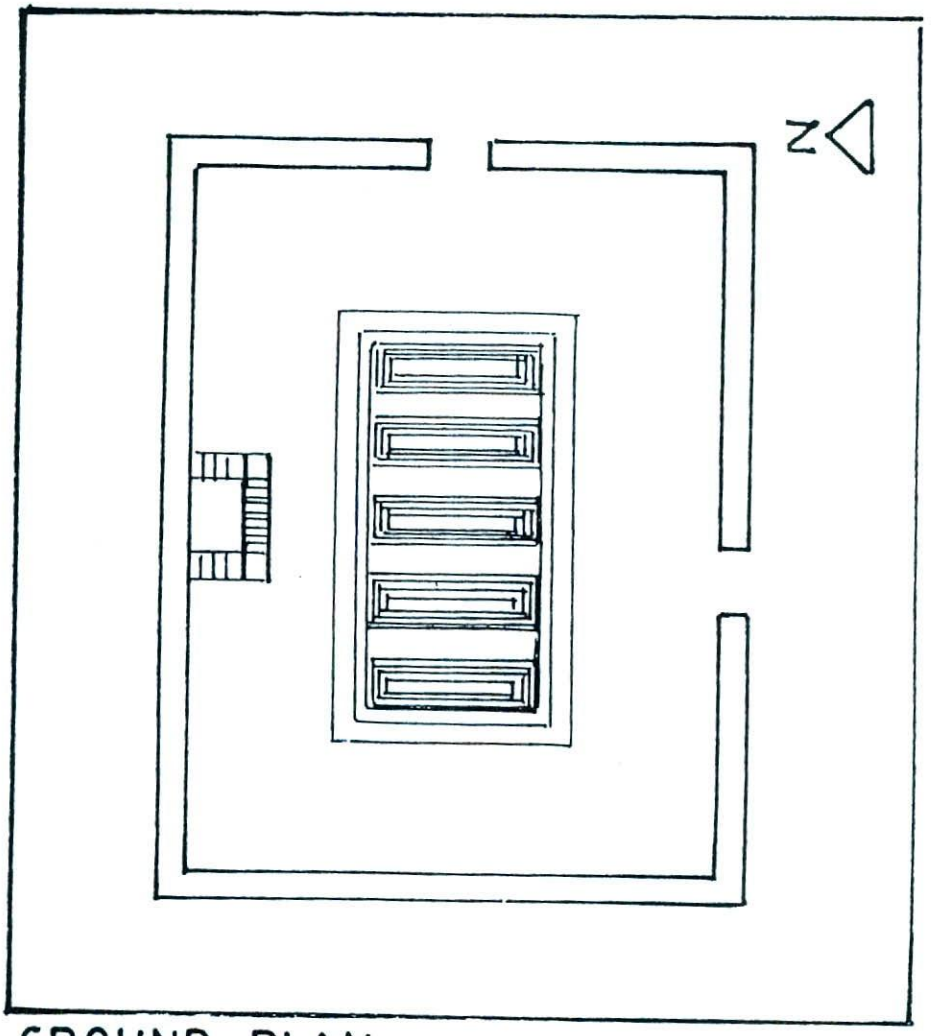

GROUND PLAN
PANCH PIR MAZAR

ভূমিনকশা - ১৫

Dhaka University Institutional Repository

নির্মাণকাল ও নির্মাতা সম্বন্ধে সঠিক কোন তথ্য এ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। এই সমাধিতে শায়িত পাঁচজন পীরের পরিচয় কোন প্রামাণ্য উপাদানের অভাবে অদ্যবধি জানা সম্ভব হয়নি। ঐতিহাসিক তথ্যের অপ্রতুলতা এবং কিংবদন্তি ও উপাখ্যানের আধিক্যে এখানে সমাহিত পাঁচজন পীরের প্রকৃত পরিচয়, সমাধির নির্মাণকাল ও নির্মাতা সম্বন্ধে সঠিক কোন তথ্য এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। এই সমাধিতে শায়িত পাঁচজন পীরের প্রকৃত পরিচয় উদঘাটন করা প্রকৃতই কঠিন ও গবেষণার বিষয়। একটি সূত্র হতে জানা যায় এখানকার পাঁচটি কবর যথাক্রমে "গয়েসদি (গিয়াছ উদ্দীন), সমাসাদি (শামসুদ্দীন), সিকান্দার (সুলতান সিকান্দার শাহ), গাযী ও কালু-র। উপরে বর্ণিত পাঁচজনের মধ্যে তিনজনই সুলতান আর দুইজন কাল্পনিক ব্যক্তি এদের পরিচয় জানা যায় না। উল্লিখিত তিনজন সুলতানাকে পীর আখ্যা দেওয়া যায় না এবং সেই কারণে পাঁচজন পীরের পরিচয় অজানাই থেকে যায়। সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের সমাধির কাছে অবস্থিত পাঁচপীরের মাযার গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের মাযারের (আঃ ১৪০৯ খৃ:) সমসাময়িক সময়ে নির্মিত হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। ভিন্ন মতে কবরগুলি মুঘল আমলে নির্মিত এবং পরবর্তীতে ব্রিটিশ আমলে সংস্কার করা হয়।

401796

পাঁচপীরের কবরগুলি বার বার সংস্কারের ফলে কবরগুলির প্রাচীনত্ব বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে এবং এর আদি স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য লুপ্ত হয়ে গেছে। এজন্য এই সমাধির সময়কাল নির্ধারণ মোটেও সহজসাধ্য নয়। কবরগুলির স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য ও "চেরাগদান ঘরে" দোচালা ছাদের প্রয়োগ প্রত্যক্ষ করে এরূপ অনুমান করা অসংগত হবে না যে, এই গুচ্ছকৃত করবগুলি মুঘল আমলের পূর্বে নির্মিত হয় নাই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

অনেক কবর এক সংগে থাকায় মনে হয় কোন এক যুদ্ধে এদের জীবনাবসান ঘটেছিল। সেই যুদ্ধ সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র নং-৩৫ পাচঁ পীরের সমাধির বর্তমান অবস্থা

সোনারগাঁয়ের সমাধি স্থাপত্য নিদর্শনে বাংলার আদি, অকৃত্রিম মৌলিক ও লোকজ স্থাপত্যশৈলীর ব্যাপক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। পাঁচপীরের মাযারের বাতিদান ঘরের দোচালা অনুকৃতি আবহমান বাংলার প্রাণপ্রাচুর্যে পূর্ণ লোকজ শিল্পের অনুপম দৃষ্টান্ত। সাধারণ খড়ের কুটিরের আদল হতে দোচালা রীতি গ্রহণ করে ইটের দ্বারা নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে ভিন্ন নির্মাণ কৌশল প্রয়োগে নতুন ললিত রীতির উদ্ভাবন বাংলার মুসলিম স্থাপত্যের অলংকরণে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। এই দোচালাকৃতির ছাদ রাজশাহীর বিড়ালদহ মাযার ও গৌড়ের ফতেহ্ খানের সমাধিতে প্রত্যক্ষ করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

ইব্রাহীম দানেশ মন্দের সমাধি কমপ্লেক্স

সোনারগাঁ উপজেলার মোগরাপাড়া ইউনিয়নের নগর সাদীপুর গ্রামে ফতেহ শাহের মসজিদের দক্ষিণে ইব্রাহীম দানেশ মন্দ কবর চত্বর অবস্থিত। তিনটি কবরই একই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। কিছু কবর এবং একটি খানকা পরিবেষ্টনীর ভিতর বিদ্যমান।

নির্মাণ তারিখ

কোন ইমারতেই তারিখ উল্লেখ করা হয় নি তবে নির্মাণশৈলী দেখে সপ্তদশ শতকে নির্মিত বলে প্রতীয়মান হয়।

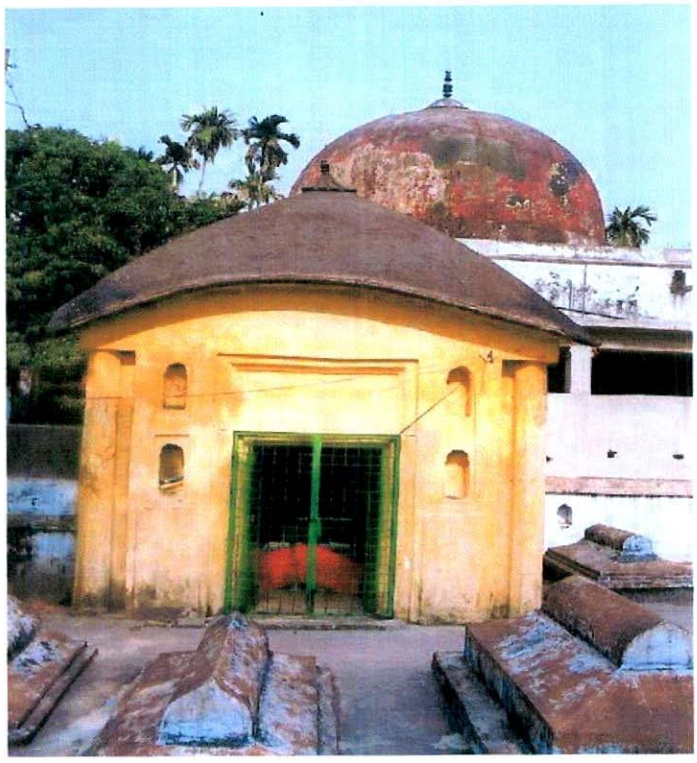

চিত্র নং-৩৬ ইব্রাহীম দানেশ মন্দের সমাধির চৌচালা ছাদ

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান অবস্থা

সমাধি গুলো রং করা হয়েছে এবং জানালায় গ্রীল সংযোজন করা হয়েছে। এগুলোর বেশীর ভাগই পূর্বের অবস্থায় বিদ্যমান। এই স্থানটি পবিত্রস্থান হিসেবে গন্য হয় এবং অনেক অনুসারীদের আর্কষণ করে। এই কমপ্লেক্সটি ওয়াকফ্ সম্পত্তি হিসেবে মুতাওয়াল্লী দ্বারা পরিচালিত হয়।

পরিকল্পনা এবং বর্ণনা

পশ্চিম দিকে অবস্থিত কবরটি ইব্রাহীম দানেশমন্দের কবর হিসেবে পরিচিত এবং পূর্বদিকে দুটি কবর একই সাথে দাড়িয়ে আছে। বিশ্বাস করা হয় যে এর মধ্যে একটি মুহাম্মদ ইউসুফ এবং আরেকটি তার স্ত্রী বা পুত্রের।

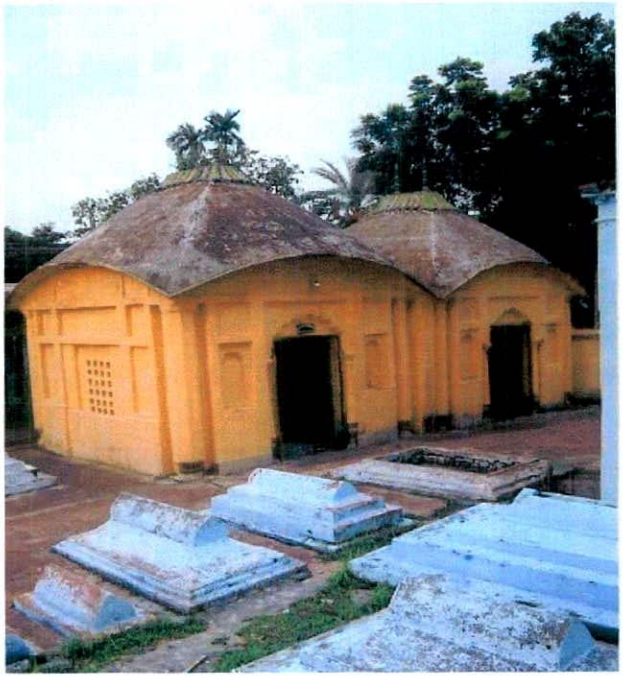

চিত্র নং- ৩৭ ইব্রাহীম দানেশ মন্দের সমাধি কমপ্লেক্স

Dhaka University Institutional Repository

সব গুলো সমাধির পরিকল্পনা এবং নির্মাণরীতি একই রকমের। পরিকল্পনায় আয়তাকার দোচালা ছাদ যুক্ত এবং দেয়ালের বহির্ভাগে আয়তাকার প্যানেল নকশা প্যানেলের ভিতরে ঢেউখেলানো খিলানযুক্ত কুলঙ্গি আছে।

প্রবেশ পথের লিনটেলের উপর ঢেউ খেলানো নকশাকৃত খিলান আছে। এ সমাধিগুলির চৌচালা আচ্ছাদন বাঙালীর চিরকালের বাসগৃহ চৌচালা কুঁড়ে ঘরের আদল হতেই গৃহীত এবং এর উৎস লোকায়ত ও স্থানীয়। স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য ও নির্মাণ কৌশলের দিক হতে এই চৌচালা কুটিরের আকৃতির সমাধিগুলি সপ্তদশ শতকের নির্মাণ বলে ধারণা করা হয়। এই ব্যতিক্রমধর্মী বৈশিষ্ট্যের সমাধিগুলি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক সংরক্ষিত নয়।

দরগাবাড়িতে বসবাসরত খাদেম পরিবার প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী চতুর্দশ শতকের কোন এক সময়ে ইব্রাহীম দানেশমন্দ সোনারগাঁ আগমন করেন। তিনি সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহের কন্যা অথবা দৌহিত্রীকে বিবাহ করেন। তিনি আবু তাওয়ামা কর্তৃক স্থাপিত মাদ্রাসায় শিক্ষাদান কার্যে অবদান রাখেন। দরগাবাড়ির খাদেম পরিবার (খাদেরীগণ) উক্ত ইবরাহীম দানিশমন্দের অধস্তন বংশধর বলে দাবী করেন।

Dhaka University Institutional Repository

সেতু

সুলতানী আমলে সোনারগাঁ স্বাধীন বাঙ্গালাহ রাজ্যের প্রদেশ গুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী ছিল। এসব প্রদেশ ছিল লক্ষনাবতী, সাতগাঁও এবং সোনারগাঁও। আধুনিক নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও থানা এলাকায় রাজধানী সোনারগাঁকে চিহ্নিত করা হয়। সম্পূর্ণ রাজধানী এলাকা বাইরের বিস্তৃত লোকালয়ের সাথে জল প্রবাহ বেষ্টনী, ছোট ছোট নদী, খাল দ্বারা পৃথক ছিল। আবার লোকালয়ের সাথে যোগাযোগের জন্য এসব প্রবাহ বেষ্টনী, খাল ও নদী স্রোতের উপরে সড়ক পথের সংযোগস্থলে সেতু নির্মিত হয়েছিল। নদী নালায় পরিপূর্ণ সোনারগাঁ এলাকায় শীতলক্ষ্যা নদীর তীর ঘেঁষে ও নিকটবর্তী উঁচু স্থানগুলোতে লোকালয়ের মধ্য দিয়ে সড়ক বিস্তৃত ছিল। এসব সড়ক বিভিন্ন সেতুর সাহায্যে নদ-নদী খাল-বিল অতিক্রম করে দূরের পথে যোগাযোগ রক্ষা করত।

দীর্ঘ পাঁচ-ছয় শত বছর ধরে শীতলক্ষ্যার তীরসমূহ ফতুল্লা থেকে সোনাকান্দা পর্যন্ত ও সোনারগাঁয়ের রাজধানী শহরের লোকালয়ে বিভিন্ন সেতু যেমন ফতুল্লা, পাগলা, চাঁপাতলি পানাম সেতু বিদ্যমান ছিল। এছাড়া আরও ছোট ছোট সেতু তৈরী হয়ে ছিল। যার কিছু সংখ্যক এখনো বিদ্যমান আছে। আধুনিক ঢাকা চট্টগ্রাম রোডের পথে অনেক নতুন সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। পুরাতন সেতু এখানে ব্যবহার করা হয়নি। নিম্নে পুরাতন সড়ক পথের সাথে যুক্ত কয়েকটি সেতুর বর্ণনা দেওয়া হল–

ফতুল্লা সেতু

ঢাকা নারায়ণগঞ্জ পাগলা রোডের ডান দিকে ফতুল্লা থানার এনায়েতপুর ইউনিয়নের শশ্মানগাঁও নামক গ্রামে এক গম্বুজ বিশিষ্ট একটি পুরাতন মসজিদ আছে। মসজিদের প্রায় চল্লিশ মিটার দক্ষিণে ফতুল্লা সেতুটি অবস্থিত।[৫৫] সেতুটি নলখালি খালের উপরে নির্মিত। ইট দ্বারা নির্মিত অর্ধবৃত্তাকার একটি খিলান সেতুটিকে ধারণ করে আছে। সেতুটি ৮·৬০ মিটার উচ্চতা ও ৪·২০ মিটার প্রশস্থ বিশিষ্ট।[৫৬] ছোট ছোট ইট ও চুন- সুরকির গাঁথুনিতে নির্মিত।

Dhaka University Institutional Repository

খিলানের উভয় পার্শ্বে পাগলা পুলের ন্যায় মজবুত স্তম্ভ আছে। বর্তমানে ফতুল্লা সেতুটির উপরে বাংলাদেশ সরকার নতুন সেতু নির্মাণ করেছেন কিন্তু পূর্বেকার স্তম্ভ এখনো রয়েছে।

পাগলার সেতু

নারায়ণগঞ্জ জেলার ফতুল্লা থানার কুতুবপুর ইউনিয়নে ঢাকা নারায়ণগঞ্জ মহাসড়কের পাগলা নামক স্থানে সড়ক থেকে পশ্চিমে বর্তমান বুড়িগঙ্গা নদীর পূর্ব তীরে একটি পরিত্যক্ত ভগ্ন সেতু আছে।[৫৭] সেতুটি পাগলা সেতু নামে পরিচিত। তাভার্ণিয়ারের বর্ণনাতে পাগালু নদীর উপরে নির্মিত একটি সেতুর উল্লেখ আছে। পরিত্যক্ত সেতুটির নাম থেকে "পাগালু" নদীর নামের সন্ধান পাওয়া যায়।[৫৮] তবে বুড়িগঙ্গার একটি শাখা উত্তর মুখে পাগালু বা দোলাই নামে প্রবাহিত ছিল এবং সে প্রবাহের উপরেই বুড়িগঙ্গার পাশে সেতুটি নির্মিত হয়ে ছিল। কালক্রমে তা শুকিয়ে গেছে তাই বর্তমানে 'পাগলা' স্থানে কোন সেতু অতিক্রম করার প্রয়োজন হয় না।

চিত্র নং-৩৮ পাগলার সেতু

পাগলা সেতুটি চতুরকেন্দ্রিক তিনটি উন্মুক্ত খিলান পথ দ্বারা বিভক্ত ছিল। মধ্যবর্তী খিলানটি চতুরকেন্দ্রিক রীতিতে নির্মিত। প্রান্তীয় খিলান দুটি বদ্ধ খিলান। খিলানের স্প্যানড্রিলে রোজেট নকশা। পানি সরে যাওয়ার মতো খিলানের ভিত্তিতে অর্ধবৃত্তাকার ইটের নকশা রয়েছে। এই সেতুর সর্বাপেক্ষা আর্কষণীয় কাঠামো হচ্ছে এর চারকোণের চারটি

Dhaka University Institutional Repository

সুউচ্চ তোরণ সৃষ্টিকারী মিনার বা বরুজ। বুরুজ গুলোর ভিতরে ফাঁপা। অষ্টকোণাকার বুরুজগুলোর উপরের দিকে বহু খাঁজ বিশিষ্ট খিলান রয়েছে। খিলান গুলোর পাশে ও উপরে স্বল্প গভীর কুলঙ্গি অলংকরণসহ সর্ব উপরে বয়েছে ডোরাকাটা নিরেট গম্বুজ।

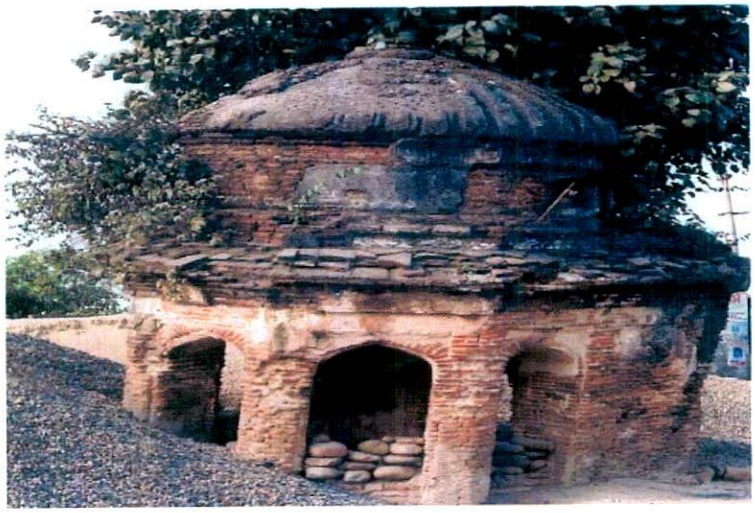

চিত্র নং-৩৯ পাগলার সেতুর গম্বুজ বিশিষ্ট পিলার

এ সেতুর সাথে চাঁপাতলির সেতুর অনেক মিল রয়েছে। ও'য়লির আঁকা চিত্রে পাগলা সেতুর সন্ধান পাওয়া যায়। রহমান আলী তায়েশের লিখিত সূত্রে এ সেতুটি বাংলার সুবেদার মীর জুমলার সময়ে নির্মিত হয়েছে বলে উল্লেখিত আছে। বর্তমানে এই বুরুজ গুলি দেখে বুঝার উপায় নেই যে এখানে একটি সেতু ছিল বা এগুলি কোন সেতুর বুরুজ। বুরুজগুলি বিচ্ছিন্ন ভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

চাপাতলীর সেতু

ঢাকা–চট্টগ্রাম মহাসড়কের প্রায় ১·৫ কিলোমিটার দক্ষিণে এবং মদনপুর বাজারের আধা কিলোমিটার পশ্চিমে শীতলক্ষ্যা নদীর পূর্বতীরে মদনপুর ইউনিয়নে দেওয়ানবাগ সংলগ্ন হরিপুর / চাঁপাপুর / চাঁপাতলি গ্রামে সেতুটি অবস্থিত।[৫৯] চাঁপাতলি গ্রামের কুড়িপাড়া বাজারের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত নদীর উপর প্রায় বিধ্বস্ত তিন খিলানের উপর নির্মিত সেতুটি দিয়ে বর্তমানে ভারী যানবাহন চলাচল করতে দেওয়া হয় না। স্থানীয়ভাবে সেতুটি চাঁপাতলি সেতু নামে পরিচিত।

নির্মাণকাল

মধ্যযুগে সোনারগাঁয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থায় অনন্য নিদর্শন হিসেবে বিদ্যমান সেতু গুলোর মধ্যে চাঁপাতলির সেতু খুবই আকর্ষণীয়। শিলালিপির সূত্রে জানা যায় যে, বাংলার সুবেদার ইব্রাহিম খানের শাসনামলে ১৬৯০–৯১ সালে লাল রাজমল এ সেতুটি নির্মাণ করেন।[৬০]

চিত্র নং-৪০ চাপাতলীর সেতু

Dhaka University Institutional Repository

পরিকল্পনা ও বর্ণনা

সোনারগাঁয়ের মহজমপুরের নদীর বাঁক থেকে একটি শাখা প্রবাহিত হয়ে হরিপুর গ্রামের কুড়ি পাড়া বাজারের মধ্য দিয়ে শীতলক্ষ্যার সাথে মিশেছে। উত্তর পূর্ব দিক থেকে আগত শাখা নদীটি স্থানীয় ভাবে বর্তমানে আকাইলের খাল নামে পরিচিত। বর্তমানে চাপাতলির সেতু এ আকাইলের খালের উপর অবস্থিত।

চিত্র নং-৪১ চাপাতলীর সেতুতে পাথরের ব্যবহার

চাপাতলির সেতুটি পানামসেতুর ন্যায় শুধু ইটের তৈরী নয়। এই সেতুটি দুই পার্শ্বে এবং মাঝখানে পিলার বরাবর কালো ব্যাসেল্ট পাথর রয়েছে।[৬১] ৩০ মি.১৭সে.মি দীর্ঘ ৫ মি.৭৯সে.মি. প্রশস্থ পূর্ব-পশ্চিমে প্রলম্বিত চাঁপাতলির সেতুটিতে বর্তমানে কোন রেলিং নেই। সেতুটির আরোহন অংশ ৫ মি.৭৯ সে.মি. প্রস্থ বিশিষ্ট মাঝে তা ৮ মি. প্রস্থ বিশিষ্ট এক সময় রেলিং ছিল তা ভাঙ্গা অংশ থেকে বুঝা যায়। চারটি মজবুত চতুস্কোণার স্তম্ভ থেকে সেতু ধারণকারী খিলান গুলো উত্থিত। প্রতিটি খিলান আয়তাকার ফ্রেমের মধ্যে আবিষ্ট। মাঝের স্ত ম্ভ গুলো ০.৯১ মি চওড়া ও পার্শ্ববর্তী স্তম্ভ গুলো ২.৭৪ মি. চওড়া। স্তম্ভ গুলোর মাঝে অষ্টকোণাকার কুলঙ্গির মতো স্থানের মাঝে মজবুত স্তম্ভ নির্মাণ করা, এসব স্তম্ভের চূড়া অর্ধ

Dhaka University Institutional Repository

বৃত্তকার। নিম্নাংশ খাঁজ কাটা থরে থরে পানি কাটার ব্যবস্থা সম্বলিত। সম্পূর্ণ স্তম্ভ নকশা খিলান রূপে অবশেষে আয়তাকার ফ্রেমে আবদ্ধ।

সাধারণ আলোচনা

চাপাতলি সেতুর একটি বিশেষত্ব এই যে এখানে শিলালিপি পাওয়া গেছে যা অন্যান্য আলোচিত সেতু গুলোতে পাওয়া যায়নি। শ্রী যতীন্দ্রমোহন রায় 'ঢাকার ইতিহাস' গ্রন্থে বলেছেন, সেতুটির উত্তর মাথায় ফার্সী ভাষায় লেখা একটি শিলালিপি আছে। তা দেখে তিনি এর নির্মাণকাল ১৬৬৫ সাল বলেছেন।

চিত্র নং-৪২ চাপাতলীর সেতু

নলিনী কান্ত ভট্টশালী এ শিলালিপিটি দেখেছেন এবং জানিয়েছেন যে তৎকালীন নারায়ণগঞ্জের এস.ডি.ও. মি. লোকাস ঢাকা যাদুঘরে তা স্থানান্তরিত করেছেন। এস.এম. তাইফুর তার গ্রন্থে শিলালিপিটি প্রকাশ করেছেন চার লাইনে নাস্তালিক রীতিতে আরবী ও ফার্সী ভাষার সংমিশ্রনে লিখিত লিপিটির বাংলা অনুবাদ করলে জানা যায় যে, লালা রাজমল খোদার নামে মানুষের কল্যানার্থে এ রাস্তা নির্মাণ করেন। এ সেতু আবে হায়াতের মতো সতত উৎসারিত বিশুদ্ধ পানি লাভের পথ নির্দেশ করে। এর নির্মাণকাল যদিও ১১০২ হিজরী

Dhaka University Institutional Repository

বলা হয়েছে।[৬২] তবু এর পাঠ সম্বন্ধে সন্দেহ করার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। লালা রাজমল ঈসা খাঁর পৌত্র মনোয়ার খাঁর খাজাঞ্চি ছিলেন। মনোয়ার খাঁ ১৬৯০-৯১ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলেন কিনা তা সঠিক ভাবে এখনও জানা যায় নি। তদুপরি তাভার্ণিয়ার যদি এ সেতু দেখে থাকেন, তা তিনি ১৬৬৬ সালের মধ্যেই দেখে থাকবেন। এসব আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে যতীন্দ্রমোহনের পাঠই সঠিক।

পিঠাওয়ালীর সেতু

মোগড়াপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের বড় মজলিস গ্রামে একটি প্রাচীন সেতু স্থানীয়ভাবে পিঠাওয়ালির পুল নামে পরিচিত। আমিনপুর মোগড়াপাড়ার মাঝামাঝি স্থানে ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়কের মোগড়াপাড়া বাসষ্ট্যান্ড-এর ০.৫ মাইল উত্তর-পূর্ব দিকে সোনারগাঁও মহিলা কলেজের পাশে আলোচ্য সেতুটি অবস্থিত।

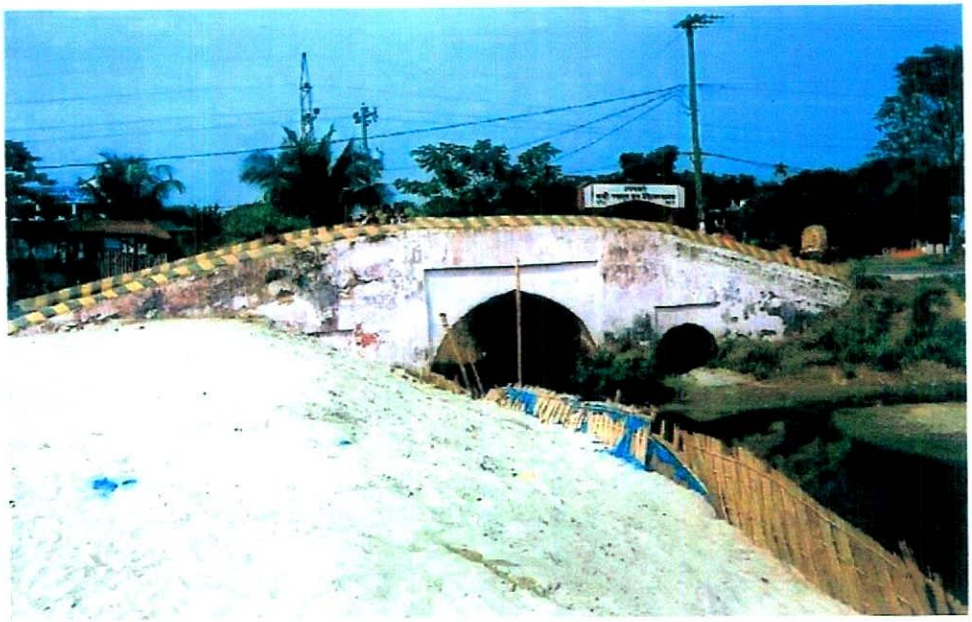

চিত্র নং- ৪৩ পিঠাওয়ালীর সেতু

পানাম পুলের মতো মাঝের খিলানটি উঁচু। বার বার সংস্কার করার ফলে সেতুর নির্মাণশৈলী বিনষ্ট হয়ে গেছে। পাগলা পুল ও চাঁপাতলির পুলের সাথে এর অনেক মিল আছে। সেতুটি

Dhaka University Institutional Repository

চওড়া, পাশেরগুলো আনুপাতিকভাবে ক্রম প্রশস্ত। আরোহণ মুখে সেতুটি তাই একটু চাপা। সেতুটিতে পাঁচ মিটার রেলিঙ আছে। বড় মজলিস গ্রামে কানিংহাম একটি শিলালিপি পেয়েছিলেন। তিনি সেতুর কথা লিখেননি। শিলালিপি অনুযায়ী হোসেন শাহের পুত্র নাসিরউদ্দিন আবুল মুজাফফর নুসরাত শাহের আমলে একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। এই মসজিদের নির্মাতা ছিলেন মালিক উল উমারা ওয়াল উজির। তিনি আইনজ্ঞদের প্রধান ও হাদিসশাস্ত্রের শিক্ষক আইনউদ্দিনের পুত্র তকিউদ্দিন বড় মালিক উল মজলিস নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন সারওয়ারের পুত্র মুখতারুল মজলিশ।[৬৩] এতে বড় মজলিস গ্রামে সেতুটির উপস্থিতি এটাই প্রমাণ করে যে মোগড়াপাড়ার প্রশাসনিক এলাকার সাথে মাদ্রাসা কমপ্লেক্স সংযুক্ত করার লক্ষ্যে এটা নির্মাণ করা হয়েছিল। বড় মজলিস সোনারগাঁয়ের মাদ্রাসা শিক্ষক হাদিসবেত্তাদের বসবাস কেন্দ্র ছিল।[৬৪] এরূপ আরও ১৫০টি বিশিষ্ট ব্যক্তির বসবাসের স্থান ছিল সোনারগাঁয়ে।[৬৫]

ছোট পানাম সেতু

পাইনাম সেতুর প্রায় ৬০ মিটার দক্ষিণ পানাম নগরীতে প্রবেশ করার মুখে নগরীর প্রশস্ত সড়কের সাথে সংযুক্ত একটি ছোট খালের উপর খিলানের উপরে নির্মিত একটি বিশিষ্ট সেতু রয়েছে। এ ছোট খালটি পঙ্খীরাজ খালের সাথে যুক্ত। স্থানীয়ভাবে সেতুটিকে ছোট পানাম সেতু বলা হয়। মূলত পানামনগরী পরিখা বেষ্টিত থাকার ফলে এর প্রবেশ মুখে সেতু ও ফটকের প্রয়োজন হয়েছিল। পূর্ব-পশ্চিমে প্রলম্বিত আলোচ্য সেতুটির মুখে একটি ফটক ছিল। সেতুটি ২২ মিটার লম্বা ও ৫ মিটার চওড়া। চাঁপাতলির পুলের মত এর খিলান

Dhaka University Institutional Repository

উদগমনের স্থলে প্রস্তরের ব্যবহার আছে। একইভাবে এক সময় নগরীর রাস্তায় ইটের ফাঁকে কালো ব্যাসল্ট পাথর খন্ড ছিল বলে জানা যায় বর্তমানে এসব নেই।

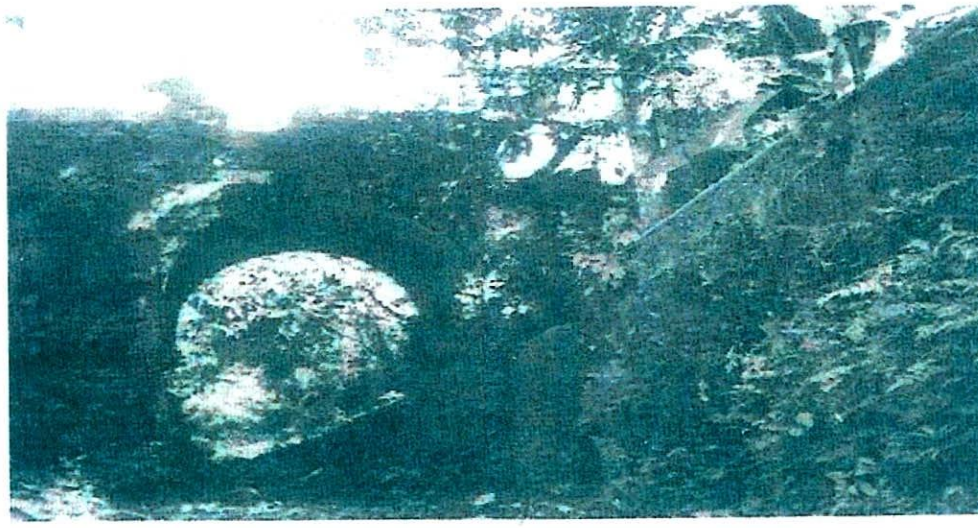

চিত্র নং- ৪৪ ছোট পানাম সেতু

সম্ভবত সংস্কারের কারণে এসব হারিয়ে গেছে। বর্তমানে যদিও সেতুটি বড় একটি খিলানের উপর দেখা যায় আদিতে এখানে তিনটি খিলানই দেখা যেত। স্তম্ভের পাশের খিলানগুলো ছোট মনে হয় সেগুলো মাটি ভরাটের ফলে অনেকটা অদৃশ্য হয়ে গেছে।[৬৬]

পানাম সেতু

ঢাকা চট্টগ্রাম সড়কের উত্তর দিকে ঢাকা শহরের ২৭ কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত আমিনপুর ইউনিয়নের পাইনাম এলাকায় পঙ্খীরাজ খালের উপর তিন খিলানের উপর ধারনকৃত একটি সেতু আছে। সুরক্ষিত সোনারগাঁও শহর এলাকাকে উত্তর দিকের লোকালয়ের সাথে যোগ করার জন্য এ সেতু নির্মাণ করা হয়েছিল। ওপারেই জালালপুর গ্রাম। তাই পাইনাম

Dhaka University Institutional Repository

জালালপুর নামে সেতু এতদিন পরিচিত ছিল। সম্প্রতি তা শুধু পানাম সেতু নামে পরিচিত হচ্ছে।

চিত্র নং- ৪৫ পানাম সেতু

সেতুটি উত্তর-দক্ষিণে প্রলম্বিত ৫৩ মিটার লম্বা ও ৪ মিটার প্রশস্ত। তলদেশে থেকে খিলানের উচ্চতা প্রায় ৯ মিটার। মাঝের খিলান সামান্য উঁচু ও বড়। খিলান স্তম্ভগুলো মজবুত স্তম্ভ দ্বারা সুরক্ষিত ও বেশ দৃঢ় করা হয়েছে। আহমদ হাসান দানীর মতে, সেতুটি মুঘল যুগে নির্মাণ করা হয়েছে। কিন্তু খিলানের রূপ দেখে তা প্রতীয়মান হয় না। অনেকবার সংস্কার করার ফলে কৌণিক খিলানগুলোর স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য পাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। তবে chamber type নির্মাণকৌশল ও brick edge style- এর নিম্নভাগ দেখে সেতুগুলোর নির্মাণ কৌশলের উৎস একই মনে হয়। সোনারগাঁ সুলতানী ও ঈসা খাঁর আমলে সুরক্ষিত এলাকা ছিল। মুঘল যুগে এখানে বিশেষ কোন স্থাপত্য নির্মাণের চিন্তা নাও হতে পারে। বরং পঙ্খীরাজ খাল যেহেতু একটি দুর্গ সুরক্ষিতকরণ প্রবাহ তাই সুলতানী আমলেই এ প্রবাহের উপর সেতু নির্মিত হয়েছিল বলা চলে। পানাম সেতু একটি সুদৃঢ় মজবুত সেতু।

Dhaka University Institutional Repository

নারায়ণগঞ্জের দুর্গ স্থাপত্য

কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতার কারণে দক্ষিন পূর্ব বাংলায় অরাজকতা দেখা দেয় তখন এ অঞ্চলে বার ভুইয়াদের উত্থান ঘটে। বাংলার ভূ-অবস্থান ও জলবায়ু মুঘল শাসনের উপযোগী ছিল না এরূপ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ভুইয়া প্রধানরা স্ব স্ব এলাকায় স্বাধীন হয়ে যায়। উপরন্ত ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দী ছিল আরাকানী মগ, পর্তুগীজ ওলন্দাজ ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানি ও বাংলার অন্যান্য সীমান্তবর্তী ক্ষুদ্র রাজ্যগুলোর ইতিহাসে নৌ-আক্রমনের এক দুর্যোগপূর্ণ সময়কাল। সম্রাট আকবরের সামরিক শক্তি বিশেষ করে নৌ শক্তি বৃদ্ধি করে সুবা বাংলায় মুঘল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করায় সচেষ্ট হন। তবে নৌ-বিদ্যায় পারদর্শী পর্তুগীজ ও মগদের আক্রমনে সোনারগাঁও তথা সারা পূর্ব বাংলায় এক ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি হলে সুবেদার ইসলাম খান সোনারগাঁও এ তার রাজধানী স্থাপন করা সমীচীন মনে করলেন না। অত:পর বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে ঢাকায় ১৬১০ খ্রিঃ বাংলার রাজধানী স্থাপন করেন এবং জাহাঙ্গীর নগর নামকরণ করেন। ঢাকাকে পূর্ববাংলার রাজধানীতে পরিনত করার পরে দেখা যায় রাজধানী হিসেবে ঢাকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সক্ষম। নদীমাতৃক সুবা বাংলার কেন্দ্রবিন্দু ঢাকার অবস্থানগত দিকটি যেমন ঢাকাতে মুঘল প্রাদেশিক রাজধানী স্থাপনে যথেষ্ট যৌক্তিকতা বহন করে, তেমনি ঢাকায় রাজধানী প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলার মুঘল শাসন সুদৃঢ় করতে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়। আর সেজন্য মুঘলগন তাঁদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য বুড়িগঙ্গা নদী, ধলেশ্বরী নদী, শীতলক্ষ্যা নদী ও মেঘনা নদী এর গুরুত্বপূর্ণ স্থানে দূর্গ নির্মাণ করেন। সুবা বাংলার দুই ধরনের দূর্গ প্রতীয়মান হয় (১) জলদুর্গ (২) প্রাসাদ দুর্গ। জলদুর্গ তৈরী করা হয়েছে রাজধানী ঢাকার প্রতিরক্ষা জোরদার করার জন্য, এবং প্রাসাদ দুর্গ তৈরী করা হয়েছে বসবাসের জন্য যেমন লালবাগ দুর্গ, কাত্রাভু দুর্গ ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

দমদমা দুর্গ

সোনারগাঁয়ের প্রাচীন নগরের খুব কাছেই মোগড়াপাড়া গ্রামটি অবস্থিত। এই এলাকার কাছাকাছি বিক্ষিপ্ত ভাবে অনেকগুলি প্রাচীন ইমারতের ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান এবং খুব কাছেই 'দমদমা দুর্গ' ছিল। জেমস ওয়াইজ কৌতুক প্রকাশ করে বলেছেন, এখন এই কাদা মাটির ধ্বংস স্তুপের গোলাকৃতির শীর্ষে একটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক তেঁতুল গাছ বেড়ে উঠেছে দুর্গের কোন চিহ্নই আর নেই।[৬৭] এই 'দমদমা দুর্গ' বা মোগড়াপাড়া দুর্গ স্থলটি গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ নির্মিত মাজার থেকে আধা মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত।

কাত্রাভু দুর্গ

কাত্রাভু চব্বিশটি পরগনার একটি, যা ছিল ভাটি অঞ্চেলের মাসনদ-ই আলা, দিওয়ান ঈশা খাঁনের শাসনাধীন।[৬৮] একসময় এটি একটি জনসমাগম পূর্ণ শহর ছিল এবং ঈসা খাঁ / দিওয়ান স্বয়ং এখানে বসবাস করতেন। এমনকি অদ্যবধি এটি রূপগঞ্জ উপজেলা একটি টাপ্পা (Tappa) অর্থাৎ 'রাজস্ব উপঅঞ্চল' (Reveneue subdvision)।

বাহারিস্তানের তথ্যানুযায়ী 'কাত্রাভু' খিজিরপুর ও কদমরসুল দুর্গের ১২ মাইলের ভিতরে উত্তর দিকে অবস্থিত। এ অঞ্চলটি বর্তমানে 'মাসুমাবাদ' নামে সুপরিচিত, যার উত্তর দিকে 'হাটবো মহলা' এবং দক্ষিণে 'দিওয়ান বাড়ী' রয়েছে। 'দিওয়ান বাড়ী' এখনও এর বিদ্যমান ধ্বংসাবশেষের জন্য বিখ্যাত। ঈসা খানের জীবদ্দশায় কাত্রাভু অঞ্চল হাটাবো, মাসুমাবাদ এবং দিওয়ান বাড়ী এই তিনটি এলাকার সমন্বয়ে গঠিত ছিল। পরবর্তীতে ঈশা খান তাঁর রাজধানী সোনারগাঁও–এ স্থানান্তরিত করার সময় ১৫৮৩ খ্রীঃ এ অঞ্চলের দায়িত্ব মাসুম খান কাবুলিকে দিয়ে যান। মুঘলদের এই প্রতিদ্বন্দ্বী গর্ভনর মাসুম খান কাবুলির নামানুসারে এ অঞ্চলের নাম হয় 'মাসুমাবাদ'।

সমরবিদ ঈশা খান অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে অদূর ভবিষ্যতে তাঁকে পরাক্রমশালী মুঘলদের আক্রমণ প্রতিহত করতে হবে এবং এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই তিনি

Dhaka University Institutional Repository

শীতলক্ষ্যার তীর ঘেষে একাধারে কতগুলি দুর্গ নির্মাণ করে সাম্রাজ্য সুরক্ষিত করেন। এই দুর্গগুলির মধ্যে 'কাত্রাভু' একটি।

'কাত্রাভু' নামকরণে 'কাত্রা' এর শেষে 'ব' এর সংযুক্তি কিছুটা অদ্ভুত শোনায় কিন্তু এটি এ অঞ্চলের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এক সমীক্ষায় দেখা যায় – উত্তরে কালীগঞ্জ থেকে দক্ষিণের সোনাকান্দা এই দুই অঞ্চলের মধ্যবর্তী এলাকার মধ্যে বহু গ্রাম আছে যেগুলির নামের শেষে 'বো'/'ব' যুক্ত আছে। সম্ভবতঃ এখানকার আঞ্চলিক ভাষায় 'ব' অর্থাৎ 'বসা', যা থেকে কোন জনবসতির স্থাপন বা 'ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা' বা টাপ্পা'কে বুঝানো হয়। এ প্রসঙ্গে একটি স্থানীয় গ্রাম্য ছড়ার উল্লেখ করা যায় যেখানে ১৮টি গ্রামের নাম 'ব' সহ আছে।[৬৯] ছড়াটির খসড়া হিসাবানুযায়ী ধারনা করা যায়, যে কাত্রাভু একটি জেলার নাম ছিল। ঢাকা এবং ময়মনসিংহ জেলার বিস্তৃত এলাকা জুড়ে ছিল এর অবস্থিতি, 'টাপ্পা' হিসেবে ছিল এব পরিচিতি এবং শীতলক্ষ্যার তীর ঘেঁষে এক চিলতে জমি। সময়ের স্রোতে এককালের জনসমাগমপূর্ণ 'কাত্রাভু' শহর মাসুমাবাদ গ্রামে পরিনত হয়েছে, একই সাথে দুর্গ পরিবেষ্টিত আবাসস্থল 'কাত্রাভু' – 'দিওয়ান বাড়ীর' ধ্বংসাবশেষের নীচে সর্বোতভাবে মৃত্তিকা গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে।[৭০] 'মাসুমাবাদ' গ্রাম বারোক মৌজা, কাত্রাভু টাপ্পা, রূপগঞ্জ উপজেলা, নারায়ণগঞ্জ জেলায় রূপান্তরিত হয়েছে। তৎকালীন কাত্রাভু শহর আজকের মাসুমাবাদ একটি উঁচু স্থানের উপর অবস্থিত। শীতলক্ষ্যার বাম তীরের এ এলাকার মাটি লাল কঙ্কর মিশ্রিত এবং চতুপার্শ্বে 'বাহাদুর খান বিল' -এর জলাভূমি দ্বারা পরিবেষ্টিত। 'কাত্রাভু' দিওয়ান ঈশা খান এবং দিওয়ান মাসুম খানের পারিবারিক বাসভবন ছিল। এলাকাবাসীর তথ্যানুযায়ী আবাসস্থলটি মাসুমাবাদ গ্রামের 'দেওয়ান ছিল। 'দেওয়ান বাড়ী' বা দেওয়ানের প্রাসাদভবনটি দীঘির দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। এই প্রাসদটি ১৫৮৩ খ্রীঃ -এ শাহবাজ খান কর্তৃক - অংশতঃ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং ১৬০৮ খ্রীঃ পুনরায় মীর্জা নাথান কর্তৃক ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তারপরও দেওয়ান দাউদ খান আকস্মিক ভাবে পর্তুগীজ দস্যুদের হাতে

Dhaka University Institutional Repository

নিহত হওয়ার আগ পর্যন্ত এস্থান তাঁর বংশধরগন ধরে রাখেন। তাঁর মৃত্যুর ফলে এটি মুঘলদের হস্তগত হয়ে যায়।

এই বিখ্যাত শহর এবং ঈশা খানের বাসভবনের মধ্যে অদ্যাবধি যেটুকু চিহ্ন রয়েছে তা হল, মিঠপুকুর' সম্বলিত 'দেওয়ান বাড়ী' এবং দীঘির উত্তর দিকে নির্মিত দেওয়ানের জীর্ণ বা ধ্বংস প্রাপ্ত স্তম্ভ। ধ্বংস প্রায় দেওয়ান বাড়ীটি কাদামাটির তৈরী। দুর্গটি পশ্চিম, দক্ষিণ এবং পূর্বদিকে ২.৮৯ মি. পুরু ইটের দেয়াল এবং অষ্টকোণী পার্শ্ব বুরুজ দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। এটি প্রায় ১৩০০×১০০০ ফুট (WS×EW) আকৃতির। পশ্চিম এবং দক্ষিণ দেয়ালের পেছনে ২০০ ফুট এলাকা জুড়ে বিস্তৃত জলাভূমি ছিল। পূর্বদিকে অবস্থিত প্রাসাদের প্রশেপথটি বহু পিলার সম্বলিত এবং একটি উঁচু স্থানের দিকে প্রসারিত ছিল সম্ভবত এখানে অধীনস্তদের জন্য বাসস্থান ছিল। দরজার পাশে দক্ষিণ দিকে এবং দেয়ালের মিলনস্থলে একটি গোলাকৃতির উঁচু জমি দেখা যায়। সম্ভবতঃ এখানে একটি উঁচু বুরুজ ছিল। এই বুরুজ থেকে দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা দেয়াল আরম্ভ হয়ে পূর্বদিকের বিল এলাকা পর্যন্ত পৌঁছে এবং উত্তরে মোড় নিয়ে দেওয়ান দীঘির দক্ষিণ পাড় ঘেষে মাঝ বরাবর চলে গেছে। এই দ্বিতীয় দেয়ালটি পুনরায় পশ্চিমে গিয়ে দেওয়ান বাড়ীর উত্তর- পূর্ব কোনের বুরুজে গিয়ে মিলেছে।

দেওয়ান বাড়ীর উত্তর বেষ্টনীর পিছন দিকে ইটের দেয়ালের চিহ্ন পাওয়া যায়, এটি 'কাজী বাড়ী' পর্যন্ত প্রলম্বিত। সম্ভবতঃ এই আবাসিক স্থলটি উঁচু পর্যাযের কর্মকর্তাদের জন্য বরাদ্দ ছিল।

'দেওয়ান বাড়ীর' উত্তর বেষ্টনীতে কিছু সংখ্যক স্তম্ভ চিহ্নিত করা যায়। এ গুলির মধ্যে একটি স্তম্ভ (১০ফুট উঁচু এবং ৬×৬ বর্গফুট) ব্যতীত অন্য সবগুলি মাটির (ground level) স্তর পর্যন্ত বিদ্যমান। এই ব্যতিক্রমধর্মী পিলারটির মধ্যে উল্লম্বভাবে একটি পোড়ানো মাটির পাইপ গ্রোথিত রয়েছে। দেখে বোঝা যায় এটি এটি পানির পাইপ ছিল। সম্ভবতঃ এই পানি পাইপের সাথে মিঠাপুকুরের যোগ ছিল। যার মাধ্যমে দেওয়ান বাড়ীতে পানি সরবরাহের কাজ চলতো।

Dhaka University Institutional Repository

মিঠাপুকুরটি প্রায় বর্গাকার ছিল। এটি ২০´ গভীর ছিল এবং চর্তুদিকে ইউ আকৃতির দেয়াল পরিবেষ্টিত ছিল। ইটগুলি অসম আকৃতির এর উত্তর-পশ্চিম তীরে পাথর নির্মিত সিঁড়ির ধাপ বিশিষ্ট ঘাটের চিহ্ন অদ্যাবধি বিদ্যমান। প্রকৃত পক্ষে এই পানির ট্যাংক বা জলাধারটি খাওয়ার পানি সরবরাহ করত। এমনকি ২০ বছর আগেও ট্যাংকটির ভিতরে অসংখ্য কালো স্তম্ভ ছিল কিন্তু এখন আর এগুলির কোন চিহ্ন নেই। স্থানীয় লোকজনের কাছ থেকে জানা যায়, এই দীঘির উত্তর পাড়ে একটি মসজিদ ছিল। এটিরও কোন অস্তিত্ব আজ নেই। ট্যাঙ্কের পশ্চিম পাড়ে ইটের দেয়ালের চিহ্ন পাওয়া যায়। এখানে এখন কাদার স্তুপ, ফলবৃক্ষ, কাঁটাবন দেখা যায় যা লম্বা ঘাসে আচ্ছাদিত।

এখানকার ইট গুলি,–

$৮'' \times ৬\frac{১}{২}'' \times ২\frac{১}{২}''$;

$৭\frac{১}{২}'' \times ৬'' \times ১\frac{১}{৪}''$;

$৬'' \times ৫'' \times ১\frac{১}{৩}''$ ইত্যাদি এমনকি এর চেয়ে ছোট মাপেরও আছে।

উঁচু পর্যায়ের অফিসারদের আবাসস্থলের পূর্বে এবং প্রাসাদের উত্তর পূর্বাংশের বেষ্টনীর পিছনে 'দেওয়ান দীঘি' নামে ২০ একর একটি বিস্তৃত পুকুর রয়েছে যার মাঝখানে দ্বীপের মত একটি অংশ রয়েছে। এটি উত্তর-দক্ষিণে ১৪৪০ ফুট লম্বা ও ৭২০ ফুট প্রশস্ত। এই দীঘির পশ্চিম এবং দক্ষিণ পাশে এখনও দেওয়ান পরিবারের বংশধররা বসবাস করছে। এই দেওয়ান দীঘির পশ্চিম পাশে একটি ধ্বংস প্রায় ঢিঁপি, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ইট সমন্বয় আচ্ছাদিত একটি এলাকা পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ এটি একটি হাম্মামখানা ছিল হাম্মামের পরবর্তী অংশ 'রাজ ঘাট' নামে পরিচিত। দিওয়ান দীঘির মাঝখানে একটি বর্গকার দ্বীপ ছবির মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। ১৯৭২ সাল পর্যন্ত এই দ্বীপাঞ্চলটি মাটির উঁচু রাস্তা দ্বারা দীঘির পশ্চিম তীরের সাথে সংযুক্ত ছিল। সম্ভবতঃ 'দেওয়ান বাড়ীর' উত্তর বেষ্টনীতে রাজঘাটের

Dhaka University Institutional Repository

দিকে একটি প্রবেশপথ ছিল। দীঘির উত্তর পাশে একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাকারবেষ্টিত সমাধি সৌধ আছে যা বর্তমানে একটি কবরস্থান হয়েছে। এই সমাধি স্থানটি ৪০ ফুট লম্বা এবং ৩৫ ফুট চওড়া। এখানে প্রাপ্ত পাথরের পিলারের ধ্বংসাবশেষ দেখে মসজিদের দেয়ালে একটি মিহ্রাবের মত মনে হয় যা উত্তর ভারতে প্রচলিত একটি রীতি কীনায়েতী (Oinayeti) মসজিদের মতই।[৭১] মিহ্রাব এবং সমাধির মধ্যবর্তী জায়গায় কিছু নির্মাণ শৈলীর ভিত্তিমূল আজও বিদ্যমান। এই সমাধিতে প্রকৃত পক্ষে কোন ব্যক্তি শায়িত আছে তা জানা যায়নি। ঈশা খান এর রাজধানী সোনারগাঁও –এ স্থানান্তরিত করার পর মাসুম খান কাত্রাভু সংস্কার করান এবং ১৫৯৮ খ্রীঃ এ তাঁর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এখানেই বসবাস করেন। পরবর্তীতে ঈশা খানের মৃত্যুর পরও (১৫৯৯ খ্রীঃ) মুসা খানের সাথে মাসুম খানের সুসম্পর্ক বজায় ছিল। এ থেকে ধারণা করা যায়, সম্ভবতঃ মাসুম খান কাবুলি স্বয়ং সমাধি নির্মাণ করেছিলেন তাঁর নিজের জন্যই, যিনি কাত্রাভুতে দীর্ঘ ১৫ বছর (১৫৮৩-১৮৯৮ খ্রীঃ) বসবাস করে ছিলেন।

এই কাত্রাভু দুর্গ ঈশা খান এবং তাঁর পুত্র মুসা খানের সাম্রাজ্যকে সুরক্ষিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। কিন্তু গত সাড়ে তিন শতাব্দী সময়ের মধ্যে এই এলাকার ব্যাপক ভৌগলিক পরিবর্তন ঘটেছে, বার বার নদীর গতিপথ পরিবর্তনের ফলে এই অঞ্চলের এত বিশাল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে যে বাহারিস্তান- ই-গায়েবী অথবা সমসাময়িক উৎস থেকে প্রাপ্ত আঞ্চলিক বিবরণের সাথে একে মিলানো একবারে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। এজন্য এই এলাকার আরো গুরুত্ব সহকারে ও বিজ্ঞান সম্মত ভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান চালিয়ে অজানা তথ্যসমূহ উদঘাটন করে 'কাত্রাভু' –এর প্রকৃত রহস্য উন্মোচন করা প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

সোনাকান্দা দুর্গ

অবস্থান ঃ

সোনাকান্দা দুর্গটি নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দর থানার কলাগাছিয়া ইউনিয়নের এনায়েত নগর গ্রামে শীতলক্ষ্যা নদীর পূর্ব দিকে ও ধলেশ্বরী নদীর উত্তর দিকে অবস্থিত। দুর্গটি এক সময় শীতলক্ষ্যা ও পুরাতন বুড়িগঙ্গা নদীর সঙ্গম স্থলে অবস্থিত ছিল[৭২] এবং এর প্রধান বুরুজটি শীতলক্ষ্যার তীর ঘেষে নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে নদীর গতি অনেক পরিবর্তিত হয়েছে এবং দুর্গটির চারপাশে প্রচুর বসতি গড়ে উঠেছে। দুর্গ হতে মাত্র ১.৫০ কি.মি. দক্ষিণে বাবা সালেহের মসজিদ ও সমাধি রয়েছে।

চিত্র নং- ৪৬ সোনাকান্দা দুর্গ

Dhaka University Institutional Repository

নির্মাণ কাল

সোনাকান্দা দুর্গের কোন শিলালিপি পাওয়া যায়নি । ফলে এর নির্মাণকাল নিয়ে মতভেদ রয়েছে। সবচেয়ে প্রচলিত মতানুযায়ী, এটি বাংলার সুবেদার মীর জুমলা (১৬৬০-৬৩) কর্তৃক নির্মিত হয়েছে।[৭৩] কিন্তু এই মতের স্বপক্ষে কোন প্রমান পাওয়া যায়না। তবে নারায়ণগঞ্জে অবস্থিত হাজীগঞ্জ দুর্গও মুন্সিগঞ্জে অবস্থিত ইদ্রাকপুর দুর্গের সাথে স্থাপত্যিক এবং পরিকল্পনাগত মিল থাকার কারণে এটি ১৭শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়। আহমেদ হাসান দানীর মতে এটি সম্ভবত হাজীগঞ্জ দুর্গের সমসাময়িক সময়ে নির্মাণ করা হয়েছে [৭৪]

চিত্র নং-৪৭ সোনাকান্দা দুর্গের বর্তমান অবস্থা

বর্তমান অবস্থা

১৯৫০ খ্রি: তৎকালীন প্রত্নতত্ত্ব ও যাদুঘর বিভাগ কর্তৃক সংরক্ষিত ইমারত হিসেবে গৃহীত হওয়ার পর থেকে বহুবার দুর্গটির সংস্কার সাধন করা হয়েছে।[৭৫] ফলে এর সামগ্রিক পরিকল্পনা ও স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে এখনও আদি অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

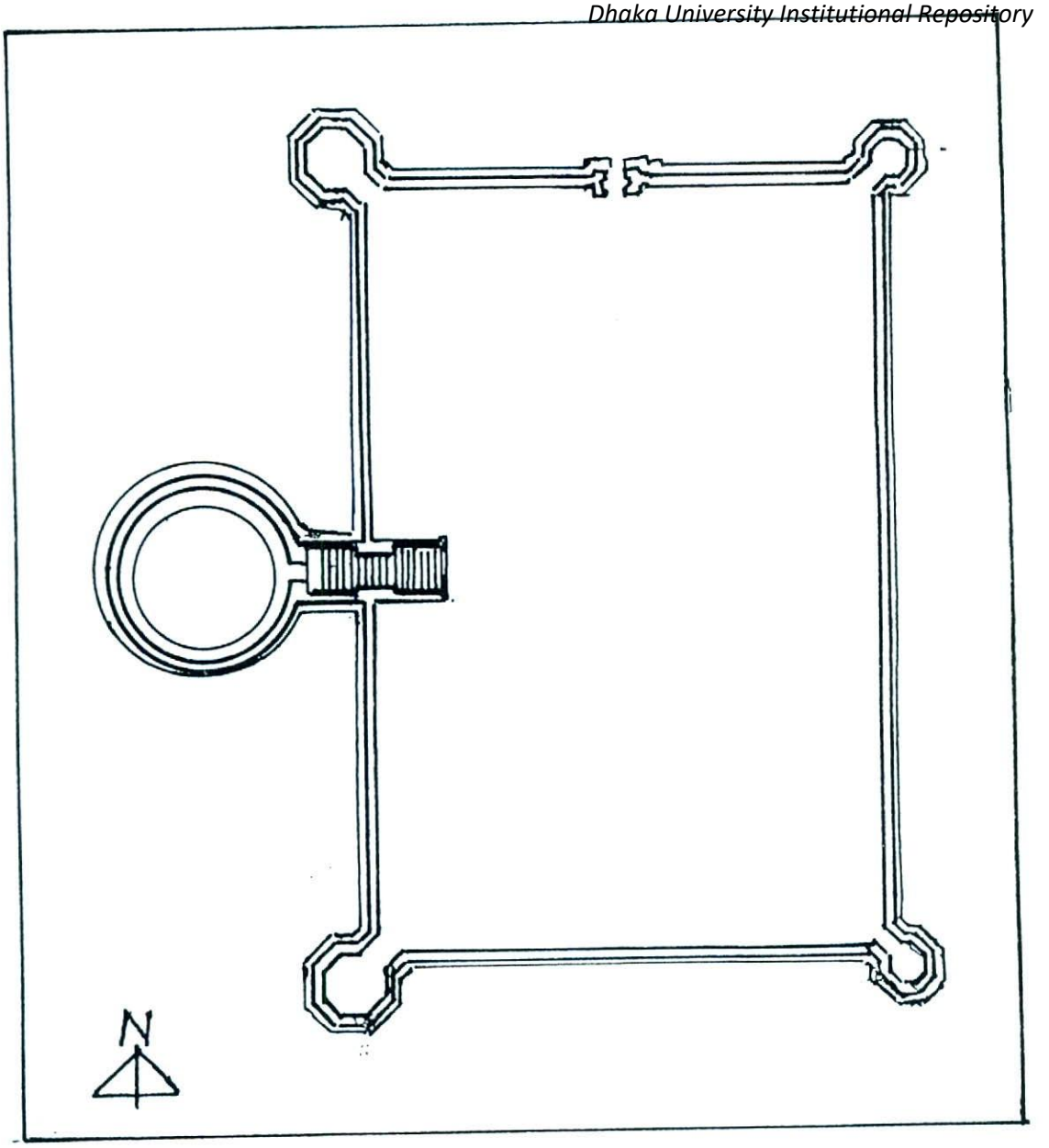

GROUND PLAN
SONAKANDA FORT

ভূমিনকশা - ১৬

Dhaka University Institutional Repository

গঠন প্রনালী ও ভূমি নকশা

সোনাকান্দা দুর্গটি উত্তর দক্ষিনে বিস্তৃত এবং আয়তাকৃতির। সোনাকান্দা দুর্গটি সম্পূর্ণ ইটের তৈরী। এর পরিমাপ ৪৮.৫৬ × ৫৭.০ মিটার চতুর্দিকে ৩.০৫ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। দুর্গটির অভ্যন্তরে উঁচু বৃত্তাকৃতির প্রতিরক্ষা মঞ্চ আছে যেখান থেকে কামান দ্বারা বাহির হতে আগ্রসরমান আক্রমনকারীদের উপরে গোলাবর্সন করা হত। তাছাড়া দুর্গের বেষ্টনী প্রাচীরের মাঝে মাঝে একটি পর্যবেক্ষণ বুরুজ সংযুক্ত আছে। এই দুর্গের চার কোণে চারটি অষ্টভুজাকৃতির জাঁকাল প্রতিরক্ষা বুরুজ রয়েছে। দুর্গের একমাত্র প্রবেশ তোরণটি উত্তর বাহুর কেন্দ্রে অবস্থিত। এটি অনেকটা ষড়ভুজ পরিকল্পনায় নির্মিত। এর আয়তন পূর্ব পশ্চিমে ১০.৩৭ মিটার এবং উত্তর দক্ষিণে ৩.৪১ মিটার। সর্বোচ্চে অবস্থিত মারলনসহ তোরনটির সামগ্রিক উচ্চতা ৫.৮০ মিটার। এর প্রবেশ পথের ফাসাদ তিন খিলানের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় খিলানটির দ্বারা দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যায়। এটি পূর্ব-পশ্চিমে ২.৪৪ মিটার বিস্তৃত এবং ৩.৩৫ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট খিলান ১.২২ মিটার পুরু। চতুর্কেন্দ্রিক পরিকল্পনায় নির্মিত এই খিলানটি প্যানেল বিশিষ্ট একটি আয়তাকার ফ্রেমের অভ্যন্তরে প্রোথিত। খিলানসহ কাঠামোর বিস্তৃতি পূর্ব পশ্চিমে ৪.৮৮ মিটার। গভীর হলেও খিলানের শীর্ষ বিন্দু বরাবর উপরিভাগে অবস্থিত প্যানেলের গভীরতা কমপক্ষে ২০ সে.মি. এখানে সম্ভবত দুর্গের শিলালিপি ছিল। সম্পূর্ন খিলান কাঠামোর পূর্ব ও পশ্চিমে দুটি সরু অষ্টকোণাকার সংযুক্ত বুরুজ রয়েছে। এ ধরনের বুরুজ লালবাগ কমপ্লেক্সর উত্তর ও দক্ষিণ তোরণে লক্ষ্য করা যায়। তবে দক্ষিণ তোরণের ক্ষেত্রে এগুলো ব্যান্ডযুক্ত বুরুজ দুটি তোরণের ফাসাদকে তিনটি আলাদা অংশে ভাগ করেছে। তার মধ্যে কেন্দ্রীয় অংশটি সরাসরি উত্তর দিকে দৃশ্যমান থাকলেও এর পূর্ব ও পশ্চিম অংশ যথাক্রমে উত্তর পূর্ব ও উত্তর পশ্চিম দিকে ঘুরিয়ে দেয়া হয়েছে। ফাসাদের এই অংশ দুটি একই বৈশিষ্ট্য নিয়ে গঠিত। এর সর্বনিম্নে রয়েছে ৬৬ সে.মি. এবং ১.৪৩ মি. উচ্চতা বিশিষ্ট খিলান আকৃতির গভীর বদ্ধ কুলঙ্গি যার উপরিভাগে তিনটি অগভীর প্যানেল পর পর সাজানো খিলানগুলো

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষুদ্রাকারে নির্মিত হওয়ায় লালবাগ দুর্গের দক্ষিণ তোরণের ফাসাদের ন্যায় কেন্দ্রীয় খিলানের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করেনি। পরিশেষে ফাসাদের উভয়পাশে আরও দুটি অষ্টকোণাকারা সরু কোণা বুরুজ এবং দুর্গ প্রাচীরের সাথে মিলিয়ে আয়তাকার স্তম্ভ নির্মিত হয়েছে। তোরণের কার্নিশ সমান্তরাল মোল্ডিং নকশা দ্বারা চিহ্নিত এবং এর উপরিভাগে শরছিদ্র বিশিষ্ট এক সারি মারলন রয়েছে।

চিত্র নং- ৪৮ সোনাকান্দা দুর্গের সিড়ি যুক্ত বেদী

তোরণটির অভ্যন্তর ভাগ আয়তাকার পরিকল্পনায় নির্মিত। এর পরিমাত্রা পূর্ব-পশ্চিমে ৫.৪২ মিটার এবং উত্তর দক্ষিণে ১.৬৮ মিটার। একটি খিলান ছাদ এর দ্বারা অভ্যন্তরভাগ আচ্ছাদিত। পূর্ব ও পশ্চিম দেয়ালের মধ্যবর্তী স্থানে দুটি আয়তকার কুলঙ্গি এবং উত্তর খিলানের উপরিভাগে দরজা আটকানো লুব রয়েছে। ইমারতটির দক্ষিণ ফাসাদের স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য খিলানটি প্যানেলে বিশিষ্ট আয়তাকার ফ্রেমের অভ্যন্তরে প্রথিত হলেও এর পাশে অলংকার বিহীন স্তম্ভ একই রেখায় নির্মিত হয়েছে। তাছাড়া ফাসাদের উপরিভাগে কোন বদ্ধ মারলন লক্ষ্য করা যায় না।

Dhaka University Institutional Repository

দুর্গের পরিবেষ্টন প্রাচীর ও কোণের বুরুজসমূহ : দুর্গের প্রাচীর ১.০৬ মিটার পুরু এবং ৩.০৫ মিটার উচ্চতাসম্পন্ন। দুর্গটির পশ্চিম প্রাচীরের দু'কোণের বুরুজ (উত্তর পশ্চিম, দক্ষিণ-পশ্চিম) পূর্ব প্রাচীরের দু-কোণের বুরুজ (উত্তর-পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব) থেকে অপেক্ষাকৃত বড় এবং এদের ব্যাস যথাক্রমে ৬.৮ মিটার ৪.২৬ মিটার। প্রতিটি বুরুজের সম্মুখে ২.৫ মিটার দীর্ঘ সরুপথ আছে। দুর্গের পরিবেষ্টন প্রাচীরগুলো ও বুরুজগুলোর শীর্ষদেশ ফোকরযুক্ত (loop holes) সম-আকৃতির মারলন দ্বারা শোভিত। পরিবেষ্টন প্রাচীর, বুরুজের মারলন ও প্রাচীরের মারলনগুলোতে ব্যবহৃত বড় ফোকরগুলো কামানের ও বন্দুকের গোলা নিক্ষেপের কাজে ব্যবহৃত হতো।

পশ্চিম প্রাচীরের মধ্যবর্তী সিঁড়ি খিলানপথসহ উঁচু বেদী : ইদ্রাকপুর দুর্গের ন্যায় সোনাকান্দা দুর্গের ও একটি বৈশিষ্ট্য স্থাপনা হলো পশ্চিম প্রাচীরের সিঁড়িযুক্ত খিলানপথসহ উঁচু বেদীটি। তবে ইদ্রাকপুর দুর্গের মতো সোনাকান্দা দুর্গের এ অংশটি বর্ধিত কোনা নয় বরং দুর্গের গঠন কাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ন একটি সংযোজন। ধারনা করা হয় যে, বৃত্তাকারে নির্মিত এ উঁচু বেদীটি স্থায়ীভাবে নদীমুখী করে কামান স্থাপনের উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছে । অবস্থানগত দিক বিচারে বলা যায়, যদিও বর্তমানে নদী অনেক দূরে সরে গিয়েছে, তথাপি সমকালীন সময়ে নদী পথ একেবারে দুর্গের পাশ দিয়ে বয়ে যেত। ফলে এদিকে নদী পথ পাহারা দেয়ার জন্য কামান স্থাপনের উদ্দেশ্যে উঁচু বেদীটি নির্মাণ করা হয়েছিল। বৃত্তাকার বেদীটির অভ্যন্তরভাগ ১৫.৭০ মিটার এবং বহির্ভাগ ১৯.৩৯ মিটার ব্যাস বিশিষ্ট। বেদীর চারদিকের পরিবেষ্টন প্রাচীর ১.৬ মিটার পুরু এবং সমগ্র বেদীটি ৯০ মিটার। বৃত্তাকার বেদীর সর্বত্র চলাচলের জন্য প্রায় ৩ মিটার প্রশস্ত টানা পথ আছে। বেদীটির বেষ্টনী প্রাচীরও দুর্গের বেষ্টনী প্রাচীর ও বুরুজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ফোকর ও মারলন লক্ষ্য করা যায়। তবে ব্যতিক্রম হলো, দুর্গের বেষ্টনী প্রাচীর ও বুরুজের মারলনগুলো সরল হলেও উঁচু বেদীটির মারলনগুলো খাঁজযুক্ত।

আরও উল্লেখ্য যে, আয়তাকার দুর্গের ভিত্তিভূমি থেকে উঁচুতে স্থাপিত বেদীতে যাওয়ার জন্য পাঁচটি খাঁজযুক্ত খিলানপথসহ ২৫টি ধাপযুক্ত সিড়িপথ আছে। দ্বি-বিভক্ত সিঁড়িপথের দৈর্ঘ্য ১৬.১৫ মিটার। সিঁড়ির প্রতিটি ধাপ ০.৬ মিটার প্রশস্ত। বেদীর খিলানপথ

Dhaka University Institutional Repository

থেকে দুর্গের প্রাচীর পর্যন্ত বিস্তৃত সিঁড়ির দুদিকের প্রাচীরেও সরল একক ফোকরযুক্ত মারলন শোভিত আছে।

হাজীগঞ্জ দুর্গ

নারায়ণগঞ্জ জেলার নারায়ণগঞ্জ সদর থানার হাজীগঞ্জ মৌজায় হাজীগঞ্জ দূর্গটির অবস্থান। এ দূর্গটি রাজধানী ঢাকা থেকে ১৫.৭৫ কিলোমিটার দক্ষিণ পূর্বে এবং নারায়ণগঞ্জ সদরের পূর্ব দিক দিয়ে প্রবাহিত শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে অবস্থিত। পূর্বে এ স্থানটি শীতলক্ষ্যা ও বুড়িগঙ্গার সঙ্গমস্থল ছিল এবং এর নাম ছিল খিজিরপুর। এ স্থানের নামানুসারে দুর্গটি খিজিরপুর দুর্গ নামে পরিচিতি লাভ করে।

চিত্র নং-৪৯ হাজীগঞ্জ দুর্গের প্রবেশ পথ

Dhaka University Institutional Repository

নির্মাণকাল

দুর্গটিতে কোন শিলালিপি পাওয়া যায়নি বিধায় এর সঠিক নির্মাণকাল সম্পর্কে জানা যায়নি। রহমান আলী তায়েশের মতে, আরাকানী মগদের আক্রমন প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে মীর জুমলা ১৬৬০ খৃঃ এটি নির্মাণ করেছিলেন ।[৭৬] সৈয়দ আওলাদ হোসেন, আব্দুল করিম, সৈয়দ মাহমুদুল হাসান সহ প্রায় সকল স্থাপত্য ঐতিহাসিক পূর্ববর্তীর মত সমর্থন করেন। কিন্তু এস.এম. তাইফুর এবং এ, এইচ, দানী ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাইফুরের মতে মীর জুমলার বাংলায় আগমনের পূর্ব হতেই দুর্গটি মুঘল সৈন্যদের আবাস স্থল ছিল।[৭৭] এ,এইচ, দানীর মতে, ইসলাম খান মুঘল বাংলার রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরের পর খিজিরপুর দুর্গটি নির্মাণ করেন।[৭৮] তবে তাদের মতের সমর্থনে কোন উৎসের উল্লেখ পাওয়া যায়না। সমসাময়িক উৎস বাহারিস্তান-ই-গায়েবী ও আকবর নামা' গ্রন্থের বিবরনে মুঘল বাংলার রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাছাড়া খিজিরপুর অঞ্চলটি ঈশা খা ও তৎপুত্র মুসা খানের সময়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা কেন্দ্র ছিল।[৭৯] তবে বর্তমান দুর্গ যে ১৭শ শতকে নির্মিত হয়েছিল এ বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত।

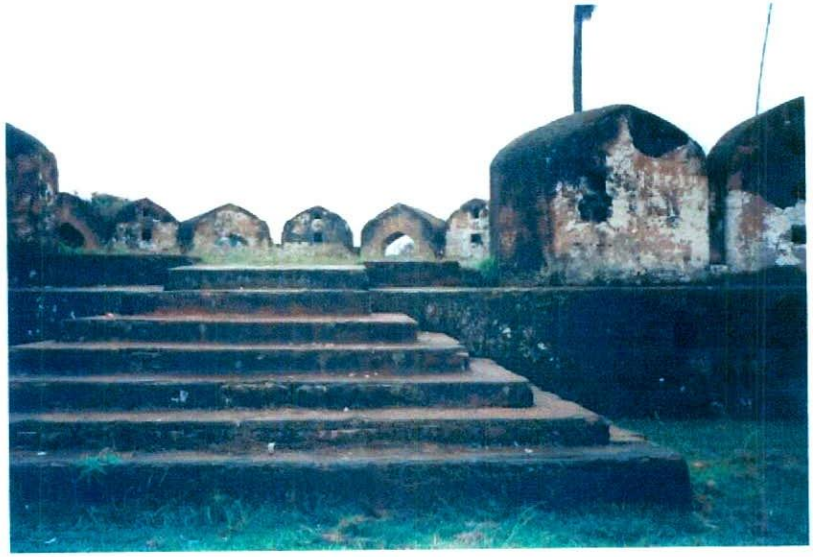

চিত্র নং- ৫০ হাজীগঞ্জ দুর্গের বেদী

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান অবস্থা

১৮৯৬ খ্রি: প্রকাশিত (List of Arcient Monuments in Bengal" গ্রন্থে এ দুর্গের ধ্বংসোম্মুখ অবস্থার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। সেখানে বেষ্টনী প্রাচীর ও মাত্র একটি দুর্গ বুরুজের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৮০] মুনশী রহমান আলী তায়েশ এর অভ্যন্তরের প্রাচীর ও মিনার (সম্ভবত দুর্গবুরুজ) রয়েছে বলে উল্লেখ করেন ।[৮১] ১৯৫০ খ্রি: এটি তৎকালীন 'প্রত্নতত্ত্ব ও যাদুঘর বিভাগ কর্তৃক সংরক্ষিত ইমারত হিসেবে গৃহীত হয়। এরপর হতে বর্তমান কাল পর্যন্ত দুর্গটি বহুবার সংস্কার করা হয়েছে।[৮২] তবে সমগ্র ইমারতটি তার নিজস্ব আদি ভূমি নকশায় দন্ডায়মান রয়েছে।

পরিকল্পনা ও বিবরণ

ষষ্টভূজ পরিকল্পনার হাজিগঞ্জ দুর্গটিকে যদিও সাধারণভাবে হাজিগঞ্জ দুর্গটিকে পঞ্চভুজ বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে কিন্তু পূর্ব অংকিত পঞ্চভুজ ভূমি নকশা অনুসরন করে বাস্তব পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, আদিতে হাজিগঞ্জ দুর্গের ভূমি নকশা ষষ্ঠ ভুজাকৃতির ছিল।[৮৩] বর্তমানে পাঁচটি প্রান্ত কোন বিদ্যমান থাকলেও দুর্গের সর্ব দক্ষিণ পূর্বের কিছু অংশ ধ্বংস হয়ে গেছে। অতএব টিকে থাকা পাঁচটি কোণ দেখে সাধারণভাবে হাজিগঞ্জ দুর্গটি পঞ্চকোণাকৃতির বলেই অভিহিত হয়ে আসছে। প্রকৃত পক্ষে দুর্গটির পূর্ব-দক্ষিণ দিকের বেষ্টনী প্রাচীরসহ কিছু অংশ অনেক আগেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। দুর্গটির বিলুপ্ত অংশটির স্থলে নতুন ইমারত নির্মিত হয়েছে। ধারনা করা যেতে পারে দুর্গ এলাকার পূর্ব-দক্ষিণ অংশে সেখানে হাজিগঞ্জ দুর্গের ষষ্ঠকোণের বুরুজটির অস্তিত্ব ছিল। সেখানে বৃটিশ শাসনামলের একটি ফায়ার ব্রিগেড কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছিল। দুর্গটির পূর্ব ও দক্ষিণের চলমান বেষ্টনী প্রাচীর দুটি যে পর্যন্ত গিয়ে থেমে গেছে তা প্রত্যক্ষ করে ঐ বেষ্টনী প্রাচীরের স্বাভাবিক সমাপ্তির কোন লক্ষণ খুঁজে পাওয়া যায়না বরং হাজিগঞ্জ দুর্গের ঠিক পশ্চিম প্রান্তের বুরুজের অনুরূপ একটি বুরুজ এ স্থানে (পূর্ব দক্ষিণ কোণে) বিদ্যমান থাকার যথেষ্ট যুক্তিপূর্ণ ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বাস্তব জরিপ ও পর্যবেক্ষণের সূত্র ধরে হাজীগঞ্জ দুর্গকে ষষ্টভুজ হিসেবে

Dhaka University Institutional Repository

গ্রহণ করা যেতে পারে। আদিতে ষষ্টভূজাকৃতির হাজিগঞ্জ দুর্গের বর্তমানে বিদ্যমান সবগুলি (পাঁচটি) কোণে একটি করে বৃত্তকার প্রান্ত প্রতিরক্ষা বুরুজ রয়েছে। এ বুরুজগুলি সমান মাপের নয় অর্থাৎ একটির ব্যাস আকারটি থেকে কিছুটা কম বেশি পরিলক্ষিত হয়।[৮৪]

হাজিগঞ্জ দুর্গের প্রবেশ তোরনটি উত্তর দিকে অবস্থিত। এটি সরল আয়তাকার পরিকল্পনা নির্মিত। এর আয়তন পূর্ব পশ্চিম ৬.১০ মিটার এবং উত্তর দক্ষিণে ৩ মিটার। ভূমি হতে সিড়ির সাহায্যে এর কেন্দ্রীয় খিলানে পৌছানো হয়। তোরনের ভিতরে ও বাইরে একই রকম সিড়ি রয়েছে। অভ্যন্তর ভাগে এর সংখ্যা ৮টি হলেও বাইরের দিকে অনেক বেশী, বাইরের সিঁড়ির এর দৈর্ঘ্য ৭.৭৫ মিটার এবং এ অংশটি উভয় পাশে প্রশস্ত প্রতিরক্ষা দেয়াল রয়েছে। প্রবেশ পথটি চতুর্কেন্দ্রিক খিলান বিশিষ্ট এর পরিমাপ পূর্ব-পশ্চিমে ২.০৯ মিটার এবং ঘনত্ব ৭১ সে.মি.। খিলানটি আয়তকার ফ্রেমের মধ্যে সংস্থাপিত, তোরণের কার্নিশে মোল্ডিং নকশার উপরে পদ্ম পাপড়ির ন্যায় পাঁচটি করে মারলন নকশা রয়েছে। প্রত্যেকটির গায়ে রয়েছে শরছিদ্র। প্রবেশ খিলানের উপরি ভাগে একটি সরু ও অপেক্ষাকৃত গভীর প্যানেল রয়েছে। এ স্থানে সম্ভবত দুর্গের শিলালিপি ছিল যা বর্তমানে নেই। তোরণটি উভয় দিকে সরু সংযুক্ত বুরুজ দ্বারা সীমায়িত। এগুলো তোরণের উচ্চতা পর্যন্ত উঠে গেছে এবং এর পার্শ্ববর্তী স্থানে নির্মিত আয়তকার স্তম্ভ তোরণের সম উচ্চতায় দন্ডয়মান। এগুলোর গাত্রে কার্নিশ পর্যন্ত উচ্চতা বিশিষ্ট একটি করে সরু প্যানেল রয়েছে। স্তম্ভের পাশে দুর্গ বাহুর মারলনের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে অর্ধ-মারলন নির্মাণ করা হয়েছে এবং স্তম্ভসহ এ অংশটি পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তোরণের অভ্যন্তরভাগ খিলান ছাদ দ্বারা আচ্ছাদিত। এর আয়তন পূর্ব-পশ্চিমে ২.৫০ মিটার এবং উত্তর দক্ষিণে ১.৪৫ মিটার। তোরণের পূর্ব ও পশ্চিম দেয়ালে একটি করে ক্ষুদ্রাকার কুলঙ্গি ব্যতীত অন্য কোন বৈশিষ্ট্য দেয়া যায় না। এই কুলঙ্গি গুলো সম্ভবত বাতি জালানোর কাজে ব্যবহৃত হতো। সম্মুখভাগের সিড়ির রেলিং ব্যতীত তোরণের দক্ষিণ ফাসাদের অবয়ব অনেকটা উত্তর ফাসাদের অনুরূপ। এর কেন্দ্রে রয়েছে একই পরিমাপের চতুর্কেন্দ্রিক প্রবেশ খিলান যা প্যানেল বিশিষ্ট ফ্রেমের

Dhaka University Institutional Repository

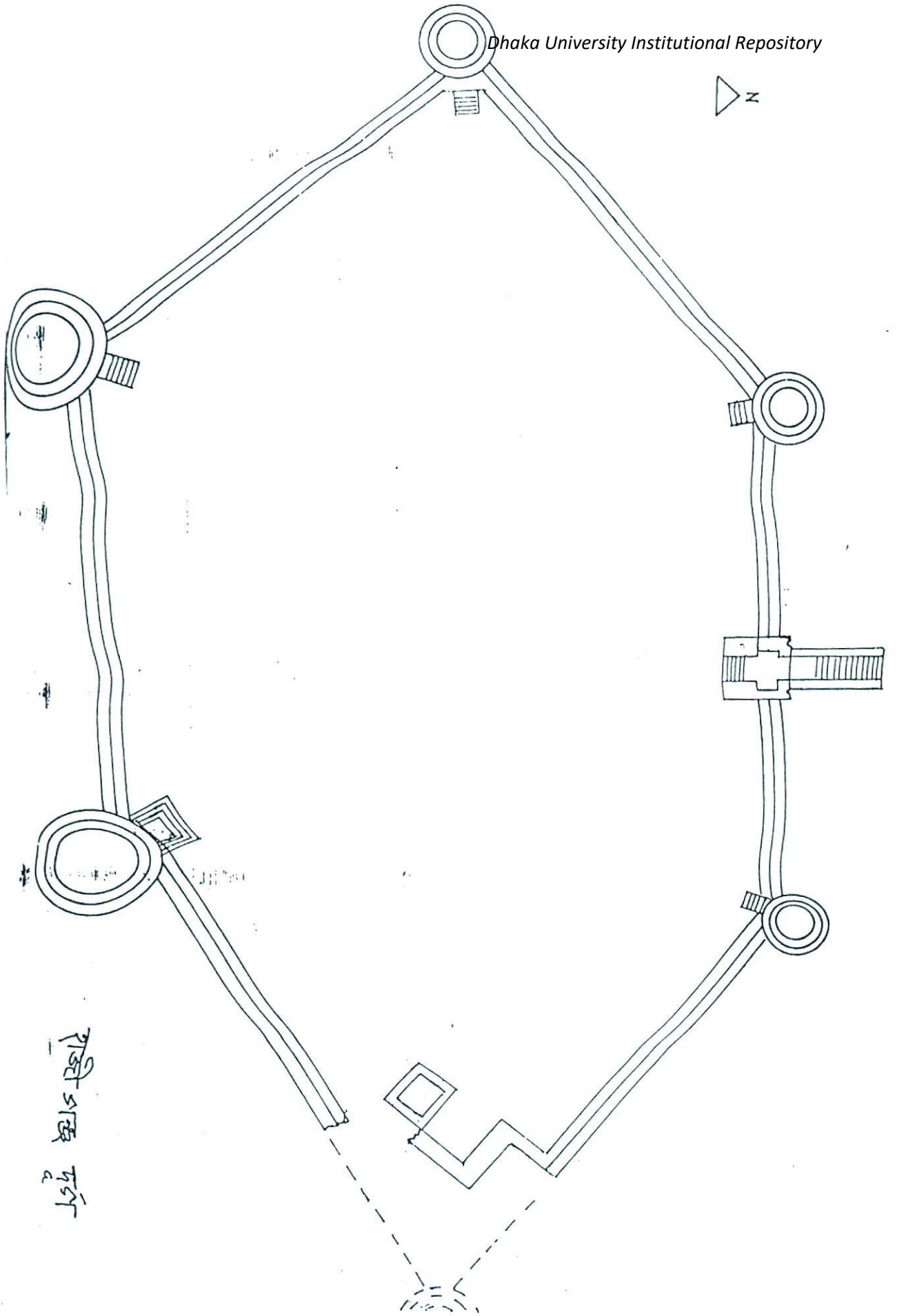

ভূমিনকশা - ১৭

Dhaka University Institutional Repository

অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট। তবে উত্তর ফাসাদের ন্যায় এই ফাসাদটিতে কোন সংযুক্ত বুরুজ কিংবা স্ত ম্ভ নেই। তাছাড়া কার্নিশের উপরিভাগে মারলন নকশার অবস্থানও লক্ষ করা যায় না। তোরণের পূর্বও পশ্চিম ফাসাদ দুর্গের বাহুর সাথে মিলে গেছে।

চিত্র নং-৫১ হাজীগঞ্জ দুর্গের পর্যবেক্ষণ বুরুজ

প্রবেশ তোরণসহ দুর্গটির উত্তর বাহুর পরিমাপ ৪৪.০৪ মিটার (১৯.৪৩+৫.১৮+১৯.৪৩ মিটার) প্রবেশ তোরণ বরাবর দক্ষিণ দিকের বাহুটিও একই পরিমাপ বিশিষ্ট। দক্ষিণ বাহুর বৃত্তাকার বুরুজের সম্মুখে স্থায়ীভাবে নদী ক্রমশ প্রশস্ত সাতটি ধাপ বিশিষ্ট উঁচু বেদী স্থাপিত আছে। ধারনা করা যায় যে, সমকালীন সময়ে নদী দুর্গের দক্ষিণ দিক দিয়ে প্রবাহিত হত বলে নদীপথ পাহারা দেওয়ার জন্যই এ ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। দুর্গ স্থাপত্যের বিচারে ক্রমশ প্রশস্ত উঁচু বেদীটি হাজীগঞ্জ দুর্গের অনন্য বৈশিষ্ট্য বলা চলে। দুর্গের অন্যান্য বাহুগুলো কিছু কম বেশী ৩.৬০ ও ৩.৬১ মিটার পরিমাপ বিশিষ্ট। বেষ্টনী প্রাচীরের অভ্যন্তরে নীচ থেকে ১.২২ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত দেয়াল সংলগ্ন সমগ্র প্রাচীরকে ঘিরে ০.৬১ মিটার প্রশস্ত বর্ধিত চলাচলের পথ রয়েছে। ধারনা করা যেতে পারে, দুর্গ অভ্যন্তরের সর্বত্র চলাচলের সুবিধার জন্যই এ প্রশস্ত পথ রাখা হয়েছিল। হাজীগঞ্জ দুর্গের

Dhaka University Institutional Repository

সমগ্র বেষ্টনী প্রাচীর ০.৯১ মিটার প্রশস্ত। বর্তমানে দুর্গে বিদ্যমান পাঁচটি বৃত্তাকৃতির বুরুজের দক্ষিণ দিকের দুটি অপেকক্ষাকৃত বৃহৎ এবং এ দুটির ব্যাস ৯.৪৪ মিটার।

চিত্র নং-৫২ হাজীগঞ্জ দুর্গের দেওয়াল

বর্তমানে দুর্গে বিদ্যমান পাঁচটি বৃত্তাকৃতির বুরুজের দক্ষিণ দিকের দুটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এবং এ দুটির ব্যাস ৯.৪৪ মিটার। অন্যগুলো অপেক্ষাকৃত ছোট ব্যাস বিশিষ্ট এবং এদের পরিমাপ প্রায় ৩.৯৫. মিটার। বর্তমানে পূর্ব বাহুর বুরুজের কোনো অস্তিত্ব নেই। প্রতিটি বুরুজে আরোহণ করার জন্য সম্মুখে ছয়টি ধাপযুক্ত সিড়ি পথ আছে। কামান স্থাপনের উদ্দেশ্যে নির্মিত এসব প্রান্ত বুরুজ যথেষ্ট উচ্চতা বিশিষ্ট। এসব প্রতিরক্ষা বুরুজ গোলা নিক্ষেপের জন্য সৃষ্ট ফোকর অবধি মাটি দিয়ে পূর্ণ করে উঁচু করা হয়েছে, যাতে সরাসরি নদীপথে অগ্রসরমান জলদস্যুদের প্রতিরোধের জন্য স্থায়ীভাবে কামান স্থাপন করে রাখা যায়। হাজীগঞ্জ দুর্গের সমগ্র বেষ্টনী প্রাচীর এবং প্রতিরক্ষা বুরুজের শিরঃভাগ নানা প্রকারের ছোট বড় ফোকরযুক্ত মারলন নকশা সংবলিত। সমগ্র দুর্গে বিভিন্ন আকৃতির বন্দুক স্থাপন অথবা তীর নিক্ষেপ এবং কামান থেকে গোলা নিক্ষেপের বৃহৎ পথ রয়েছে, যা প্রতিরক্ষা স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে একনিষ্ঠ প্রমাণ। এ দুর্গের নির্মাণ কৌশল ও

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন অঙ্গের বিন্যাসের মাধ্যমে সমকালীন বাংলায় নির্মিত স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যসমূহে চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে বলা যায়।

পূর্বকোণের পর্যবেক্ষণ বুরুজ : প্রাঙ্গণের পূর্বকোণে দন্ডায়মান দীর্ঘ একটি আয়তাকার বুরুজ রয়েছে। এটিকে পর্যবেক্ষণ বুরুজ বলে বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব ও যাদুঘর অধিদপ্তরের ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত Protected Monuments and Monnds in Bangladesh এ উল্লেখ করা হয়েছে এবং এটিকে A huge circular drum বলে অভিহিত করা হয়েছে। মূলত বুরুজটি বৃত্তাকার নয় এবং দুর্গের সমকালীন নির্মাণও নয়। বর্তমানে এ বরুজের নির্মাণ উপাদান, ইটের আকৃতি ও স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য দৃষ্টি একে পরবর্তী নির্মাণ বলে সহজেই প্রমাণযোগ্য লক্ষণ টিকে নেই। সমগ্র দুর্গ প্রাঙ্গণে এ বুরুজটিই একমাত্র ইমারত বলে পরিলক্ষিত হয়।

অলংকরন ঃ হাজীগঞ্জ দুর্গের সমগ্র বেষ্টনী প্রাচীর এবং প্রতিরক্ষা বুরুজের শিরোভাগ নানা প্রকারের ছোট বড় ফোকরযুক্ত মারলন নকশা সম্বলিত। সমগ্র দুর্গময় বিভিন্ন আকৃতির বন্দুক স্থাপন অথবা তীর নিক্ষেপ এবং কামান থেকে গোলা নিক্ষেপের বৃহৎ ফোকর রয়েছে। এ সব পর্যবেক্ষণও প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে নির্মিত ফোকারযুক্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সর্বত্র একই রকম ও নিয়মে নির্মিত না হওয়ায় দেয়ালে কখনও একসাথে তিনটি কখনও কখনও একটি আবার কখনও বা একাধিক বিভিন্ন সংখ্যার ফোকর সম্বলিত প্রাচীর পরিলক্ষিত হয় এতে কোন সমতা লক্ষ্য করা যায় না। হাজীগঞ্জ দুর্গের তোরণটির অলংকরণে মুঘল রীতির প্যানেল নকশার ব্যবহার দেখা যায়। এগুলো জানালার ফ্রেমে ও ফাসাদে বিভিন্ন ধরনের আলংকারিক খাঁজ খিলান দ্বারা সজ্জিত হয়েছে। অনুরূপ খাঁজ খিলানের নকশা সমেত প্যারাপেট অলংকরণ নারায়ণগঞ্জের বন্দর থানাধীন সোনাকান্দা দুর্গের (১৭শ শতক) ফাসাদ, ঢাকার লালবাগ দুর্গের দক্ষিণে তোরণের (১৭শ শতক) ফাসাদ এবং লালবাগ দুর্গ মসজিদের (১৬৪৯ খ্রিঃ) ফাসাদে লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া তোরণের কার্নিশে শরছিদ্র বিশিষ্ট মারলন নকশা রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

কদম রসুল ইমারত

কদম রসূল ইমারতটি কদম রসূল নামক স্থানে শীতলক্ষ্যা নদীর পূর্ব তীরে নবীগঞ্জে (বন্দর) অবস্থিত। এই কদম রসূল স্মৃতিসৌধটির ইমারত ও বারান্দা ঢাকার জমিদার গোলাম নবী ১৭৭৭ খৃ.-এ নির্মাণ করেন।[৮৫] বাহারিস্তান-ই গায়বী, গ্রন্থ হতে জানা যায় যে, বণিকেরা একটি প্রস্তরখন্ড আরব দেশ হতে এনেছিলেন এবং মাসুমখান কাবুলী বহু টাকার বিনিময়ে তা তাদের নিকট হতে ক্রয় করেন সৈয়দ মুহাম্মদ তায়ফুর বরেন যে, ১৫৮০ খৃঃ ঈসা খানের সেনাপতি মাসুম খান কাবুলী এই স্থানে কদম রসূল প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। অধিকন্তু মীর্যা নাথম এখানে একটি দুর্গ (দমদম) ছিল বলেয়া তার বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন। গোলাম নবী নির্মিত ইমারতটি বর্গাকৃতির পরবর্তীতে ১৮১০ খৃ. গোলাম নবীর মুহম্মদ নদী সামনে রাখিয়া একটি দ্বিতল জাঁকাল তোরণ নির্মাণ করেন।[৮৬]

চিত্র নং- ৫৩ কদম রসূল ইমারত-এর তোরণ পথ

বার বার সঙ্গতিহীন রং পলেস্তারা সহযোগে সংস্কারের ফলে এই স্থাপত্য নিদর্শণটির মৌলিকত্ব লুপ্ত হয়ে গেছে। এর ছোট কক্ষটি বর্গাকৃতির এক গম্বুজবিশিষ্ট এবং সম্মুখে বারান্দাযুক্ত সামনের তিনটি প্রবেশ পথ ও পার্শ্বের প্রবেশ পথগুলি খাঁজ খিলানে নির্মিত।

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টকোণাকার পার্শ্ব বুরুজ রয়েছে চারকোণায়। বারান্দার অভ্যন্তর ভাগে লক্ষ করলে দেখা যায় যে, পূর্বে উপরে চালা ছাদ ছিল। মূল বর্গাকৃতির কক্ষে প্রবেশের জন্য কালো পাথরে নির্মিত দরজা রয়েছে। কদম রসূলে কোন মিহরাবের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয় না। কক্ষের অভ্যন্তরে বেদীর উপরে একটি ধাতব পাত্রে গেলাপ পানিতে ডুবন্ত অবস্থায় কদম রসূলর পাথর খন্ডটি রাখা হয়েছে।

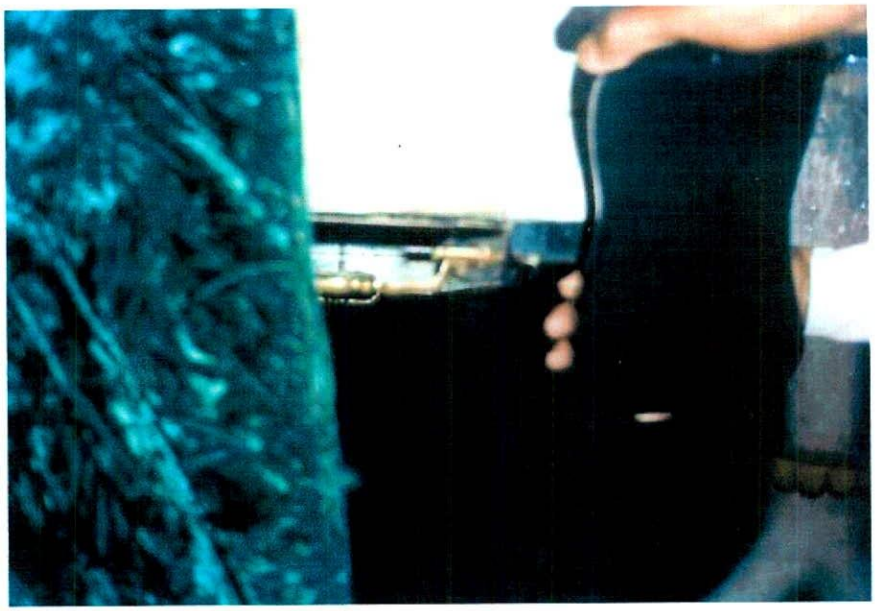

চিত্র নং- ৫৪ কদম রসুল ইমারতের রসূলের (স.) পদচিহ্ন পাথর খন্ড

কালো পাথরের উপরে অগভীর খোদাইয়ের মাধ্যমে পায়ের তলার আকৃতি উৎকীর্ণ করা হয়েছে; এই পদচিহ্ন অংকিত কালো পাথরের খন্ডটির পরিমাপ ২৪ X ১০ সেন্টিমিটার। পায়ের আকৃতিবিশিষ্ট পাথর খন্ডটির শিরোভাগে গোল গোল আঙ্গুলের ছাপ উৎকীর্ণ করা হয়েছে। কদম রসুল ইমারতটি অদ্যবধি প্রত্নতত্ব বিভাগ কর্তৃক সংরক্ষিত হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

টীকা ও তথ্য নির্দেশ

১) বাস্তব পর্যবেক্ষণ ১৭ জানুয়ারী, ২০০১

২) Hasan, A.B.M (Edited) ***Sonargoan-Panam,*** Asiatic society of Bangladesh, Dhaka, 1997, pp.63

৩) Hasan, S.A. ***Notes on the Antiquities of Dacca***, Dacca, 1904, pp. 54-55

৪) করিম, রেজাউল (সম্পাদিত), *সেনারগাঁয়ের উৎস ও উপাদান* নারায়নগঞ্জ, ১৯৯৩ পৃ. ৩৭৫

৫) ঐ পৃ. ৩৭৫

৬) যাকারিয়া, আ.কা.ম *বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ,* শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৮৪, পৃ. ৪৩৩

৭) ঐ পৃ. ৪৩৩

৮) ঐ পৃ. ২৯১

৯) ঐ পৃ. ৫৭৩

১০) Hassan, Parween. *op.cit*, p. 65

১১) যাকারিয়া, আ.কা.ম, *প্রাগুক্ত* পৃ. ৪১৯

১২) Hassan, Parween, *op.cit.* p.68

১৩) মসজিদের পরিমাপ গবেষক কর্তৃক গৃহীত

১৪) Hassan, Parween *op.cit*, p.71

১৫) বাস্তব পর্যবেক্ষণ, ১৭ জানুয়ারী, ২০০১

১৬) বাস্তব পর্যবেক্ষণ, ১৭ জানুয়ারী, ২০০১

১৭) Hassan, Parween, *op.cit.* p. 73

Dhaka University Institutional Repository

১৮) করিম, ফৌজিয়া, 'দেওয়ানবাগশাহী মসজিদের ব্যতিক্রমধর্মী বৈশিষ্ট্য, ***ইতিহাস,*** ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, তেত্রিশ বর্ষ, ১ম-৩য় সংখ্যা ১৪০৬, পৃ. ১৮-২২

১৯) চিত্র নং ৯,

২০) Blochman. H, ***Contribuytions to the History and Geogrephy of Bengal (Mahammedan Period),*** Calcuttn, 1968, pp. 77-78.

২১) যাকারিয়া, আ. কা. ম., *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২৯

২২) Hasan, Parween *op.cit,* pp.74

২৩) Cunningham, Alexander. ***Archaeological Survey of India Report of a tour in Bihan and bengal (1879-80)*** vol. xv, Delhi, 1882, pp.143

২৪) মসজিদের পরিমাপ গবেষক কর্তৃক গৃহীত

২৫) Dani, A.H. ***Muslim Architecture in Bengal,*** Daacca, Asiatic Society of Pakistan, 1961 pp. 237.

২৬) Ahmed Mostaque, Aby Sayeed. ***The Choto Sona Mosque in Gaur,*** Ph.D, thesis (pulished), Institute Fur Bangeschichte der Uniersity at kanlsruhe. Germany, 1997.pp.120.

২৭) চিত্র নং - ১৫

২৮) যাকারিয়া, আ. কা. ম. ***প্রাগুক্ত,*** পৃ. ৪১৫

২৯) চিত্র নং- ১৭

৩০) বাস্তব পর্যবেক্ষণ ১৭ জানুয়ারী, ২০০১

৩১) Hasan, Parween. ***Op.cit.*** pp. 87.

Dhaka University Institutional Repository

৩২) মসজিদের সমস্ত পরিমাপ গবেষক কর্তৃক গৃহীত

৩৩) Hasan, Parween. ***Op.cit.*** pp. 89

৩৪) বাস্তব পর্যবেক্ষণ, ৩০ মে, ২০০১

৩৫) Dani, A.H. ***Op.cit.*** pp.201

৩৬) বিবি মরিয়ম মাজারের পরিমাপ গবেষক কর্তৃক গৃহীত।

৩৭) ঐ

৩৮) Dani A.H., ***Op.cit.*** pp.201

৩৯) বাস্তব পর্যবেক্ষণ ৩০ মে, ২০০১ চিত্রনং- ২৮

৪০) Dani A.H., ***Op.cit.*** pp.200

৪১) বাস্তব পর্যবেক্ষণ ৩০ মে, ২০০১ চিত্র নং- ২৮

৪২) এ মসজিদের সমস্ত পরিমাপ গবেষক কর্তৃক গৃহীত

৪৩) বাস্তব পর্যবেক্ষণ ৩০ মে, ২০০১

৪৪) Hasan, Parween. ***Op.cit.*** pp.90

৪৫) ***Ibid,*** pp.92

৪৬) মসজিদের মাপ গবেষক কর্তৃক গৃহীত

৪৭) Begum, Aysha. ***Descriptins, Sangargoan Panam,*** Dhaka, Asiatic Society of Bengal, 1997. pp.116

৪৮) মসজিদের সমস্ত পরিমাপ গবেষক কর্তৃক গৃহীত

৪৯) Hasan, Parween. ***Op.cit.*** pp. 96

৫০) ***Ibid,*** pp. 96

৫১) চিত্র নং- ৩৫

৫২) Hasan, Parween. ***Op.cit.*** pp.84

Dhaka University Institutional Repository

৫৩) বেগম, আয়শা, *ইসলামী বিশ্বকোষ,* (সোনার গাঁ) vol. xxv. ঢাকা ইসলামী ফাউন্ডেশন, ২০০২. পৃ. ৮৪৮

৫৪) ঐ, পৃ. ৮৪৮

৫৫) খাতুন, হাবিবা 'নারায়নগঞ্জ জেলার প্রত্ন সম্পদ: সেতু' *ইতিহাস,* ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, চৌত্রিশ বর্ষ প্রথম তৃতীয় সংখ্যা ১৪০৭ সংখ্যা, ঢাকা, পৃ. ৮১

৫৬) ঐ পৃ. ৮১

৫৭) ঐ পৃ. ৮১

৫৮) Dani A.H., ***Op.cit.*** pp.227

৫৯) বাস্তব পর্যবেক্ষণ, মে ২০০২

৬০) Begum, Aysha ***Op.cit***. pp. 160-164

৬১) চিত্র নং- ২০

৬২) Siddique, Md Yusuf. ***Arabic & Persian Text of the Islamic inscriptions of Bengal,*** U.S.A. 1992, pp. 242

৬৩) Blochmann. ***JSB,*** 1873, VOL. XLI, pp. 33.p

৬৪) Khatun, Habiba. ***Sonargoan its History and Monuments*** Ph.D.Thesis (unpublished) Dhaka University, 1987. pp. 127

৬৫) খাতুন, হাবিবা, *'ঈশাখাঁঃ সমকালীন ইতিহাস'* ঢাকা, ২০০০ পৃ. ৭৫

৬৬) Hassan, S.M., ***Ancient Monuments of East. Pakistan,*** Dacca, 1997, pp.137

৬৭) যাকারিয়া, আ. কা. ম. *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৪২০

৬৮) করিম, রেজাউল (সম্পাদিত),*প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩৬৮

৬৯) ঐ পৃ. ৩৭৪

৭০) বাস্তব পর্যবেক্ষণ ৩০ মে, ২০০১

Dhaka University Institutional Repository

৭১) Islam, Sirajul. ***Lodi phaise of Indo Islamic Architecture,*** Ph.D thesis (Unpublished). University of Berlin, 1961. pp.10-60

৭২) Hasan, Parween. ***Op.cit.*** pp. 82

৭৩) যাকারিয়া, আ. কা. ম., *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৪২৯

৭৪) Dani, A. H. ***Op.cit***. pp. 226

৭৫) বাস্তব পর্যবেক্ষণ, ৩০ মে, ২০০১

৭৬) তায়েশ, রহমান আলী, *তাওয়ারীখ-ই-ঢাকা,* (খালেকদাদ চৌধুরী কর্তৃক অনূদিত), ঢাকা, ১৯৭৮. পৃ. ৬২

৭৭) Taifur, ***Glimpses of old Dacca,*** Dacca, 1656, pp. 137

৭৮) Dani A.H., ***Op.cit.*** pp. 225

৭৯) তায়েশ, রহমান আলী, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৬৩

৮০) List of the Ancient Monuments in Bengal, Revised Corrected upto the thirty first August, 1895, Calcutta, 1890, p. 107.

৮১) তায়েশ, রহমান আলী, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৬৩

৮২) বাস্তব পর্যবেক্ষণ, ৩০ মে, ২০০১

৮৩) ভূমি নকশা

৮৪) বাস্তব পর্যবেক্ষণ, ৩০ মে, ২০০১

৮৫) যাকারিয়া, আ.ক.ম., *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৪২৭

৮৬) ঐ, পৃ. ৪২৭

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

নারায়ণগঞ্জের স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য

নারায়ণগঞ্জ একটি শহরের নাম । শীতলক্ষ্যা নদীর উভয় পাড় জুড়ে এ শহরের বিস্তৃতি । শীতলক্ষ্যা তীরের এ জনপদ কত বছর আগে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল তা সঠিক করে বলা যায় না । ইতিহাসের সাক্ষ্য থেকে ধারনা করা যায় কাত্রাভু, খিজিরপুর, কদম-রসুল এবং বন্দরই ছিল মূল শহর, যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে । দক্ষিন-পূর্ব বাংলার রাজধানী সেকালের কাত্রাভু, সোনারগাঁ কালের বিবর্তনে আজ নারায়ণগঞ্জ জেলা । ১৭৬৫ খৃঃ রেনেল প্রনীত মানচিত্রে প্রথম সন্ধান মেলে এ নামের। নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ বা সুবর্ণ গ্রামকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছিল বাংলার রাজনীতি। বিক্রমপুরের বৌদ্ধ রাজাদের হাতেই কামরূপ রাজ্যের দক্ষিণ সীমানার অঞ্চল সোনারগাঁর শাসনভার ছিল । চন্দ্রপাল এবং দেব বংশ মুসলিম বিজয়ের এক শতাব্দী আগে এ অঞ্চলে কর্তৃত্ব করতেন। ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজি যখন লক্ষ্মনাবতী বিজয় করেছিলেন তখন রাজা লক্ষণসেন এসে আশ্রয় নিলেন বিক্রমপুরে। ১২৮১ খৃঃ পর্যন্ত সেন রাজারা তাদের রাজত্ব করেন সোনারগাঁকে রাজধানী করে। মুসলিম সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন সোনারগাঁ অধিকার করেন ১২৮১ খৃঃ এখানে প্রতিষ্ঠা করেন দক্ষিন-পূর্ব বাংলার রাজধানী। এরপর সোনারগাঁ তথা নারায়নগঞ্জ জেলা প্রয় দুই শতাব্দীর দক্ষিন-পূর্ব বাংলার রাজধানী হিসেবে বিশ্বের মানচিত্রে প্রতিষ্ঠিত ছিল। আলাউদ্দিন খলজি রাজ্য শাসনের সুবিধার জন্য বাংলাকে দুভাগ করে বাংলার রাজধানী করেছিলেন সোনারগাঁয়। ১৩৩৮ খৃঃ ফখরুদ্দিন সোনারগাঁর স্বাধীনতা ঘোষনা করে সুলতান মোবারক শাহ উপাধি নিয়ে শাসন শুরু করেছিলেন। সুন্দর যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্যে তিনি সোনারগাঁ থেকে চাঁদপুরের শ্রীপুর হয়ে চট্রগ্রামের সঙ্গে সংযোগ সড়ক নির্মাণ করেছিলেন। রাজপথের পার্শ্বে নির্মাণ করেছিলেন বিভিন্ন স্থাপত্য ইমারত। মুবারকশাহ যখন সোনারগাঁয়ের সিংহাসনে

Dhaka University Institutional Repository

উপবিষ্ট তখন গৌড়ের অধিপতি ছিলেন সুলতান আলাউদ্দীন আলী শাহ। ১৩৪২ খৃঃ শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ আলাউদ্দীনকে হত্যা করে সিংহাসন দখল করেন এবং ক্রমশ স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে সমগ্র বাংলায় ইলিয়াস শাহী নামে এক স্বাধীন রাজবংশ কায়েম করেন।[১] এরপর থেকে ১৫৩৮ খৃঃ অবধি বাংলার স্বাধীনতা অক্ষুন্ন থাকে। এই সময়ে গড়ে উঠে বাংলার স্থাপত্যকলার এক নতুন ধারা যা ভারত উপমহাদেশের অপরাপর আঞ্চলিক ও প্রাদেশিক শিল্পরীতির তুলনায় ব্যতিক্রমধর্মী ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এই সময়ে আরব, পারস্য এবং মধ্যপ্রাচ্যের আরও অন্যান্য অঞ্চল হয়ে বহু সুফী-সাধক, সেনাপতি, স্থপতি, কারিগর বাংলাদেশে আগমন করেন। ফলে বিদেশী, উত্তর ভারতীয় এবং এই দেশীয় ভাবধারার সংমিশ্রনে সুলতানী বাংলার স্থাপত্যকলা স্বতন্ত্ররূপ লাভ করে।[২] সুদীর্ঘ ২০০ বৎসরের সুলতানী শাসনামলে প্রথম ইলিয়াসশাহী বংশ (১৩৩৮-১৪১৪ খ্রীঃ) রাজা গনেশের বংশ (১৪১৪-১৪৪২ খ্রীঃ) পরবর্তী ইলিয়াসশাহী বংশ (১৪৪২-১৪৮৬ খ্রীঃ) হাবসী বংশ (১৪৮৬-১৪৯৩ খ্রীঃ) হুসেনশাহী বংশ (১৪৯৩-১৫৩৮ খ্রীঃ) এই পাঁচটি রাজবংশ পর্যায়ক্রমে শাসন করলেও তাদের সময়ে এই অঞ্চলের স্থাপত্যকলার সামান্য উপকরনগত পার্থক্য ছাড়া একই পদ্ধতি ও রীতিতে গড়ে উঠে বা বিকাশ লাভ করে । তবে বলা যায় ইলিয়াসশাহী আমলে বাংলা স্থাপত্য উন্নতির শিখরে আরোহন করেছিল , হুসেনশাহী আমলে সেই স্থাপত্যধারা আরোও গতি সঞ্চারিত হয়ে বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এসময় আসাম ও বিহারে ও তৈরি হয়েছিল অসংখ্য মসজিদ, মাদ্রাসা, জলাশয়, সরাইখানা, মাজার, দুর্গ, রাস্তা, পুল, প্রাসাদ প্রভৃতি। এইসব স্থাপত্য ইমারতসমূহ ইলিয়াসশাহী আমলে ইট ও পাথর দ্বারা নির্মিত হয়েছে। হুসেনশাহী আমলে প্রধানত দু'টি পদ্ধতির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় । (১) ইট পদ্ধতিতে এবং (২) ইট ও পাথরের স্লাব সহযোগে।[৩] উপকরনগত কৌশলের পার্থক্য থাকলেও উভয়ই প্রায় একই রীতিতে নির্মিত । ইট পদ্ধতিতে নির্মিত খুব কম সংখ্যক ইমারতে পাথরের স্তম্ভ ব্যবহৃত হয়েছে । হুসেনশাহী আমলে ইট ও পাথরের খোদাইকৃত স্লাব সহযোগে ইমারত নির্মাণরীতি পুনঃজীবন লাভ করলেও এই যুগের শেষের দিকে এই

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পের বা রীতির কিছুটা অবনতি দেখা দিয়েছিল । এই অবনতির সূত্র ধরেই নারায়ণগঞ্জে মুঘল স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে ।

স্থাপত্য বিকাশের মূলে রয়েছে ধারাবাহিকতা। পূর্ববর্তী যুগের রোমানেস্ক ছাড়া যেমন গথিক, রোমান স্থাপত্য ছাড়া রিনেসা স্থাপত্য কল্পনা করা যায়না ঠিক তেমনি হিন্দু স্থাপত্য ও ইসলামী স্থাপত্য ব্যতিরেকে বাংলার মুসলিম স্থাপত্য চিন্তা করা যায়না। আর তেমনি বাংলায় তথা নারায়ণগঞ্জে বিভিন্ন রাজবংশের পরিবর্তনের সাথে সাথে স্থাপত্যের রীতি ও কৌশলগত কিছু বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় । নিম্নে নারায়ণগঞ্জের সুলতানী ও মুঘল আমলের স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হলো ঃ-

(১)নারায়ণগঞ্জের স্থাপত্য ইমারত সমূহে নির্মাণ উপকরণ হিসাবে বেশীরভাগ ইট এবং কিছু পাথরের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় । পাথরের ব্যবহার শুধুমাত্র মসজিদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশে ব্যবহার করা হতো যেমন মসজিদের মিহরাবে, দরজায়, লিনটেলে, প্যারাপেটে ইত্যাদি স্থানে । পান্ডুয়ার একলাখী সমাধি বাংলার ইট নির্মিত ইমারতের সর্বপ্রথম উদাহরন হিসাবে পরিগনিত । সেই থেকেই বাংলায় ইট দ্বারা ইমারত নির্মাণ সাধারণ রীতি হিসাবে পরিগনিত হয়েছে । সুলতানী আমলে বেশীরভাগ মসজিদ স্থাপত্য ইট দ্বারা নির্মিত । সুলতানী আমলের এই সকল ইট নির্মিত মসজিদের স্থায়িত্ব কম নয়, এর প্রমাণ স্বরূপ অসংখ্য ইমারত এখনও কীর্তি বহন করছে সোনারগাঁয়ের গোয়ালদি মসজিদ, ফতেহ শাহের মসজিদ, দিওয়ানবাগের মসজিদ ইত্যাদিতে । শুধু বাংলাদেশেই নয় ভারত উপমহাদেশে মুলতান, গুজরাটের ঢোলকা এবং দাক্ষিণাত্যের বিদর ও গুলবার্গায় কতিপয় ইটের তৈরী মসজিদ , মাদ্রাসা ও মাজার দেখা যায়।[৪] কিন্তু একমাত্র বাংলাদেশেই ইটের ব্যবহার সার্বজনীনতা লাভ করেছে । ইট পদ্ধতিতে ইমারত নির্মাণ সুলতানী বাংলার স্থাপত্যকলার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যে পরিনত হয়েছে । বর্তমানকালের ন্যায় প্রাচীন কালেও বাংলার মন্দির স্থাপত্যের প্রথম ও প্রধান উপকরণ ছিল ইট এবং দ্বিতীয় স্থানে ছিল প্রস্তর।[৫] ইট দ্বারা নির্মিত এই সব নারায়ণগঞ্জের স্থাপত্যের গাথুনীতে জোড়ক হিসাবে চুন সুরকীর মসলা

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবহার করা হয়েছে। সুলতানী আমলে নির্মিত বাংলাদেশের প্রতিটি মসজিদে জোড়ক মসলা হিসাবে চুন সুরকীর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় যেমনঃ ষাট গম্বুজ মসজিদ (বাগেরহাট), ছোট সোনা মসজিদ (গৌড়), দরসবাড়ী মসজিদ (গৌড়), গোয়ালদী মসজিদ (সোনারগাঁ), মুয়াজ্জেমপুর মসজিদ (সোনারগাঁ) ইত্যাদি । কোন ইমারতে জোড়ক মসলা হিসাবে চুন সুরকীর ব্যবহার সম্ভবত সুলতানী বাংলার মুসলিম স্থাপত্যে প্রথম শুরু হয় । বৌদ্ধ যুগে ইটের গাথুনীতে জোড়ক মসলা (mortar) হিসেবে কাদার ব্যবহার হত।[৬] উদাহরন স্বরূপ প্রত্নতাত্ত্বিক খননে আবিস্কৃত পাল যুগের নওগাঁ জেলার পাহাড় পুরের বৌদ্ধ বিহারের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে । হিন্দু স্থপতিগণ জোড়ক মসলা হিসাবে চুনের ব্যবহার না জানলেও মুসলিম পূর্ব যুগে ইমারতের মেঝে কংক্রিটের, চুনের ব্যবহার করত, মহাস্থানগড়ের প্রত্নতাত্ত্বিক খননে এর সাক্ষ্য মিলে।[৭] তবে প্রাচীন বাংলার ইমারত নির্মাণে শক্তিশালী কোন জোড়ক মসলার প্রয়োজন ছিল বলে মনে হয় না, কেননা সে সময়ে বৃহৎ এবং চওড়া ইট কিংবা প্রস্তরকে একটির উপর আরেকটি সাজিয়ে ইমারত নির্মাণ করা হত । ফলে ইমারতের সম্পূর্ণভার খাড়াভাবে ভূমির উপর পড়ত । এই জন্য প্রাচীন কালে ইমারত নির্মাণের জন্য ব্যবহৃত ইট কিংবা প্রস্তরখন্ড চওড়া ও বৃহদাকারে তৈরী হত । সুতারাং কাদার পরিবর্তে জোড়ক মসলা হিসাবে চুন সুরকীর আবিষ্কারের ফলে সুলতানী আমলের স্থাপত্য ইমারত সমূহে ইটের প্রাচীরের পুরুত্ব পূর্বের তুলনায় কম হয়েছে । নারায়ণগঞ্জের বিদ্যমান ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থাপত্য ইমারতসমূহ তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত । স্থাপত্য ইমারত সমূহের নির্মাণগত বৈশিষ্টের উপর ভিত্তি করে মুসলিম বাংলার ইমারত সমূহকে (বিশেষ করে মসজিদ স্থাপত্যকে) তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় যথা ঃ (ক) আয়তাকার পরিকল্পনা, মধ্যস্থিত নেভ (nave) কিবলা সমান্তরাল খিলান পথে নলাকৃতি খিলান ছাদ এবং তার উভয় পার্শ্বে বহু গম্বুজ বিশিষ্ট ইমারত, (খ) আয়তাকৃতির বহু গম্বুজ বিশিষ্ট ইমারত ও (গ) বর্গাকৃতির এক গম্বুজ বিশিষ্ট ইমারত। নারায়ণগঞ্জের বিদ্যমান মসজিদসমূহ বহু গম্বুজবিশিষ্ট আয়তাকার

Dhaka University Institutional Repository

ইমারত, এক গম্বুজ বিশিষ্ট বর্গাকৃতি ইমারত এবং বারান্দা বিশিষ্ট এক গম্বুজ এই তিনটি বিভাগের অর্ন্তগত ।

নারায়ণগঞ্জের মুয়াজ্জেমপুর মসজিদ, হাজীগঞ্জের মসজিদ, বাবা সালেহ মসজিদ প্রভৃতি বহুগম্বুজ বিশিষ্ট আয়তাকার মসজিদ । বাংলায় বহু গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ নির্মাণ রীতি সম্ভবত ত্রিবেণীর জাফর খান গাজীর মসজিদ হতে অনুসৃত হয়েছিল। তবে প্রকৃতপক্ষে উক্ত রীতি পারস্যের গজনভী ও সেলজুক স্থাপত্য হতেই অনুসৃত হয়েছে বলে মনে হয় । বাংলার অধিকাংশ মসজিদ এই নির্মাণ পরিকল্পনার অর্ন্তগত । সাধারণত মসজিদের মধ্যস্থিত কিবলা সমান্তরাল খিলান পথের বিশেষ প্রক্রিয়া দূরীকরনের ফলে এই নির্মাণ পরিকল্পনা উদ্ভুত হয়েছে। এই পরিকল্পনায় জুল্লাহর আয়তাকার পরিকল্পনা দুই পার্শ্ব বাহু একটি মধ্যবর্তী অংশে বিভক্ত না হয়ে একটি একক অখন্ড আয়তাকার রূপ ধারণ করেছে।[৮] ইহা একাধিক আইল (উত্তর হতে দক্ষিণে ধাবমান খিলান পথ) ও নেভে (পূর্ব হতে পশ্চিমে ধাবমান খিলান পথে) বিভক্ত এবং বহু গম্বুজ বিশিষ্ট ছাদ দ্বারা আচ্ছাদিত যেমনঃ বাকের গঞ্জের কসবা মসজিদ , মুয়াজ্জেমপুর মসজিদ , হাজীগঞ্জের মসজিদ (নারায়ণগঞ্জ) রামপাল বাবা আদমের মসজিদ , শৈলকুপা মসজিদ , রাজশাহীর কুসুম্বা মসজিদ প্রভৃতি দুই আইল এবং তিন 'বে' বিশিষ্ট আয়তাকৃতির মসজিদ। গৌড়ের তাঁতী পাড়া মসজিদ, ছোট সোনা মসজিদ, পাবনার শাহজাদপুর মসজিদ, দিনাজপুরের হেমতাবাদ মসজিদ, ত্রিবেনীর জাফরখান গাজীর মসজিদ, রাজশাহীর বাঘা মসজিদ প্রভৃতি পাঁচ 'বে' বিশিষ্ট আয়তাকার মসজিদ । তবে সাত 'বে' বিশিষ্ট আয়তাকার মসজিদ সম্ভবত বাংলাদেশের মুসলিম স্থাপত্যের ইতিহাসে সাতগাছিয়া আদিনা জামে মসজিদ এবং মনোহর মসজিদই প্রথম।

নারায়ণগঞ্জের বন্দরশাহী মসজিদ , ফতেহ্ শাহের মসজিদ, ইউসুফ গঞ্জের মসজিদ, গোয়ালদি মসজিদ, দোলারদি মসজিদ, দরিকান্দি মসজিদ প্রভৃতি বর্গাকৃতি এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ । এখানকার অনেক মসজিদেই বর্তমানে বারান্দা নির্মাণ করা হয়েছে কিন্তু

Dhaka University Institutional Repository

পূর্বে এই মসজিদগুলো এক গম্বুজ বিশিষ্ট বর্গাকৃতি মসজিদই ছিল। বর্গাকৃতি এক গম্বুজ মসজিদ রীতিটি সম্ভবত সাসানীয় অগ্নিমন্দির চাহারতাক হতে অনুসৃত হয়।[৯] পারস্যে গজনভী , কারাখানিদ ও সেজলুক স্থাপত্যে ও উক্ত রীতির প্রতিফলন ঘটে । আব্বাসীয় আমলে বোখারার হাজরা মসজিদ সম্ভবত উক্ত রীতিতে নির্মিত মসজিদ স্থাপত্যের প্রথম উদাহরণ । প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলায় সুলতানী স্থাপত্যে এই রূপ এক গম্বুজ বিশিষ্ট বর্গাকৃতির পরিকল্পনা সমাধি সৌধে পরিলক্ষিত হয় যেমন ঃ হযরত পান্ডুয়ার এক লাখী সমাধি । ইহা বাংলার মুসলিম স্থাপত্যের প্রথম বর্গাকৃতির ইমারত । ক্রমে ক্রমে বাংলার মসজিদ স্থাপত্যে এই পরিকল্পনা ব্যাপকতা লাভ করেছে । উক্ত পরিকল্পনায় নির্মিত নারায়ণগঞ্জের মসজিদ সমূহের পূর্বে এই দেশে আরও অনেক স্থাপত্য নিদর্শনের উল্লেখ পাওয়া যায় যেমন ঃ ঢাকার বিনত বিবি মসজিদ, বাগেরহাটের উলুখ খানজাহানের সমাধি সংলগ্ন মসজিদ, সিঙড়া মসজিদ, চুনাখোলা মসজিদ, বিবি বেগিনীর মসজিদ, রনবিজয়পুর মসজিদ, দেবী কোট রুকনখানের মসজিদ, পাবনার নবগ্রাম মসজিদ ইত্যাদি । ইহা ছাড়া মুঘল আমলে বাংলাদেশে এক গম্বুজ বিশিষ্ট বর্গাকৃতির বহু মসজিদ নির্মিত হয়েছে যেমনঃ কুমিল্লার বড় গোয়ালী মসজিদ, অষ্টগ্রাম কুতব শাহের মসজিদ, এগার সিন্ধুর সাদীর মসজিদ, ময়মনসিংহের মসজিদ পাড়া মসজিদ, গুড়াই মসজিদ , টাঙ্গাইলের আতিয়া মসজিদ, ঢাকার আল্লাকুরীর মসজিদ ইত্যাদি ।

নারায়ণগঞ্জে বিদ্যমান বারান্দা বিশিষ্ট এক গম্বুজ বর্গাকৃতির মসজিদ বর্তমানে একটিই পরিলক্ষিত হয় যা কিনা পাঁচ পীরের সমাধি সংলগ্ন মুঘল আমলের মসজিদ। এ ছাড়া দেওয়ানবাগের শাহী জামে মসজিদটি পূর্বে বারান্দা বিশিষ্ট এক গম্বুজ বর্গাকৃতির মসজিদ ছিল বলে মনে করা হয়। উক্ত রীতি সম্ভবত সেলজুক স্থাপত্য হতে অনুসৃত। সুলতানী বাংলার স্থাপত্যের ইতিহাসে এই রীতির মসজিদ বেশী পরিলক্ষিত হলেও পরবর্তী মুঘল আমলেও তুলনামূলকভাবে কম অনুরূপ মসজিদ নির্মিত হয়েছে। সুলতানী বাংলায় এই রীতির মসজিদ যেমন ঃ দিনাজপুরের গোপালগঞ্জ মসজিদ, গৌড়ের চামকাঠি মসজিদ ,

Dhaka University Institutional Repository

লোটন মসজিদ, দিনাজপুরের সুরা মসজিদ ইত্যাদি। তবে সুলতানী বাংলা স্থাপত্যে সম্ভবত দিনাজপুরের গোপালগঞ্জ মসজিদে সর্বপ্রথম পূর্ব দিকে বারান্দা স্থাপিত হয়। এই রীতির মুঘল আমলের মসজিদ যেমন ঃ টাঙ্গাইলের আতিয়া মসজিদ।

নারায়ণগঞ্জে অবস্থিত মসজিদ স্থাপত্যের মধ্যে ফতেহ শাহ মসজিদ, গোয়ালদী মসজিদ, ইউসুফগঞ্জের মসজিদ ইত্যাদি ইমারতসমূহে ঢালু ছাদ বা বক্র কার্ণিশ বিদ্যমান। ইহা বাংলার সুলতানী স্থাপত্যের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।[১০] বাংলার প্রচলিত বাঁশের বেড়ার ঘরের পরিকল্পনা হতে সম্ভবত ধনুক বক্র ছাদের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে।[১১] বাংলার সুলতানী স্থাপত্য ইমারতগুলির মধ্যে জালালউদ্দীন মুহম্মদ শাহের এক লাখী সমাধিতে সম্ভবত সর্বপ্রথম বক্র ছাদ কার্নিশের সূচনা হয়। বাগের হাটের ষাট গম্বুজ মসজিদ, ছোট সোনা মসজিদ, আতিয়া মসজিদ, রামপালের বাবা আদমের মসজিদ প্রভৃতিসহ বাংলাদেশের অসংখ্য মসজিদে এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশের এই সকল স্থাপত্যে যে ঢালু ছাদের পরিচয় মিলে তাহা স্থানীয় স্থপতিদেরই অবদান। মুঘল আমলে ছাদের কার্নিশ আনুভূমিক (সমতল) আকার ধারণ করে । তবে মুঘল আমলের প্রথম দিকে কিছু কিছু ধনুক বক্র কার্নিশের নমুনা পাওয়া যায় যেমনঃ বগুড়ার শেরপুরে মুরাদ খান কাকশাল কর্তৃক নির্মিত খেরুয়া মসজিদ এবং পরবর্তীতে নির্মিত টাঙ্গাইলের আতিয়া মসজিদ, এগার সিন্ধুর সাদীর মসজিদে বক্রাকারে কার্নিশ বা ঢালু ছাদের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

কয়েকটি মসজিদ ব্যতীত নারায়ণগঞ্জের প্রায় সকল মসজিদের বুরুজ অষ্টকোনাকার যেমন ঃ মুয়াজ্জমপুর মসজিদ, বন্দর শাহী মসজিদ, দেওয়ানবাগ জামে মসজিদ, বিবি মরিয়মের মসজিদ, হাজী গঞ্জ মসজিদ, পাঁচ পীরের মসজিদ, দরিকান্দি মসজিদ, বাড়ী মজলিশ মসজিদ ইত্যাদি। সুলতানী আমলে স্থাপত্য ইমারতে বিশেষ করে মসজিদের কোণে ব্যবহৃত অষ্টকোণ বুরুজগুলির উচ্চতা ছাদের উপরে বর্ধিত হয়নি। বাংলার মুসলিম স্থাপত্যে সম্ভবত সর্বপ্রথম একলাখী সমাধিতে অষ্টকোণাকৃতির বুরুজ পরিলক্ষিত হয়। একলাখী সমাধির বুরুজের ধারনা তুগলক স্থাপত্য হইতে অনুসৃত।[১২] তবে তুগলক স্থাপত্যের ও

Dhaka University Institutional Repository

বুরুজের সাথে গঠনগত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। তুগলক আমলের বুরুজ গোলাকার এবং উপর দিকে ক্রমশ সুরু এবং অলংকরণ বিহীন। তবে অষ্টকোণাকৃতির বুরুজগুলি ক্রমশ সরু ছিল না । সুলতানী আমলে নির্মিত বাগেরহাটের খানজাহানী রীতির মসজিদ গুলির বুরুজ গোলাকার যেমন ঃ ষাট গম্বুজ মসজিদ, খান জাহানের সমাধি সংলগ্ন মসজিদ, রনবিজয়পুর মসজিদ ইত্যাদি । এছাড়া বাংলাদেশে নির্মিত সুলতানী আমলের বেশীরভাগ মসজিদে অষ্টকোণাকার বুরুজ লক্ষ্য করা যায় যেমন ঃ ঢাকার বিনত বিবি মসজিদ, দিনাজপুরের গোপালগঞ্জ মসজিদ, গৌড়ের ছোট সোনা মসজিদ, দরাসবাড়ী মসজিদ ইত্যাদি। সুলতানী আমলের এই অষ্টকোণাকার বুরুজ মুঘল আমলের মসজিদ সমূহে অনুসৃত হয়েছে। মুঘল আমলের মসজিদের বুরুজ ছাদ হইতে কিছুটা উপরে উত্থিত হয়েছে । খিলান মিহরাব মসজিদ স্থাপত্যের একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য নারায়ণগঞ্জের প্রায় সকল মসজিদ সমূহের কিবলা প্রাচীরের পূর্বদিকের প্রবেশ পথের সমসংখ্যক মিহরাব নির্মিত হয়েছে । প্রবেশ পথের সমসংখ্যক মিহরাব নির্মাণ বাংলার সুলতানী মসজিদ স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত। মিহরাবগুলি অর্ধবৃত্তাকৃতির এবং অবতল। অবতল মিহরাবের ধারনা সম্ভবত প্রাক মুসলিম আমলে সিরিয়ায় নির্মিত খৃষ্টান গীর্জার এ্যাপ্স হতে অনুসৃত হয় । বাংলার মসজিদ স্থাপত্যে এর প্রচুর উদাহরণ লক্ষ্য করা যায় যেমনঃ দরসবাড়ী মসজিদ, ছোট সোনা মসজিদ, তাঁতীপাড়া মসজিদ ও ষাট গম্বুজ মসজিদ ইত্যাদি । নারায়ণগঞ্জের মসজিদসমূহের মিহরাবগুলি কিছু কালো পাথরের এবং কিছু ইটের তৈরী। পাথরের মিহরাবগুলি প্যানেল করা এবং ইটের মিহরাব গুলি অবতলাকার।

নারায়ণগঞ্জে অবস্থিত মসজিদ সমূহের স্তম্ভ সাধারণত ইটের তৈরী এবং চতুষ্কোণাকৃতির । চতুষ্কোণাকার ইট নির্মিত স্তম্ভ সুলতানী বাংলার মসজিদ স্থাপত্যে বহুলভাবে পরিলক্ষিত হয় । যেমন ঃ ষাট গম্বুজ মসজিদ (বাগেরহাট), আদিনা মসজিদ (হযরত পান্ডুয়া), দরাসবাড়ী মসজিদ (গৌড়), নয় গম্বুজ মসজিদ (বাগেরহাট) ইত্যাদি ।

Dhaka University Institutional Repository

এই ধরনের ইটের তৈরী চতুষ্কোণাকার স্তম্ভ আব্বাসীয় স্থাপত্য কৌশল বলা যায়।[১৩] নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ের গোয়ালদী মসজিদে গোলায়িত এবং ইটের তৈরী স্তম্ভ নির্মিত হয়েছে ।

বাংলাদেশের মসজিদসমূহ সাধারণত দুই ধরনের ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত । যথা (ক) খোলা চত্বর বিশিষ্ট (courtyard type) এবং (খ) সম্পূর্ণ ছাদ ঘেরা (covered type) ছোট আকারের । নারায়ণগঞ্জে অবশ্য প্রথমটি অপেক্ষা দ্বিতীয়টি বেশী প্রাধান্য পেয়েছে । নারায়ণগঞ্জ নদী বেষ্টিত এবং অধিক বৃষ্টিপাত হওয়ার কারণে সম্ভবত মসজিদ গুলিতে ছাদঘেরা এবং আকারে ছোট পরিকল্পনা প্রাধান্য পেয়েছে ।

বাংলাদেশের দো-চালা কুঁড়ে ঘরের ছাদের অনুকরণে ইট বা পাথর নির্মিত ছাদ তৈরী করার মধ্যে বাংলার নিজস্ব স্থাপত্য কীর্তির সুস্পষ্ট নিদর্শন ফুটে উঠেছে । গৌড়ের ফতেহ্ খানের সমাধি সৌধে এরূপ দো-চালা ছাদ পরিদৃষ্ট হয় । এটাই হল সত্যিকার স্থাপত্য দো-চালা ছাদের প্রাচীনতম জীবন্ত দৃষ্টান্ত যা পরবর্তীকালে বাংলাদেশের ভিতরে ও বাহিরে রাজকীয় মুঘল স্থাপত্য শিল্পে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল তার প্রমাণ স্বরূপ সোনারগাঁয়ে পাঁচ পীরের মাজারের চেরাগ দানীর দো-চালা ছাদ এবং ঔপনিবেশিক আমলের পানাম নগরে একটি বিল্ডিং এ দো-চালা ছাদ পরিলক্ষিত হয় ।

বাংলাদেশে চৌ-চালা বিশিষ্ট কুঁড়েঘরের লোকপ্রিয়তা সর্বজনবিদিত । গৌড়ের এই স্থাপত্যিক কৌশলটি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধ হতে অষ্টাদশ শতাব্দী ব্যাপী বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদ স্থাপত্যের উপর চাঞ্চল্যকর প্রভাব বিস্তার করেছিল। বাংলাদেশে অতিক্রম করে এই চৌ-চালা ছাদ সপ্তদশ শতাব্দীতে মুঘলদের আগ্রা দুর্গে স্থান করে নিয়েছিল। নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ের ইব্রাহিম দানেশ মন্দ, শেখ মোহাম্মদ ইউসুফ এবং তাঁর স্ত্রী মতান্তরে ছেলের সমাধি চৌ-চালা ছাদ দ্বারা আচ্ছাদিত।

নারায়ণগঞ্জের মসজিদ স্থাপতে খুব কম পরিমানে মিনার দেখা যায়। কয়েকটি মসজিদে মিনারের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। যেমন- মুয়াজ্জেমাপুর মসজিদ, বিবি মরিয়ম

Dhaka University Institutional Repository

মসজিদ ও আব্দুল হামিদের মসজিদ ইত্যাদি। বেশির ভাগ সুলতানি আমলের মসজিদেই মিনার দেখা যায়। মুঘল আমলে খুব কম পরিমানই লক্ষ্য করা যায়। কেননা মুঘল আমলের মসজিদ গুলো সাধারনত উচু ভূমির উপর নির্মিত যার জন্য মিনারের প্রয়োজন তেমন হয়নি।

নারায়ণগঞ্জের মসজিদের পূর্বদিকে ও মাঝে মাঝে দক্ষিণ দিকে পুকুর পরিলক্ষিত হয়। পূর্ব দিকের পুকুর মুসল্লিদের অযু করার ব্যবস্থা এবং মসজিদের শোভা বর্ধন করত। দক্ষিণ দিকের পুকুর মসজিদের ভিতরে আলো বাতাস প্রবেশের জন্য ব্যবহার করা হত। সুলতানী ও মুঘল আমলের স্থাপত্য রীতি ও কৌশলের অনুকরণে নারায়ণগঞ্জের স্থাপত্য ইমারত গড়ে উঠেছে । অলংকরণের ক্ষেত্রে ও অনুরূপ রীতি , কৌশল বা উপাদান অনুসৃত হয়েছে । উল্লেখ্য যে, সুলতানী আমলে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অসাধারণ ও সূক্ষ্ম অলংকরণ প্রধানত তিনভাবে প্রকাশ পেয়েছে (ক) পোড়ামাটির (টেরাকোটা) নকশা (খ) মিনা করা টালী ও (গ) পাথরে খোদাই নকশা এবং মুঘল আমলে পলেস্তরা অলংকরণ বহুল প্রচলিত ছিল । নারায়ণগঞ্জের পোড়া মাটির এবং পাথরে খোদাই নকশা দুটিই পরিলক্ষিত হয় । সুলতানী আমলের ইমারত বিশেষ করে পোড়ামাটির নকশা (টেরাকোটা নকশা) দ্বারা অলংকৃত হয়েছে। স্থাপত্য অলংকরণের ক্ষেত্রে মুসলিমরা বাংলার প্রাচীন ঐতিহ্য পোড়ামাটির ফলক অলংকরণকে দূরে রাখতে পারে নি । মুঘলদের প্রচলিত পলেস্তরা অলংকরণের পূর্ব পর্যন্ত বাংলার বহু ইমারতে এই নকশাকৃত পোড়ামাটির ফলক ইমারত গাত্র অলংকরণের প্রধান উপকরন হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে যেমনঃ মুয়াজ্জমপুর মসজিদ, গোয়ালদী মসজিদের গাত্র টেরাকোটা নকশা দ্বারা অলংকৃত। এছাড়া বাংলাদেশের অনেক মসজিদেই এই নকশা পরিলক্ষিত হয় যেমনঃ পান্ডুয়ার মসজিদ, আদিনা মসজিদ, দরাসবাড়ী মসজিদ, বাঘা মসজিদ ইত্যাদি । পোড়ামাটির ফলকে নকশার ব্যবহার এই দেশে বহু পূর্ব হতে শুরু হয়েছে যেমন ঃ পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারের অলংকরণ। তবে মুসলিম কারিগরগন অলংকরণের বিষয়বস্তুতে পরিবর্তন এনে জীবন্ত প্রতীক ও ভাষ্কর্যের স্থলে বিমূর্ত প্রতীক

Dhaka University Institutional Repository

যেমনঃ পেঁচানো লতাপাতা , লিপিকলা ও জ্যামিতিক নকশার প্রচলন করেছে। তাছাড়া মুসলিম কারিগরদের হাতে এই দেশের পোড়ামাটির নকশাকলার আড়ষ্টতা দূরীভূত হয়ে বিশেষ সূক্ষ্মতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে । নারায়ণগঞ্জের মসজিদসমূহে মুসলিম কারিগরদের দ্বারা রোজেট, পামেট বা পত্র, ঝুলন্ত শিকল, বন্ধ মারলন, বরফী , লতানো ফুল, প্যানেল বদ্ধ চূড়া প্রভৃতি বিষয়বস্তু অলংকরণ হিসেবে স্থান পেয়েছে। পাথরের খোদাই নকশা নারায়ণগঞ্জের গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের নির্মিত সমাধি গাত্রে এবং গোয়ালদি মসজিদ, মুয়াজ্জমপুর মসজিদ, দেওয়ান বাগের মসজিদ, ফতেহ শাহ মসজিদের মিহরাবে পরিলক্ষিত হয়। পাথরের অপ্রতুলতার জন্য এখানকার মসজিদের মিহরাব গুলিতে পাথরের খোদাই নকশা থাকলেও অন্য কোন স্থানে এ নকশা পরিলক্ষিত হয় না।

নারায়ণগঞ্জে অবস্থিত সকল মুঘল আমলের মসজিদের দেয়ালই পলেস্তরা করা যেমনঃ বিবি মরিয়মের মসজিদ, হাজী গঞ্জের মসজিদ, আব্দুল হামিদের মসজিদ, গরীবুল্লাহর মসজিদ, পাঁচ পীরের মসজিদ ইত্যাদি । এছাড়াও সুলতানী আমলের মসজিদ পরবর্তীতে সংস্কার করার ফলে দেওয়ালে পলেস্তরা নকশা ব্যবহার করা হয়েছে যেমনঃ দেওয়ান বাগের মসজিদ, মুয়াজ্জমপুর মসজিদ, ইউসুফগঞ্জের মসজিদ ইত্যাদি ।

রোজেট নকশা সুলতানী স্থাপত্য অলংকরণের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়বস্তু। নারায়ণগঞ্জের গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ নির্মিত সমাধির গাত্রে, গোয়ালদী মসজিদের দেয়ালে, মুয়াজ্জমপুর মসজিদের দেয়াল গাত্রে, মিহরাবে রোজেট নকশা দৃষ্ট হয় । সুলতানী আমলের অনেক মসজিদে অনুরূপ নকশা স্থান পেয়েছে যেমনঃ দরাসবাড়ী মসজিদের কেন্দ্রীয় মিহরাবের ত্রিকোণাকার ভূমিতে, বাবা আদমের মসজিদের মিহরাবের পার্শ্বের দেওয়ালে , ফিরোজপুরের ছোট সোনা মসজিদের মিহরাবে রোজেট নকশা ব্যবহৃত হয়েছে । মুঘল আমলের মসজিদ স্থাপত্য ইমারত সমূহে টেরাকোটা অলংকরণ প্রাধান্য না পেলেও মুঘল আমলে বাংলাদেশে নির্মিত অনেক মন্দিরে রোজেট নকশা সম্বলিত টেরাকোটা অলংকরণ দেখা যায় যেমন ঃ দিনাজপুরের কান্তজীর মন্দির, পুঠিয়ার (রাজশাহী) পঞ্চরত্ন, বড় গোবিন্দ

Dhaka University Institutional Repository

ও চৌচালা ছোট গোবিন্দ মন্দিরের বহির্গাত্রে লতানো ফুলের স্ক্রল নকশা নারায়ণগঞ্জের মসজিদ স্থাপত্যসমূহ অলংকরণে ব্যাপক ব্যবহার ঘটেছে। বিবি মরিয়মের মসজিদের মিহরাবের আয়তাকৃতি প্যানেলের চারিদিকে, দেওয়ানবাগ মসজিদের মিহরাবের আয়তাকৃতি প্যানেলের উপরের দিকে লতানো ফুলের স্ক্রল নকশা রয়েছে। সুলতানী আমলের অনেক স্থাপত্য ইমারতের অলংকরণে লতানো ফুলের নকশা দেখা যায় যেমন ঃ হযরত পান্ডুয়ার এক লাখী সমাধির প্রবেশ পথের প্যানেলে ও দেয়াল গাত্রে , তাঁতীপাড়া মসজিদের কেন্দ্রীয় মিহরাবের প্যানেলে অনুরূপ লতানো ফুলের নকশা রয়েছে । এই প্রকারের নকশা সাধারণত সুলতানী আমলের মসজিদ সমূহের মিহরাবের প্যানেল অলংকরণের ক্ষেত্রে বেশী ব্যবহার করা হয়েছে। বাংলাদেশে নির্মিত ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর হিন্দু স্থাপত্য ইমারতেও অনুরূপ নকশা পরিলক্ষিত হয় যেমনঃ কান্তনগর মন্দির, দিনাজপুর ত্রিপল মন্দিরের (পুঠিয়া) মূর্তি প্যানেলের উপরে ও নীচে লতানো ফুলের নকশা স্থান পেয়েছে।

নারায়ণগঞ্জের অনেক মসজিদেই বরফী নকশা রয়েছে যেমনঃ বিবি মরিয়মের মসজিদ, দেওয়ান বাগের মসজিদের মিহরাবে, গরিবুল্লাহর মসজিদের মিহরাবে, মুয়াজ্জমপুর মসজিদের বহির্দেয়ালের প্যারাপেটে বরফী নকশা দৃষ্ট হয়। সুলতানী স্থাপত্য ইমারতে বরফী নকশা সার্বজনীনতা লাভ করেছে যেমনঃ দরাসবাড়ী মসজিদের কেন্দ্রীয় মিহরাবে, ষাট গম্বুজ মসজিদের ফাসাদের উপরের প্যানেলে, তাঁতী পাড়া মসজিদের গম্বুজের নিম্নাংশে, হযরত পান্ডুয়ার এক লাখী সমাধির প্রবেশ পথের প্যানেলে বরফী নকশার প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়। মুঘল আমলে ও বরফী নকশা পরিলক্ষিত হয় পাঁচ পীরের মসজিদের মিহরাবে। বন্ধ মারলন বাংলার মুসলিম স্থাপত্য অলংকরণে সুদূর প্রসারী ভূমিকা রয়েছে । নারায়ণগঞ্জের প্রায় সকল মসজিদ, সমাধি কমপ্লেক্স, দুর্গ বন্ধ মারলন নকশা দ্বারা অলংকৃত করা হয়েছে। এই ধরনের নকশা সুলতানী বাংলা স্থাপত্যের প্রথম দিক থেকেই পরিলক্ষিত হয় যেমনঃ হযরত পান্ডুয়ার আদিনা মসজিদের খিলান পটে সারিবদ্ধ ভাবে উক্ত নকশা দৃষ্ট হয় । মুঘল আমলে মসজিদের দেয়াল গাত্রে পলেস্তরা শুরু হলে স্থাপত্য ইমারতসমূহ অলংকরণে

Dhaka University Institutional Repository

টেরাকোটা নকশার প্রভাব ক্ষুন্ন হয়। তবে মুঘল স্থপতি বা কারিগরগণ বদ্ধ মারলন নকশা বাদ দিতে পারেননি। উল্লেখ্য যে, উক্ত নকশাটি সুলতানী স্থাপত্য ইমারতে, গম্বুজের অভ্যন্তরের নিম্নাংশ অলংকরণের ক্ষেত্রে বেশী ব্যবহৃত হয়েছে। আর মুঘল বা তার পরবর্তী সময়ের স্থাপত্য ইমারতসমূহে গম্বুজের বাহিরে ড্রামের চারিপাশে ব্যবহৃত হয়েছে ।

ঝুলন্ত শিকল বা দড়ির ন্যায় নকশা নারায়ণগঞ্জের মুয়াজ্জমপুর মসজিদের মিহরাবের অবতলাংশে এবং মিহরাবের পিছনের বহির্দেয়ালে দৃষ্ট হয়।[১৪] সোনারগাঁয়ের গোয়ালদী মসজিদের মিহরাবের অবতলাংশে ফাসাদে ঝুলন্ত শিকল নকশা পরিলক্ষিত হয় । এছাড়া দেওয়ান বাগের মসজিদের মিহরাব ফতেহ শাহ মসজিদের মিহরাব ঝুলন্ত শিকল নকশা দ্বারা অলংকৃত। এই ঝুলন্ত শিকল নকশায় প্রায় সব স্থানেই একটি শিকল। আদিনা মসজিদেও এই একটি শিকল নকশাই রয়েছে কিন্তু নারায়ণগঞ্জের গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ্ নির্মিত সমাধির গাত্র দুইটি ঝুলন্ত শিকল নকশা দ্বারা অলংকৃত। ঝুলন্ত শিকল নকশা একটি হিন্দু স্থাপত্য অলংকরণ বৈশিষ্ট্য। মুসলিম কারিগরগন হয়ত এর অনুকরন করেছেন অথবা এই দেশের বিখ্যাত সোনালী আঁশের দড়ি বা গ্রাম বাংলার সর্বত্র দৃশ্যমান কলাগাছের ঝুলন্ত মোচার অনুকরনও করতে পারেন। অনেক ক্ষেত্রে প্রদীপ দানী অথবা ফুলদানীতে একগুচ্ছ ফুল অথবা একগুচ্ছ ঝুলন্ত আঙ্গুর অথবা একগুচ্ছ রোজেট দ্বারা নকশা করা হয়েছে। ঝুলন্ত শিকল নকশা সুলতানী আমলের অনেক স্থাপত্য ইমারতে দেখা যায় যেমনঃ ষাট গম্বুজ মসজিদের দেয়াল গাত্রে, বাবা আদমের মসজিদের মিহরাবের পিছনের বহির্দেয়ালে, বাঘা মসজিদের মিহরাবে অনুরূপ নকশা দৃষ্ট হয় ।

নারায়ণগঞ্জের স্থাপত্য ইমারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল এই যে, মুঘল আমলের মসজিদের ফাসাদে মাঝে মাঝে প্যানেল নকশা রয়েছে এবং দেয়াল গাত্র কুলঙ্গি দ্বারা অলংকৃত নারায়ণগঞ্জের দুর্গ সমূহের বহির্দেয়ালে প্যানেল নকশা, হাজীগঞ্জ দুর্গে কুলঙ্গি, বিবি মরিয়মের সমাধিতে অসংখ্য কুলঙ্গি, পাঁচ পীরের মসজিদে প্যানেল ও কুলঙ্গি রয়েছে । মসজিদের দেয়াল গাত্রে বিশেষ করে মিহরাবের দেয়ালে আয়তাকৃতির প্যানেল নকশা দৃষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

হয়। এছাড়া বহির্দেয়াল ও প্যানেল নকশা দ্বারা অলংকৃত করা হয়েছে। এসব প্যানেলের অভ্যন্তরভাগে সামান্য গভীরতায় ফুল, লতা-পাতা জ্যামিতিক নকশা দ্বারা অলংকৃত করা হয়েছে। মিহরাবের অবতলাংশ কয়েকটি আয়তাকার প্যানেলে বিভক্ত করে রোজেট, পত্র, ফুল, বরফী প্রভৃতি নকশা দ্বারা শোভাবর্ধন করা হয়েছে। বাংলাদেশে নির্মিত অসংখ্য মসজিদে প্যানেল নকশার অলংকরণ দেখা যায় যেমনঃ বাঘা মসজিদের দেয়ালগাত্রে, শাহজাদপুর (পাবনা) মসজিদের দুটি প্রবেশ পথের মাঝখানে এবং মিহরাবে প্যানেল নকশা রয়েছে। উল্লেখ্য যে, সুলতানী ও মুঘল আমলের স্থাপত্য ইমারতসমূহ অলংকরণে খিলানাকৃতির প্যানেলের তুলনায় আয়তাকৃতির প্যানেল বেশী ব্যবহৃত হয়েছে। তবে মুঘলরা সর্বপ্রথম প্যানেল অলংকরণ প্রবর্তন করে বলে যে ধারনা রয়েছে তা সঠিক নয়। বস্তুতপক্ষে বাংলার কুঁড়েঘরের বাহ্যিক অবয়বটিকে স্থাপত্য ইমারতের গাত্রে প্রায় হুবহু ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। এর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে প্রথমতঃ কুঁড়ে ঘরের দেয়াল বা বেড়া ভাজ বা বুনট করা বাঁশ, পাটকাঠি, ছন, হোগলাপাতা ও খড়কুটো দ্বারা নির্মিত। কাঠের ফালি, বাঁশের চটি বা কঞ্চি বেড়াতে সোজা বা আড়াআড়ি ভাবে দৃঢ়ভাবে বেড়াটির সাথে বেঁধে দেওয়া হয়। এভাবে বেড়াতে ঘনিষ্টভাবে সন্নিবেশিত যেসব খোপ বা প্যানেল তৈরী হল তারই অনুকরণে বাংলার স্থাপত্য ইমারতে প্যানেল অলংকরণ তৈরী করা হয়। দ্বিতীয়তঃ স্থাপত্য ইমারতের দেয়াল গাত্রে যে সব পালানুক্রমিক কুলঙ্গি এবং ভারসাম্য বিশিষ্ট অভিক্ষেপন রয়েছে বৈশিষ্ট্যগতভাবে তা আসে বাংলার কুঁড়েঘরের কাঠ এবং কঞ্চির বেড়া হতে । তৃতীয়তঃ স্থাপত্য ইমারতের চার কোনার চারটি বুরুজ বাংলার কঁড়ে ঘরের কোনার চারটি বাঁশের খুঁটি হতে উৎপন্ন ।

নারায়ণগঞ্জের গোয়ালদী মসজিদের গম্বুজটিতে বাংলা পেনডেনটিভ ব্যবহার করা হয়েছে।[১৫] গম্বুজ নির্মাণে বর্গ হতে গম্বুজের বৃত্তাকার নিম্নভাগে, বা বর্গ হতে অষ্টভুজে এবং অষ্টভুজ হতে গম্বুজের বৃত্তাকার নিম্নভাগে পৌছবার জন্য অবস্থান্তর বা উত্তরন স্থলের পর্যায়টি কলা-কৌশলের দিক থেকে জটিলতম সমস্যারূপে পরিগনিত হয়ে আসছে । কৌশলগত

Dhaka University Institutional Repository

দিক থেকে গুরুত্বপূর্ন এই পদ্ধতিটিতে অনুভূমিক সমতল স্তর এবং কোন বিশিষ্ট ধারা বা কোনা একটু বের করে এই দুই শ্রেনীতে ইটগুলি পালাক্রমে ব্যবহার করে , মার্বেল পেনডেনটিভ গঠন করে ক্রমপূরন পদ্ধতিটি ব্যবহার করা হয়েছে । বস্তুতপক্ষে কর্বেল পেনডেনটিভ ইসলামী স্থাপত্যে দুর্লভ নহে । কুতুব দিল্লীতে এর ব্যবহার তাৎপর্যপূর্ন । কিন্তু বাংলার স্থাপত্য শিল্পে এরূপ নূতন কলা-কৌশলিক পদ্ধতি কর্বেল পেনডেনটিভের ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ । এইজন্য সম্ভবত এ.বি. এম. হোসাইন এর অনুভূমিক শ্রেনীবদ্ধকরন প্রক্রিয়ার জন্য একে যথার্থভাবেই "বাংলা পেনডেনটিভ " বলে অভিহিত করেছেন, যেমন করে উসমানীয় তুর্কী স্থাপত্যের উলম্ব পেনডেনটিভ "তুর্কী পেনডেনটিভ" বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে । তার মতে সুলতানী আমলের স্থাপত্য শিল্পের সামগ্রিক ইতিহাসে এই "বাংলা পেনডেনটিভ" বাংলা স্থাপত্য শিল্পকে অসাধারন বৈশিষ্ট্য মন্ডিত করে তুলেছে ।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

টীকা ও তথ্য নির্দেশ

১) করিম, আব্দুল, *বাংলার ইতিহাস (সুলতানী আমল),* ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, পৃ. ১৭৫

২) হাসান, সৈয়দ মাহমুদুল, *বাংলাদেশের মসজিদ,* ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭, পৃ. ৩২- ৩৩

৩) Dani,A. H., ***Muslim Architecture in Bengal,*** Dacca, Asiatic Society of Pakistan, 1961, pp. 118-129

৪) হাসান, সৈয়দ মাহমুদুল, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩৮

৫) রহমান, কাজী মোস্তাফিজুর "বাংলার মন্দির স্থাপত্যে মুসলিম প্রভাব" ***গবেষণা পত্রিকা*** ৩য় সংখ্যা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, ১৯৯৭-৯৮ পৃ. ১৭২

৬) Datta, Bimal Kumar. ***Bengal Temples,*** New Delhi, 1975, pp. 26

৭) Dani, A. H. ***Op.cit,*** p. II

৮) আলী, এ. কে. এম. ইয়াকুব, ***মুসলিম স্থাপত্য ও শিল্পকলা,*** রাজশাহী, সাজ্জাদুর রহিম, ১৯৯৬, পৃ. ১৫৮

৯) হোসেন, এ.বি.এম., *আরব স্থাপত্য,* ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ২০০

১০) হাসান, সৈয়দ মাহমুদুল, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২৮

১১) হক, মুহম্মদ শামসুল 'ভারতীয় স্থাপত্য শিল্পের ইতিহাসে বাংলার মুসলিম স্থাপত্যের অবস্থান' ***আবু মহামেদ হাবিবুল্লাহ স্মারকগ্রন্থ*** , বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ২৮৮

১২) Dani, A. H. ***Op.cit.*** pp. 76

১৩) হাসান, সৈয়দ মাহমুদুল, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৮৮

১৪) চিত্র নং ৪

১৫) চিত্র নং ১৫

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

নারায়ণগঞ্জ স্থাপত্যের তুলনামূলক আলোচনা

বাংলা স্থাপত্যশিল্পে যে সমস্ত উজ্জলতম অধ্যায় রয়েছে নারায়ণগঞ্জের স্থাপত্য শিল্প নিঃসন্দেহে তাদের মধ্যে একটি। যদিও অনেক মুসলিম ঐতিহাসিক বাংলার ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে নারায়ণগঞ্জের ইতিহাস উল্লেখ করেছেন কিন্তু নারায়ণগঞ্জের স্থাপত্য শিল্প সম্বন্ধে কোন ঐতিহাসিকই স্পষ্ট করে তেমন কিছু উল্লেখ করেননি। আধুনিক যুগের কিছু কিছু ইতিহাস গ্রন্থে বিভিন্ন রিপোর্ট, পত্র পত্রিকায় বিচ্ছিন্ন ভাবে নারায়ণগঞ্জের স্থাপত্য সম্বন্ধে কিছু তথ্য লিপিবদ্ধ হয়েছে। বিভিন্ন পত্র পত্রিকা রিপোর্ট এবং বাস্তব পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে নারায়ণগঞ্জের স্থাপত্যে তিন ধরনের স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গেছে যথা-সুলতানী আমলের স্থাপত্য , মুঘল আমলের স্থাপত্য ও ঔপনেবেশিক আমলের স্থাপত্য ।[১] সুলতানী আমলের স্থাপত্য ও মুঘল আমলের স্থাপত্যের স্থাপত্যিক বৈশিষ্টের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হল ঃ-

নারায়ণগঞ্জের স্থাপত্যের মধ্যে মসজিদ স্থাপত্যই বেশী । সুলতানী ও মুঘল এই দুই আমলের মসজিদই সমাজ পরিচলনা করত আর এজন্যই বাংলায় মসজিদ ভিত্তিক সমাজ আজও লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন দূর্যোগের সময় মানুষ মসজিদে গিয়ে নিরাপদে থাকতো যেমন ঝড়, বৃষ্টি, বন্যা ইত্যাদি।[২] নারায়ণগঞ্জের তিন দিকেই নদী ফলে এখানে বর্ষার সময় অনেক অঞ্চলই পানিতে ডুবে যেত তাই মসজিদ গুলি নির্মাণের জন্যে উঁচু ভূমিকেই বেশী প্রাধান্য দিত। অতএব, দৃশ্যমান নারায়ণগঞ্জের সুলতানী ও মুঘল আমলের প্রায় সকল মসজিদেরই ভূমি উঁচু। যেমন- সুলতানী আমলের গোয়ালদী মসজিদ এবং মুঘল আমলের পাঁচ পীরের মসজিদের ভূমি উঁচু।

নারায়ণগঞ্জের স্থাপত্য ইমারত সমূহে নির্মাণ উপকরণ হিসাবে পাথরের অভাব পরিলক্ষিত হয়। প্রচুর পলিমাটি দ্বারা ইট তৈরীর সুযোগ থাকায় এই অঞ্চলে ইটের তৈরী

Dhaka University Institutional Repository

স্থাপত্যরীতির প্রাধান্য দেখা যায়। সুলতানী আমলে ইট নির্মিত ইমারতে আংশিক ভাবে পাথরের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।[৩] যেমন- গোয়ালদী মসজিদের মিহরাব ও প্রবেশ পথে প্রস্তরের ব্যবহার আছে। অনুরূপ ভাবে মুঘল আমলের মসজিদেও খুব সামান্য পরিমানে প্রস্তরের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।

সুলতানী ও মুঘল দুই আমলেই ইটের ব্যবহার ছিল কিন্তু সুলতানী আমলে ইটের উচ্চতা পাতলা হলেও দৈর্ঘ্য ছিল বড়।[৪] কিন্তু মুঘল আমলে ইটের উচ্চতা পতলা এবং আকারে ছিল ছোট ও ক্ষুদ্র এই জন্য আগুনে পুড়তে সুবিধা হত বলে মুঘল আমলের স্থাপত্যে সুলতানী আমলের চেয়ে টেকসই। এই ধরনের ইটকে জাফরী ইট বলা হয়।

ইট দ্বারা নির্মিত এই সকল স্থাপত্যের জোড়ক ছিল চুন-সুরকীর মসলা।[৫] সুলতানী ও মুঘল উভয় সময়েই জোড়ক হিসেবে চুন সুরকী ব্যবহার করা হয় এবং ইটের গাঁথুনী ও একই পদ্ধতিতে করা হয়েছিল।

নারায়ণগঞ্জের স্থাপত্যের মধ্যে সুলতানী আমলের স্থাপত্যের দেয়াল গাত্রে শুধু মাত্র ইটের ব্যবহার দেখা যায়। কিন্তু মুঘল আমলে এই ইটের গাঁথুনীর উপর পলেস্তরা করে প্যানেল আকৃতি করা হতো।[৬] যেমন- সুলতানী আমলের বন্দর বাবা সালেহ মসজিদের দেয়াল গাত্র পলেস্তরা যুক্ত প্যানেল আকৃতির কিন্তু গোয়ালদী মসজিদ ইটের গাঁথনীতে সজ্জিত। সুলতানী আমলের স্থাপত্যে দেয়াল বেশ পুরো কিন্তু মুঘল আমলের স্থাপত্যে দেয়ালের পুরুত্ব কম এবং প্যানেল করা। মুঘল স্থাপত্যের দেয়ালে অসংখ্য কুলঙ্গি পরিলক্ষিত হয়।[৭] কিন্তু সুলতানী আমলের প্রাচীরে কুলঙ্গির পরিমান স্বল্প আবার কোন কোন ইমারতে একবারেই নেই।

নারায়ণগঞ্জের স্থাপত্যে কোণার বুরুজ একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যটি আবহাওয়াগত ও ভূ-তাত্ত্বিক কারণে সুলতানী ও মুঘল উভয় স্থাপত্যেই ব্যবহৃত হয়েছে। বাংলায় কাল বৈশাখী ও আশ্বিনা ঝড় এখানকার ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্থ করত। ইমারতকে শক্তিশালী করার জন্য এই ধরনের বুরুজের ব্যবহার করা হয়েছে। সুলতানী আমলে কোণার

Dhaka University Institutional Repository

বুরুজ গুলো দেওয়াল পর্যন্ত ছিল, কিন্তু মুঘল স্থাপত্যে কোণার বুরুজ ছাদের উপর পর্যন্ত উঠে গেছে। সুলতানী আমলে পার্শ্ব বুরুজ গুলো গোলাকার হয় কিন্তু মুঘল আমলে অষ্টকোণাকার বুরুজ এবং গোলাকার বুরুজে অনেক ব্যান্ড ব্যবহৃত হয়েছে।

নারায়ণগঞ্জের স্থাপত্যে বিভিন্ন প্রকার গম্বুজ দেখা যায়। সুলতানী আমলের স্থাপত্যে ডিম্বাকার গম্বুজ এবং অনুচ্চ 'ফাসাদ' পরিলক্ষিত হয়। যেমন- মোগরা পাড়া মসজিদ, ইউসুফগঞ্জ মসজিদের গম্বুজ উল্টানো পেয়ালার ন্যায় এবং অনুচ্চ ফাসাদ পরিলক্ষিত হয়। অপর দিকে মুঘল আমলের মসজিদের গম্বুজ ড্রামের উপর সুডৌল আকারে নির্মিত হয়। এদের সংখ্যা তিনটি পরিলক্ষিত হয়। মুঘল আমলের মসজিদের গম্বুজের অভ্যন্তরের সর্বোচ্চে রঙিন নকশা, ফুল দেখা যায়। ড্রামের চারিদিকে মারলন নকশা, বন্ধ মারলন নকশা দেখা যায় এবং ড্রামের অভ্যন্তরে ও কিনারায় দড়ি নকশাও পরিলক্ষিত হয়। যেমন -দেওয়ান বাগ মসজিদের গম্বুজের ভিতরে এধরনের নকশা রয়েছে। গম্বুজ সাধারণতঃ দুই পদ্ধতিতে নির্মিত হয়। (১) স্কুইঞ্চ পদ্ধতি, (২) পেনডেনটিভ পদ্ধতি। সুলতানী আমলের স্থাপত্যে পেনডেনটিভ পদ্ধতিতে গম্বুজ নির্মিত হয় কিন্তু মুঘল আমলে স্থাপত্যে স্কুইঞ্চ পদ্ধতিতে গম্বুজ নির্মিত হয়।

সুলতানী আমলের কার্নিশ ও ছাদের ধনুক বক্রতা ঐ আমলের স্থাপত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।[৮] বস্তুতঃ বাংলার বাঁশের স্থিতিস্থাপকতার সুযোগ নিয়ে এ সময়ে স্থপতিরা ইট নির্মিত ইমারত সমূহে বক্ররেখা বৈশিষ্ট্য এবং বাঁকানো কার্নিশ ব্যবহার করত। গোয়ালদি মসজিদের কার্নিশ বক্ররেখা বিশিষ্ট। কিন্তু মুঘল আমলের কার্নিশ ও ছাদ সমান্তরাল। যেমন - পাঁচ পীরের মাজার বিশিষ্ট মসজিদ।

নারায়ণগঞ্জের স্থাপত্যে সুলতানী আমলের মসজিদের আকার এক কক্ষ বিশিষ্ট বর্গাকৃতির পরিলক্ষিত হয় কিন্তু মুঘল আমলের মসজিদের আকার আয়তাকার বারান্দাযুক্ত মসজিদই বেশী দেখা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

নারায়ণগঞ্জের স্থাপত্যে খিলান পর্যালোচনায় সুলতানী ও মুঘল আমলের স্থাপত্যের মধ্যে বিশেষ ব্যবধান রয়েছে। সুলতানী আমলে সর্বোতভাবে দ্বিকেন্দ্রিক সূঁচালো খিলান দেখা যায়। গোয়ালদী মসজিদের খিলান এবং ইউসুফগঞ্জের খিলান দ্বিকেন্দ্রিক সূঁচালো খিলান। মুঘল আমলের মসজিদে চতুর্কেন্দ্রিক সূঁচালো খিলান এবং খাঁজ খিলানের ব্যবহার রয়েছে। হাজীগঞ্জ মসজিদে চতুর্কেন্দ্রিক খিলান এবং বিবি মরিয়মের সমাধিতে খাঁজ খিলানের ব্যবহার হয়েছে।[৯]

সুলতানী আমলের মসজিদে সাধারণতঃ কেবলা দেয়ালের মিহ্রাবের সংখ্যা অনুপাতে বিপরীত দিকের দেয়ালের দরজা সংখ্যা নির্মিত হয়।[১০] অর্থাৎ কেব্লা দেয়ালে যদি তিনটি মিহরাব হয় তাহলে দরজার সংখ্যাও তিনটি হবে। সাধারণতঃ সুলতানী আমলের মসজিদে ঐ তিনটি দরজা ব্যতীত উত্তর দক্ষিণে একটি করে মোট দুটি দরজা পরিলক্ষিত হয়। মুঘল আমলের মসজিদেও কেবলা দেয়ালের মিহরাবের সংখ্যা অনুপাতে বিপরীত দিকের দেয়ালে দরজার সংখ্যা সমান হয়। যেহেতু মুঘল আমলের মসজিদ আয়তাকার আকৃতির হয়; সেহেতু মিহ্রাবের সংখ্যা সাধারণতঃ পাঁচটি হয়। তথাপি দরজার সংখ্যাও পাঁচটি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু মুঘল আমলের মসজিদে উত্তর ও দক্ষিণ দিকে দরজার অস্তিত্ব দেখা যায় না।[১১] মুঘল আমলের ফাসাদে কেন্দ্রীয় দরজাটি বৃহত্তর ও পার্শ্ববর্তী দরজা গুলো অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। কিন্তু সুলতানী আমলের স্থাপত্যের দরজার প্রশস্ততা ও উচ্চতা কম হয়।

মুঘল আমলে মসজিদের মাঝখানের মিহরাব বড় এবং পার্শ্ববর্তী মিহরাব অপেক্ষাকৃত ছোট। সুলতানী আমলের মিহরাবেও একই বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। তবে মুঘল আমলের মসজিদের মিহরাব গুলো সাধারনতঃ ইটের গাথুঁনীর উপর আস্তরযুক্ত এবং প্যানেল আকৃতির। কিন্তু সুলতানী আমলের মসজিদের মিহরাবগুলোতে সাধারণতঃ ব্যাসল্ট পাথরের উপর খাঁজ কাটা খিলান এবং দড়ি নকশা ও প্রদীপদানীর ন্যায় নকশা পরিলক্ষিত হয়।

নারায়ণগঞ্জের স্থাপত্য বর্তমানে ধ্বংসাবস্থায় রয়েছে।[১২] এখনও যে সব স্থাপত্য টিকে আছে সেগুলোর অলংকরণের সাথে এইসময়ে বাংলার অন্যান্য অংশে গড়ে উঠা স্থাপত্য

Dhaka University Institutional Repository

ইমারতের অলংকরণের সাথে খুব একটা পার্থক্য নেই। নারায়ণগঞ্জের ইমারত গুলোর অলংকরণ বা নির্মাণগত দিক থেকে তাদের প্রকৃত প্রকৃতি হারিয়ে ফেলেছে। গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ্ নির্মিত সমাধি সৌধটি এই গুলোর মধ্যে ব্যতিক্রম। এই ইমারতটি পূনর্গঠন ও পুনঃসস্কার করা হয়নি। কালো পাথরে নির্মিত শবাধারটি আয়তাকার টেবিলের উপর দন্ডায়মান। টেবিলের বর্ডারের নিচের অংশে পাথরের খোদাই কাজ করা হয়েছে। শবাধারের গায়ে ঝুলন্ত বাতি নকশা মতান্তরে ঘন্টি নকশা শোভাবর্ধন করেছে।[১৩] পান্ডুয়ার ফিরূজাবাদের আদিনা মসজিদে এধরনের নকশা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এখানে কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়েছে। এখানের মোটিফে দুটি ঝুলন্ত শিকল ব্যবহৃত হয়েছে। যেখানে আদিনা মসজিদে একটি ঝুলন্ত শিকল ব্যবহৃত হয়েছিল। এটি পাথর খোদাই কাজের একটি অনন্য দৃষ্টান্ত। গোয়ালদী মসজিদের সম্মুখভাগের অলংকরণ সাধারণ টেরাকোটা নকশায় সজ্জিত করা হয়েছে।[১৪] বেশীর ভাগ নকশাই বহির্ভাগে এবং অভ্যন্তরে ইট স্থাপনায় নকশা করা হয়েছে। টেরাকোটা নকশার বিষয়বস্তু এবং দড়ি নকশার সাথে গৌড় লক্ষনৌতির নকশার অনুরূপ।[১৫] যেমন আয়তকার প্যানেলের মধ্যে লতা এবং ঝুলন্ত নকশা, দেয়াল থেকে উৎগত একটি ছোট অংশ যা একটি ছোট জানালার ধারনা দেয়। বুরুজ এবং কার্নিশগুলো দড়ি নকশা দ্বারা সজ্জিত, বুরুজগুলোতে বাঁশের মত গিট বা বন্ধ একসারি খিলান রয়েছে। পুরো ইমারতটির এ ধরনের নকশা গৌড় লক্ষনৌতির দড়াস বাড়ী মসজিদে দেখা যায়। গোয়ালদী মসজিদের গোলাকার কোণার বুরুজ অলংকরণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কারণ মধ্যযুগে বাংলায় এ ধরনের কোণার বুরুজের প্রচলনই বেশী প্রতীয়মান হয়েছে। মুয়াজ্জামাপুর মসজিদের পশ্চাৎ দিকের দেয়ালের বহির্ভাগের চিত্তাকর্ষক ইটের খোদাইকৃত অলংকরণে আকর্ষনীয় দেশীয় মোটিফ ব্যবহৃত হয়েছে। মিহরাব যে দেয়াল হতে উদগত হয়েছে সে অংশটিতে প্যানেলের মধ্যে বহুখাঁজ বিশিষ্ট খিলান নকশা এবং একটি ঝুলন্ত নকশা মোটিফ পরিলক্ষিত হয়। প্যানেলটির দুপাশে অলংকৃত কলাম এবং একটি আয়তাকার প্যানেল ঝুলন্ত নকশা নীচে দেখা যায় যাতে দু'টি ঢেউযুক্ত পাতার নকশা প্রতীয়মান হয়েছে। এই নকশাটি একটি

Dhaka University Institutional Repository

ব্যতিক্রম এবং এখনও কোথাও দেখা যায়নি। খিলানের স্প্যানড্রিলে গোলাপফুল নকশা খিলানযুক্ত প্যানেলে এক সারি সুন্দর ব্যান্ডে ফুলের এবং জ্যামিতিক নকশার মিশ্রনযুক্ত নকশা পরিলক্ষিত হয়। প্যানেলের নীচের অংশে দুই সারি প্যানেল এবং একসারি সরু প্যানেল দড়ি নকশা ও লজেন্স নকশা দ্বারা সজ্জিত হয়েছে। নারায়ণগঞ্জে সুলতানী আমলে নির্মিত মসজিদ গুলো পুনসংস্কার করা হয়েছে যার ফলে এগুলো দেখতে আধুনিক মসজিদের রূপ লাভ করেছে। এ থেকে ধারনা করা যেতে পারে যে এগুলো এক সময় একই পদ্ধতিতে অলংকরণ করা ছিল এবং একই ধরনের বিষয়বস্তু ব্যবহার করা হয়েছিল যা বাংলার স্থাপত্য অলংকরনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য লাভ করেছিল। বাংলায় সুলতানী আমলের স্থাপত্য নামে পরিচিতি লাভ করে।

নারায়ণগঞ্জের মুঘল ইমারতের অলংকরণ এই সময়ে নির্মিত অন্যান্য ইমরতের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। পুনসংস্কারের কারনে প্রকৃত আস্তরন এখন আর দেখতে পাওয়া যায় না। উদাহরণ স্বরূপ দানিশমন্দ সমাধি বর্তমানে হলুদ রং দ্বারা রঙ করা হয়েছে।

বাংলায় মুঘল আমলে অলংকরণের ক্ষেত্রে সাদামাটা আস্তর করা হয়েছে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেয়ালে অগভীর প্যানেল অলংকরণ দেখতে পাওয়া যায়। খিলানের মাথায় মুকারনাস নকশা, প্যারাপেটে এবং গম্বুজের ভিতে বন্ধ মারলন নকশা, গম্বুজ এবং ফিনিয়েলের শীর্ষে পদ্মফুল নকশা পরিলক্ষিত হয়। অবকাঠামোগত পার্থক্য দেখা যায় কোনার বুরুজের আকৃতিতে। কোনার বুরুজগুলো বর্তমানে ছাদ পর্যন্ত উঠে গেছে বুরুজের নীচের অংশ অনেকটা ফুলদানীর মতো এবং শিরভাগ 'কিউপোলা' দ্বারা আচ্ছাদিত। ইউয়ান টাইপ প্রবেশ পথ, সুডৌল গম্বুজ এবং চৌচালা আকৃতির ছাদ এই সব নকশাই উত্তর ভারতের রাজকীয় মুঘল স্থাপত্যের অনুকরণ মাত্র। কিন্তু খোদাইকার্য এবং কারুকার্য খচিত কাজ এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ অলংকরণ বাদ দেওয়া হয়েছে। বাংলায় মুঘল স্থাপত্য কেন্দ্রীয় স্থাপত্যের অনুকরণে প্রাদেশিক স্থাপত্য। নকশার ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রাকারে এই সাধারণ রীতি অনুসরণ করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

টিকা ও তথ্য নির্দেশ

১. বাস্তব পর্যবেক্ষণ ১৬ই ডিসেম্বর ২০০১

২. Khatun, Habiba. ***Report*** – 2000 to the congeranetion team of Japan

৩. নারায়ণগঞ্জের স্থাপত্যে ইটের ব্যবহারের বহুল প্রচলন থাকলেও পাথরের ব্যবহার ছিল সামান্য। এই পাথরগুলোর মধ্যে কালো ব্যাসাল্ট পাথরের ব্যবহার বেশী পরিমানে পরিলক্ষিত হয়। পাথরের ব্যবহার দেখা যায় মসজিদের মিহরাবে, পিলারে, সেতুর মাঝখানে লিনটেলে ইত্যাদিতে।

৪. করিম, রেজাউল (সম্পাদিত) ***প্রাগুক্ত,*** পৃ. ৩৭৭

৫. বাস্তব পর্যবেক্ষণ ১৬ই ডিসেম্বর ২০০০

৬. *ঐ,*

৭. *ঐ,*

৮. হক, মুহাম্মদ শামসুল 'ভারতীয় স্থাপত্য শিল্পের ইতিহাসে বাংলার মুসলিম স্থাপত্যের অবস্থান', ***আবু মহাম্মেদ হাবিল্লাহ স্মারকগ্রন্থ,*** বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ২৮৮

৯. বাস্তব পর্যবেক্ষণ,

১০. বেগম, আয়শা, 'বাংলাদেশের মসজিদ স্থাপত্য' ***বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ রজতজয়ন্তী,*** ইতিহাস পরিষদ, ঢাকা, ১৯১১ পৃ. ২৪৪

১১. বাস্তব পর্যবেক্ষণ,

১২. *ঐ,*

১৩. ঘন্টা নকশা না বলে একে মন্দিরাও বলা যায়।

১৪. চিত্র নং ১২

১৫. চিত্র নং ১৩

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

নারায়ণগঞ্জ স্থাপত্যের শিলালিপি

শিলালিপি ইতিহাস পূনর্গঠনে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়। নারায়ণগঞ্জে স্থাপত্যে মধ্যযুগের যে কয়েকটি শিলালিপি পাওয়া গেছে তা সোনরগাঁয়ের ইতিহাস সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করেছে। শিলালিপিগুলো এ গবেষণার জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ শিলালিপি ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক এই দুই ধরণের তথ্যই প্রদান করে, বেশীরভাগ শিলালিপিতে ইমারত নির্মাণের তারিখ এবং নির্মাতার নাম উদ্ধৃত থাকে। শিলালিপির গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে তারিখ, নির্মাতার নামে জায়গার নাম ও উপাধি। শিলালিপি সাধারণত কালোপাথরের উপর লেখা হয়। বেশির ভাগ শিলালিপিই প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত ইমারত হতে সংগ্রহ করা হয়।

শিলালিপি লেখার মূল উপাদান সাধারণত কালো পাথর। বাংলায় পাথরের স্বল্পতাহেতু বেশীর ভাগ পাথরই ধ্বংসপ্রাপ্ত ইমারত হতে সংগ্রহ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে পুরাতন খোদাইকৃত কাঠামোর উপর নতুন অলংকরণ করা হয়।

বেশীর ভাগ শিলালিপিই মসজিদ, সমাধি, মাজার এর ফাসাদে প্রোথিত থাকে। নারায়ণগঞ্জের প্রাপ্ত শিলালিপিগুলোর বেশীর ভাগই আরবী, ফার্সী, আরবী-ফার্সী মিশ্রিত, এবং বাংলা ভাষায় লিখিত।

Dhaka University Institutional Repository

মুয়াজ্জমপুর মসজিদ

সৈয়দ আওলাদ হাসান মসজিদটি প্রায় ভগ্ন অবস্থায় দেখতে পান এবং ১৯০৪ সালে প্রথম এই শিলালিপিটি ভগ্ন অবস্থায় উদ্ধার করেন।[১] সম্পূর্ন শিলালিপিটি পাঠোদ্ধারের অযোগ্য ছিল। শিলালিপি থেকে জানা যায় " মসনদশাহী" আহমদ শাহ্র শাসনামলে মহান ফিরোজ খাঁন মসজিদটি তৈরী করেন।[২] মসজিদের দক্ষিণে শাহ্ লঙ্গরের সমাধি এখন বিদ্যমান। শিলালিপিটি সম্পর্কে খুব অল্পই জানা যায়। মসজিদে প্রাপ্ত শিলালিপিটি থেকে মসনদশাহী আহমদ শাহ্ নামক একজন শাসকের নাম পাওয়া গেলেও তার রাজকীয় নাম পাওয়া যায় নি। এ ছাড়া বাংলায় সুলতান শামসউদ্দিন অহমদ শাহ্ নামক একজন রাজার নাম পাওয়া গেছে। তিনি শিলালিপিতে উল্লেখিত আহমদ শাহ বাংলার শাসক শামসউদ্দীন আহমদ শাহ কিনা জানা যায় নি। এছাড়া মসজিদের নির্মাতা ফিরোজ খাঁন সম্পর্কেও কিছু জানা যায় নি।

فیروز خان ... کبیر خلد الله ملکه الی یوم الدین

---- در وقت ایالت مسند شاهی احمد شاه

---- علی موسی سلطان راجی الی ----.

অনুবাদ :

ফিরোজ খাঁন .... কবীর। আল্লাহ তাঁর রাজত্বকাল শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত চিরস্থায়ী (করুন)। (এ মসজিদ) মসনদশাহী আহমদ শাহ্র রাজত্বকালে (নির্মিত) আলী মুসী সুলতান আশাবাদী যে............. ।

বন্দর শাহী মসজিদ

খিজিরপুরের বিপরীত দিকে ত্রিবেনী খালের পাশে বন্দর নামক স্থানে একটি পুরাতন মসজিদে শিলালিপিটি পাওয়া গেছে। এই শিলালিপিটি সম্বন্ধে প্রথমে জেমস ওয়াইজ এবং ব্লকম্যান উল্লেখ করেন– শিলালিপিটিতে তিনটি পংক্তিতে বিভক্ত প্রত্যেকটি পংক্তির মাঝে সরু বর্ডার আছে। শিলালিপিটি আরবী নাসখ রীতিতে লিখিত। শিলালিপি থেকে জানা যায় মালিক-আল-মুয়াজ্জাম বাবা সালেহ্ ৮৮৬ হিজরী / ১৪৮১ সালে সুলতান জালালউদ্দীন ফতেহ্ শাহের পুত্রের রাজত্বকালে এ মসজিদ নির্মান করেন।[৩]

বন্দর শাহী মসজিদের শিলালিপি

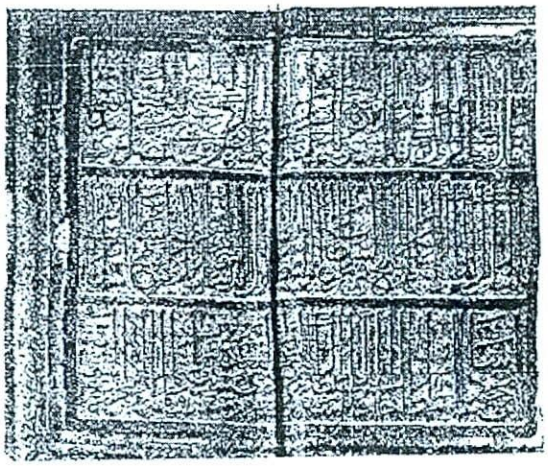

L-1. قال الله تعالى بان الله بان المساجد الله تدعوا مع الله احدا
قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا بنى الله له
قصرا في الجنة بنى هذا المسجد .

L-2. المبارك الله الملك العظيم باب طالع في زمان السلطان ابن
السلطان جلال الدنيا والدين - ابو المظفر فتح شاه السلطان

L-3. ابن محمود شاه السلطان خلد الله ملكه وسلطانه في تاريخ
اول شهر ذي القعدة سنة ست وثمانين وثمانية من
النبوة

Dhaka University Institutional Repository

অনুবাদ

(১) সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী আল্লাহ্ বলেন– " মসজিদ আল্লাহর ঘর সুতরাং আল্লাহ্র সাথে কাউকে (শরিক) তুলনা করো না।" আল্লাহর আর্শীবাদ প্রাপ্ত মহানবী (সঃ) বলেছেন– "যে পৃথিবীতে একটি মসজিদ নির্মান করেন ; আল্লাহ তাঁর জন্য স্বর্গে সত্তরটি প্রাসাদ তৈরী করেছেন।"

(২) এই আর্শীবাদ প্রাপ্ত মসজিদটি বিখ্যাত বাবা সালেহ কর্তৃক সুলতান মাহমুদ শাহের পুত্র সুলতান জালাল আল দুনিয়া ওয়াল দীন আবুল মুজাফার ফতেহ শাহ্ এর পুত্র সুলতানের আমলে নির্মীত হয়েছে।

(৩) আল্লাহ তাঁর রাজত্ব এবং সার্বভৌমত্ব চিরস্থায়ী করুন। আরবী জিলকদ মাসের ১ম তারিখে ৮৮৬ হিজরী / ২২ ডিসেম্বর ১৪৮১ খ্রীষ্টাব্দে (এ মসজিদ) নির্মিত।

Dhaka University Institutional Repository

ফতেহ শাহের মসজিদ

শিলালিপিটি প্রথম আবিষ্কার করেন আলেকজান্ডার কানিংহাম ১৮৭৯ সালে।[৪] খুব সম্ভবত এই শিলালিপিটি মসজিদের সম্মুখ দেয়ালে গ্রোথিত ছিল পরবর্তীতে তা স্থানচ্যুত হয়। 'লিস্ট অফ এনশিয়েন্ট মনুমেন্টস অফ বেঙ্গল' (১৮৯৬ এ.ডি.) –এ শিলালিপিটি দরগাহ বাড়ী সমাধির প্রাচীরের দেয়ালে গ্রোথিত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। স্থানীয়রা বিশ্বাস করে কোন ব্যাক্তি যদি কোন সম্পত্তি হারায় তাহলে সে শিলালিপির উপর এক পোচ চুনা লেপে দিলে তার হারানো জিনিস ফিরে পাবে।[৫] শিলালিপি থেকে জানা যায় সুলতান জালাল উদ্দীন ফতেহ শাহের রাজত্বকালে হিজরী ৮৮৯/১৪৮৪ সালে নির্মিত হয়েছে। নির্মাতার নাম না পাওয়া গেলে ও তার পদবী ছিল মুকায়রাব আল দৌলাহ এবং সার–ই–লস্কর এবং তিনি থানা লওর ও ইকলিম মোয়াজ্জামাবাদের ওয়াজির।[৬] শিলালিপিটি আরবী নাসখ রীতিতে লিখিত।

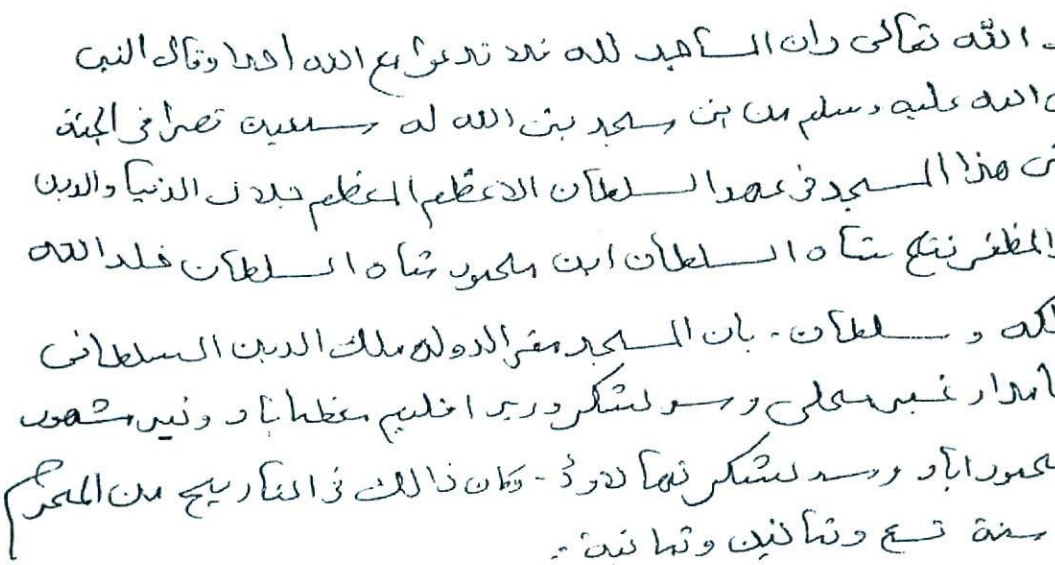

Dhaka University Institutional Repository

অনুবাদ

সর্ব ক্ষমতাময় অধিকারী আল্লাহ বলেন – "মসজিদ আল্লাহর ঘর সুতরাং আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার করো না" এবং আল্লাহর আর্শীবাদ প্রাপ্ত মহানবী (সঃ) বলেছেন – "যে পৃথিবীতে একটি মসজিদ নির্মাণ করে আল্লাহ তাঁর জন্য স্বর্গে সত্তরটি প্রাসাদ নির্মাণ করবেন।" মসজিদটি বিখ্যাত শাসক এবং সম্মানিত সুলতান জালাল আল দুনিয়া আবুল মুজ্জাফর ফতেহ শাহর আমলে নির্মিত তিনি সুলতান মাহমুদ শাহের পুত্র। আল্লাহ তার রাজত্ব এবং সার্বভৌমত্ব দীর্ঘস্থায়ী করুণ। মসজিদটির নির্মাতা মুকাররাব–আল–দৌলত মালিক–আলাদীন, শাসক, বর্মরক্ষক এবং ইকলীম মুয়াজ্জামাবাদ এর সার–ই–লস্কর । ইকলীম মুয়াজ্জামাদ মাহমুদাবাদ নামেও পরিচিত এর থানা লাওর, তিনি সার-ই-লস্কও বা সেনাধ্যক্ষ। মসজিদটি আরবী মহরম মাসে ৮৮৯ হিজরী/ ফেব্রুয়ারী ১৪৮৪ সালে নির্মিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

হাজী বাবা সালেহ মসজিদ

শিলালিপিটি জেমস ওয়াইজ প্রথম আবিষ্কার করেন। শিলালিপি থেকে জানা যায়। সুলতান হোসেন সাহের শাসনামলে মালিক হাজী বাবা সালেহ কর্তৃক ৯০০ হিজরী / ১৪৯৪ সালে নির্মিত হয়েছে। শিলালিপি থেকে একটা শব্দ মুছে যাওয়ায়। (অস্পষ্ট হয়ে যাওয়ায়) তারিখ সুস্পষ্ট ভাবে পড়া যায় না, ব্লকম্যানের মতে অস্পষ্ট মুছে যাওয়া শব্দটি হবে fi sannah hadi Ashar ৯১১ AH. / ১৫০৫-৬ খ্রীষ্টাব্দে।[৭] বাবা সালেহ্ ৯১২ হিজরীতে মৃত্যু বরন করেন। তিনি নিজেই সম্ভবত এ মসজিদ হজ্ব করার পর নির্মান করেন।

قال الله تبارك وتعالى - وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا .
بنى هذا المسجد المبارك فى زمن السلطان علاء الدنيا والدين ابو المظفر
حسين شاه السلطان خلد الله ملكه الملك المعظم المكرم خادم النبى
حاجى الحرمين وزائر القدمين حاجى بابا صالح ... فى ... وتسعمائه من
الهجرة النبيه -

অনুবাদ

সর্ব ক্ষমতাময় অধীকারীর আল্লাহ বলেন "নিশ্চয়ই মসজিদ আল্লাহর এবং আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে(অংশীদার করো না)"[৮] এই আর্শীবাদ প্রাপ্ত মসজিদটি সুলতান আলা আল দুনিয়াওয়াল দীন আবুল মুজাফফর হোসেন শাহের সময়ে নির্মিত হয়েছে। আল্লাহ তার রাজত্ব চিরস্থায়ী করুন। এর নির্মাতা মালিক হাজী বাবা সালেহ্ তিনি রসূলের অনুগত মক্কা মদিনা পরিভ্রমণকারী ও (রসূলের) পদাঙ্ক দর্শনকারী। নির্মানকাল হিজরী ৯০০/ ১৪৯৪ খ্রী:

Dhaka University Institutional Repository

হাজী বাবা সালেহর সমাধি

শিলালিপিটির সন্ধান পান জেমস ওয়াইজ এবং পাঠোদ্ধার করেন ব্লকম্যান, লিপিটি থেকে জানা যায় সমাধিটি ৯১২ হিজরী / ১৫০৬-৭ সালে নির্মিত,[৯] শিলালিপির আংশিক ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ায় বাবা সালেহর নাম এবং তারিখ মুছে গেছে। শিলালিপিটি নাসখ রীতিতে লেখা হয়েছে।

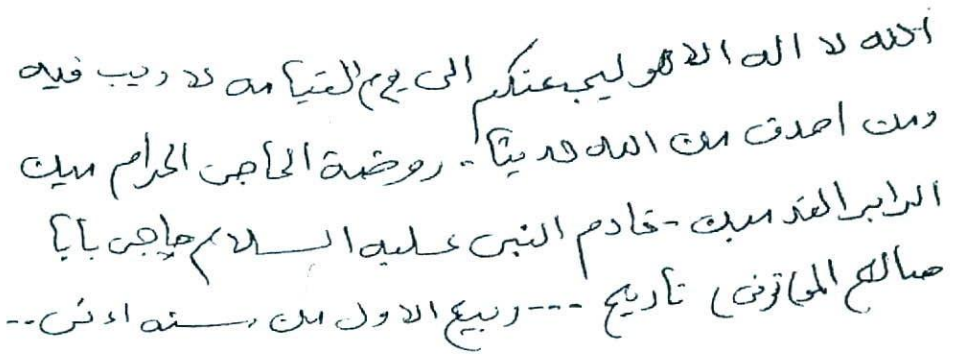

অনুবাদ

আল্লাহর কোন শরীক নেই। তিনি নিশ্চয়ই পূর্নোত্থানের দিন সংগ্রহ করবে তোমাকে এবং আল্লাহ অপেক্ষা সত্যবাদী আর কেউ নেই (কোরান ৪র্থ সূরা আয়াত -৮৯)। বিশ্বাসীর এ সমাধি মক্কা এবং মদীনা ভ্রমন কারী, এবং মহানবী (সঃ) -এর পদাঙ্ক দর্শন কারী ও নবীর উম্মুত হাজী বাবা সালেহ্। উপর শান্তি বর্ষিত হউক। (বাবা সালেহ্) যিনি মৃত্যু বরণ রবি-- ২ (৯১২ হিজরী ১৫০৬/৭ খ্রীষ্টাব্দে)

Dhaka University Institutional Repository

পরিচয়হীন মসজিদের শিলালিপি

শিলালিপিটি অলেকজান্ডার কানিংহাম কর্তৃক অবিস্কৃত এবং ব্লকম্যান কর্তৃক পাঠোদ্ধার কৃত। কিন্তু কোথায় গ্রোথিত ছিল তা জানা যায় নি। শিলালিপিটি পাঠোদ্ধারের পর জানা যায় মসজিদটি ৯১৯ হিজরী/ ১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দে জনৈক খাওয়াজ খান কর্তৃক সুলতান আল-দীন -আবুল মোজাফ্ফর হোসেন শাহের সময় নির্মিত হয়েছিল।[১০] শিলালিপিটি আরবী ভাষায় লেখা হলেও কোন রীতিতে লেখা হয়েছে তা উল্লেখ করা হয় নি।

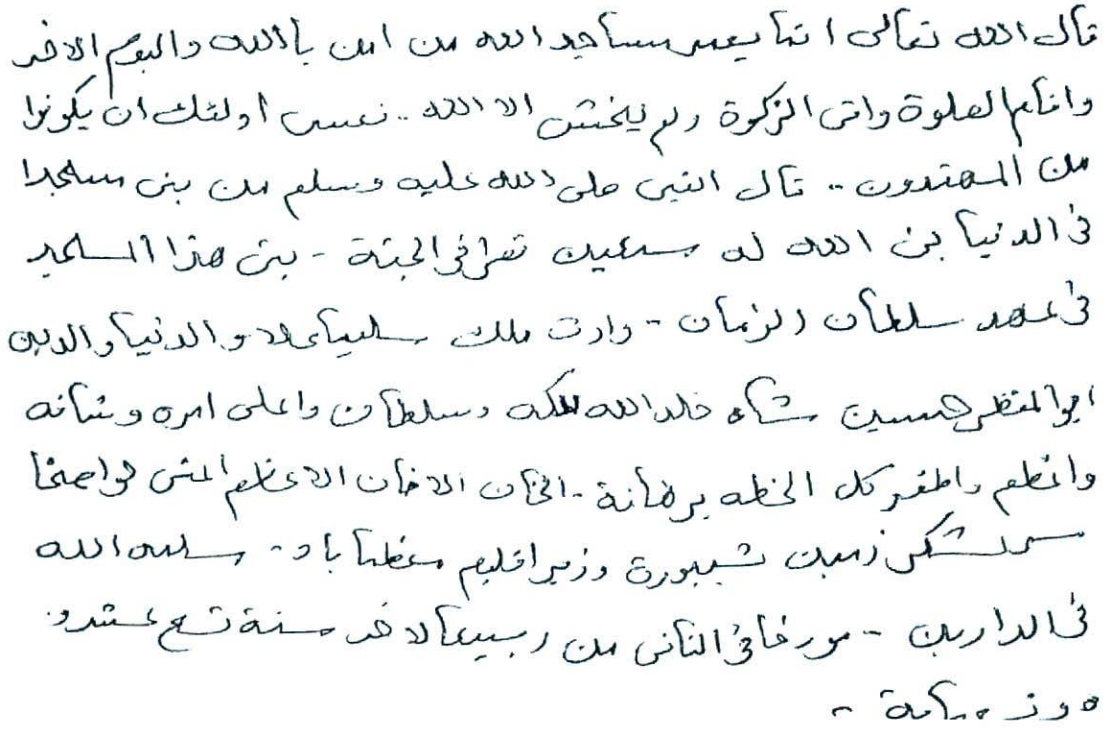

অনুবাদ

আল্লাহ বলেন, " অবশ্যই তিনিই মসজিদ নির্মান করবেন যিনি আল্লাহর উপর ঈমান এনেছেন এবং আখিরাতের দিনে বিশ্বাস করেছেন এবং যিনি নামাজ কায়েম করেন, এবং যাকাত আদায় করেন।[১১] আল্লাহ ব্যাতিত অন্য কেহকে ভয় করেন না এই ধরণের লোক খুব সম্ভবত সঠিক পথে চালিত হওয়ার জন্য একত্রিত হয়েছেন। আল্লাহর নবী যিনি আল্লহর বিশেষ দয়া ও আর্শীবাদ প্রাপ্ত, তিনি বলেন যিনি পৃথিবীতে একটি মসজিদ তৈরী করেন

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ তার জন্য স্বর্গে সত্তরটি প্রাসাদ তৈরি করবেন।" এই মসজিদটি সুলায়মানের বংশধর সুলতান আলা আল দুনিয়া ওয়া আল দীন আবুল মোজাফফর হোসেন শাহের সময় নির্মিত হয়েছে। আল্লাহ তার রাজত্ব এবং সার্বভৌমত্ব দীর্ঘস্থায়ী করুন এবং তার শক্তি ও দক্ষতা বৃদ্ধি করুন এবং প্রতি মুহূর্তে তার বিজয় অক্ষুন্ন থাকুক।[১২] মসজিদটি খাওয়াজ খান (ত্রিপুরা রাজ্যের) প্রধান ও সম্বানিত সেনাধক্ষ্য যেমন, সার-ই-লস্কর (সেনাবাহিনী প্রধান) এবং মুয়াজ্জামাবাদ ইকলীমের ওয়াজির নির্মান করেছেন। আল্লাহ তাকে দুনিয়া এবং আখেরাতে নিরাপদে রাখুন। নির্মান কাল ২রা (রবিউল আউয়াল) রবি ৯১৯ হিজরী মোতাবেক (১ জুন ১৫১৩ খ্রিঃ)।[১৩]

Dhaka University Institutional Repository

গোয়লদী মসজিদ

শিলালিপিটি আলেকজান্ডার কানিংহাম খুজে পান এবং ব্লকম্যান এর পাঠোদ্ধার করেন। শিলালিপি অনুযায়ী মসজিদটি ৯২৫ হিজরী ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দ সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহের সময় মোল্লা হিজবর আকবর খান কর্তৃক নির্মিত হয়েছে। লিপিটি থেকে বিস্তারিত কিছু জানা যায় নি।

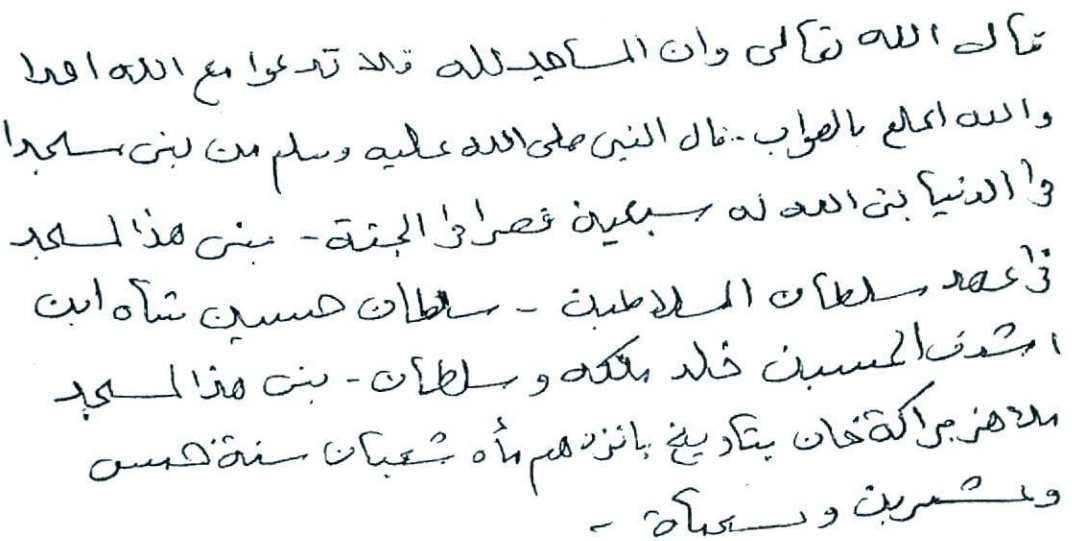

অনুবাদ

পরম করুণাময় আল্লাহ বলেছেন, " নিশ্চয় মসজিদ আল্লাহর। সুতরাং আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করো না।[১৪] আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন" আল্লাহর আর্শীবাদ প্রাপ্ত মহানবী (সঃ) বলেছেন, "যে বিশ্বে একটি মসজিদ তৈরী করেন আল্লাহ স্বর্গে তার জন্য সত্তরটি প্রাসাদ তৈরী করে দেন" এই মসজিদটি আশরাফ-আল-হোসায়মীর পুত্র সুলতানদের সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহের সময় নির্মিত। আল্লাহ তার রাজত্ব এবং সার্বভৌমত্ব চিরস্থায়ী করুণ। মসজিদটি মোল্লা হিজবর আকবর খান কর্তৃক ১৫ সাবান ৯২৫ হিজরী/ ১২ই আগস্ট ১৫১৯খ্রিঃ নির্মাণ করেন।

পরিচয়হীন মসজিদ

কানিংহাম শিলালিপিটি খুজে পান এবং পাঠোদ্ধার করেন ব্লকম্যান। সোনারগাঁয়ের নিকট সাদীপুরে একটি ধ্বংসস্তুপ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। শিলালিপিটি থেকে জানা যায় মসজিদটি Drinking house এর পার্শ্বে। এটি তাকিউদ্দীন কর্তৃক নির্মিত। আইনউদ্দীনের পুত্র ৯২৯ হিজরী ১৫২৩খ্রীঃ সুলতান নাসিরুদ্দীন নসরত শাহের সময়। কিন্তু Drinking house এবং মসজিদের অবস্থান নির্ণয় করা যায় নি।

শিলালিপিটি আরবী নাসখ রীতিতে লেখা হয়েছে। বর্তমানে শিলালিপিটি জাতীয় যাদুঘরে রক্ষিত আছে।

পরিচয়হীন মসজিদের শিলালিপি

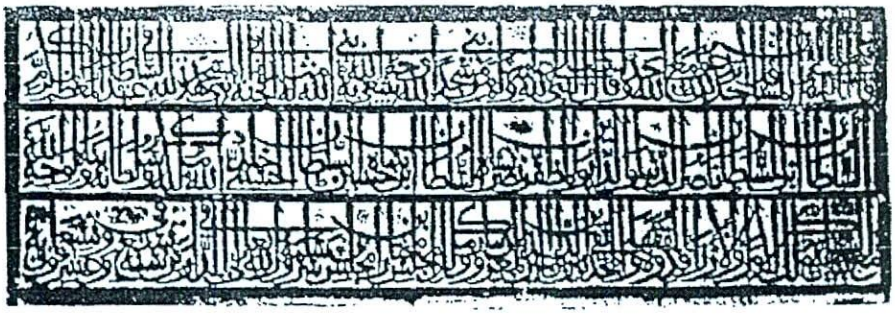

قال الله تعالى وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا - وقال النبي
صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا لله يبتغى به وجه الله
بنى الله له بيتا مثله في الجنة - بنى هذا المسجد لله وعهد
السلطان المعظم المكرم -

السلطان ابن السلطان ناصر الدنيا والدين ابو المظفر نصرت شاه
السلطان الحسينى خلد الله ملكه وسلطانه وبناه لوجه الله
مع لبيت السقاية مالك الامراء والوزراء قدوة الفقهاء
والمحدثين تقى الدين ابن عين الدين المعروف بارك ملك ا
لمجلس بن مختار المجلس ابن سرور - سلمه الله تعالى
في الدارين في سنة تسع وعشرين وتسعمائة

Dhaka University Institutional Repository

অনুবাদ

(১) পরম করুণাময় আল্লাহ বলেন, " নিশ্চয়ই মসজিদ আল্লাহর। সুতরাং আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না আল্লাহর আর্শীবাদ মহানবী (সঃ) বলেছেন, যে আল্লাহর জন্য একটি মসজিদ তৈরী করেন। আল্লাহ তার উপর খুশী হয়ে স্বর্গে তার জন্য সেরূপ একটি বাড়ী তৈরী করে দেন।"

(২) সুলতানের পুত্র সুলতান নাসির-আল দুনিয়া ওয়ালদীন-আবুল- মুজাফফর নসরত শাহ, এর সুলতান হোসেন শাহ এর পুত্র। আল্লাহ সুলতানের রাজত্ব এবং সার্বভৌমত্ব চিরস্থায়ী করুন এবং একই সাথে একটি ড্রিংকিং হাউজের।

(৩) আইন আল দীন এর পুত্র তাকী আল দীন যিনি ওয়াজির এবং আমীরদের প্রধান আইনজ্ঞদের এবং হাদীসবেত্তাদের প্রধান আল্লাহর বিশেষ আর্শীবাদ প্রাপ্ত হয়ে নির্মান করেন। যিনি সারওয়ার এর পুত্র মুঘতার আল মজলিশ এবং পুত্র তার মালিক আল মজলিশ। আল্লাহ তাকে দুনিয়ায় এবং আখেরাতে রক্ষা করুণ। ৯২৯ হিজরী (১৫২২-২৩ খ্রি:) নির্মিত)।[১৫]

Dhaka University Institutional Repository

ঈশা খাঁনের কামানের শিলালিপি

দেওয়ান মনোয়ার খাঁনের বাগের একটি ছোট গ্রামে মাটি খননের সময় কিছু লোক এই কামানটি উদ্ধার করেন। H.E. স্টেপেল্টন ১৯০৯ সালে ওটি আবিষ্কার করেন। গ্রামটি নারায়নগঞ্জের ৭ মাইল ১১·১ কি·মি· উত্তর পূর্বে অবস্থিত । এটি বন্দর থানার মদনপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত। এই গ্রামে ঈশা খাঁনের নাতি মনোয়ার খাঁনের বসবাস ছিল। কামানের উপর খোদিত আছে সাল ১০০২ বাংলা সন।

শিলালিপিটি বাংলায় লেখা–

সরকার শ্রীযুক্ত ইছা খান
মসনদালি হিজরী ১০০২।

সরকার শ্রীযুক্ত ইছা খাঁ–

– ন মসনদান্তি সন হাজার

১০০২.[১৬]

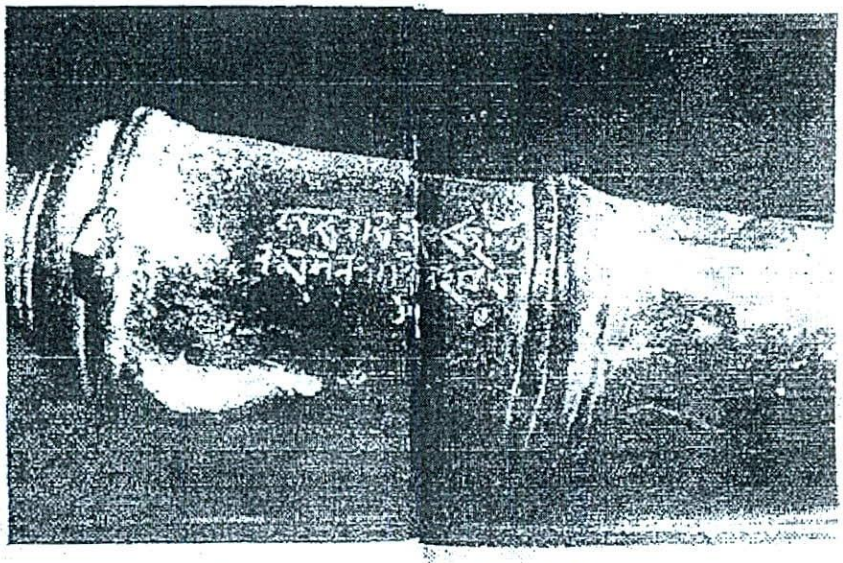

ঈসা খানের কামানের শিলালিপি

কামানের আর কোন অংশে আর কোন শিলালিপি পাওয়া যায় নি। বর্তমানে কামানটি বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘরে রক্ষিত আছে।

Dhaka University Institutional Repository

চাপাতলী সেতু

নারায়ণগঞ্জ হতে ৭ মাইল উত্তর পূর্বে মনোয়ারখার বাগ এলাকায় চাপাতলী সেতুটি অবস্থিত। ৭টি কামান ১৯০৯ সালে এই গ্রামের নিকটবর্তী স্থান হতে উদ্ধার করা হয়েছে।[১৭]

চাপাতলী সেতুর গায়ে পাথরের শিলালিপিটি খোদিত ছিল। শিলালিপিটি থেকে জানা যায় জনৈক লালা রাজলাল এ সেতা টি নির্মান করেন।

ফার্সী ভাষায় লেখা এই শিলালিপিটি ৪টি পংক্তিতে বিভক্ত আঞ্চলিক রীতিতে লিখিত বর্তমানে শিলালিপিটি ঢাকা যাদুঘরে রক্ষিত আছে।

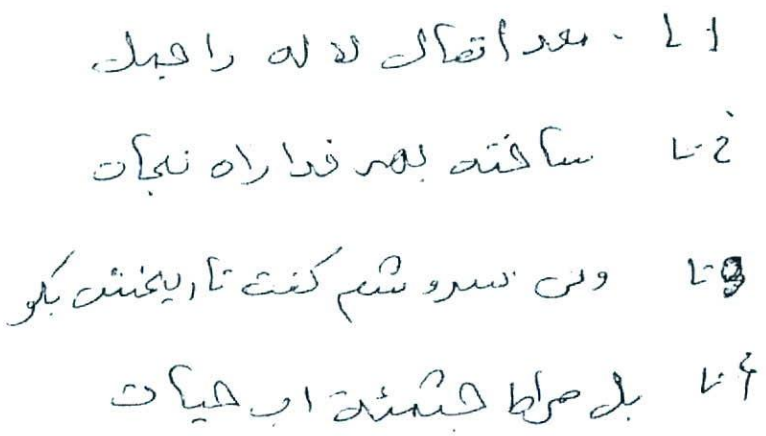

অনুবাদ ঃ

লালা রাজমাল, (নামের এক) প্রজাবৎসল (ব্যক্তি) আল্লাহ্‌র নামে মানুষের কল্যানে এ পথ নির্মান করেন সদাপ্রবহময় এক জলাধারার (জীবন প্রদান কারী) উপর এটা একটি সেতু নির্মান কাল জানা যায় না।

Dhaka University Institutional Repository

আব্দুল হামিদ শাহের মসজিদ

সোনারগাঁয়ের গোয়ালদী গ্রামে একটি মুগল মসজিদে এই পাথরের শিলালিপিটি পাওয়া গিয়েছে। শিলালিপি থেকে জানা যায় জনৈক আব্দুল হামিদ মসজিদটির নির্মাতা মুঘল বাদশাহ্ আওরঙ্গজেবের সময় মসজিদটি ১১১৭ হিজরী ১৭০৫ খ্রীঃ নির্মিত।

শিলালিপিটির প্রথম দুই পংক্তি আরবী 'সুলজ' রীতিতে এবং পরবর্তী দুই পংক্তি ফার্সী নাস্তালিক রীতিতে লিখিত।

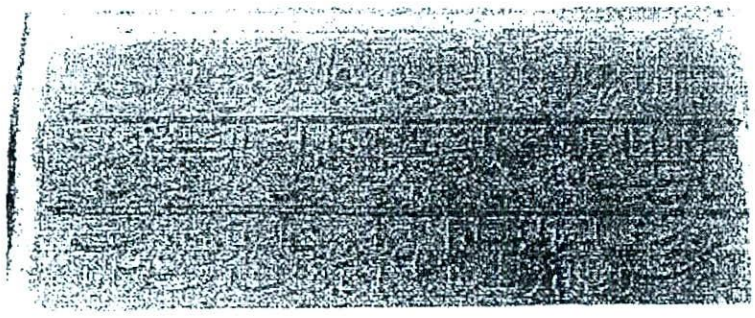

আব্দুল হামিদ শাহের মসজিদের শিলালিপি

قال الله تعالى - وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا
قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا في الدنيا بنى الله
تعالى [له] سبعين قصرا في الجنة —

بدور شاه عالم كيس عادل -- خوايك بيت الصلوة اهل دل شد
سرورش از سال اثنا عشر الدبدار -- بنا گاه نیک مسلمین شد
ازعبد الحمید شاه

Dhaka University Institutional Repository

অনুবাদ

(১) পরম করুণাময় আল্লাহ বলেন, " মসজিদ আল্লহর ঘর সুতরাং আল্লাহ ব্যাতিত অন্য কারো উপাসনা করো না।

(২) আল্লাহর বিশেষ আর্শীবাদ এবং করুণা প্রাপ্ত হয়রত মুহাম্মদ (সঃ) বলেন, " যে পৃথিবীতে একটি মসজিদ তৈরী করে আল্লাহ তাঁর জন্য স্বর্গে সত্তরটি প্রাসাদ তৈরী করেন।

(৩) এ প্রার্থনা স্থান ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিতের জন্য নির্মান করেন।

(৪) স্বগীয় ধ্বনি থেকে প্রাপ্ত তথ্যথেকে বুঝা যায় এই মসজিদ নির্মান করেন আব্দুল হামিদ শাহ্ । এভাবে এটি একটি মুসলমানদের (ধর্ম মন্দির) মসজিদের পরিণত হয়।[১৮]

Dhaka University Institutional Repository

গরীবুল্লাহর মসজিদ

সোনারগাঁয়ের বারী মজলিশে গরীবুল্লাহর মসজিদের কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথের উপর একটি শিলালিপি আছে। কানিংহাম শিলালিপির তারিখ ১১৮২ হিজরী ১৭৬৮ খ্রীঃ বলেছেন। কিন্তু আমরা দেখি কানিংহামের দেওয়া তারিখটি ভুল। এখনও শিলালিপিটি আগের স্থানেই গ্রোথিত আছে। হতে ১১৫২ হিজরী (১৭৩৯-৪০ খ্রীষ্টাব্দ) এবং শিলালিপি বিশারদ এম. এ. কাদের এই তারিখটি সঠিক বলে মত দেন।

শিলালিপিটির ১ম ভাগ আরবী নাসখ রীতিতে লিখিত এবং পরর্বতীভাগ ফার্সী নাস্তালিক রীতিতে লিখিত।[১৯]

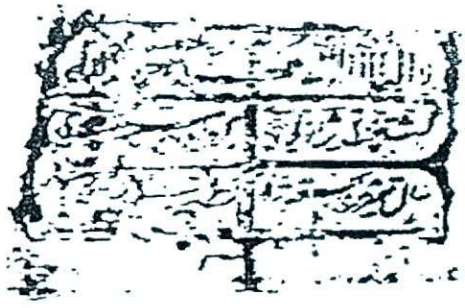

গরীবুল্লাহ মসজিদের শিলালিপি

لا اله الا الله محمد رسول الله

گشت چون توفیق ازلی شامل گرد این مسجد غریب الله بنا

سال تعمیرش بجستم از خرد گفت هاتف خانه طاعت بجا ی

অনুবাদ

আল্লাহর কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর প্রেরিত রসূল, ঐশ্বরিক কৃপা প্রাপ্ত হয়ে গরীবুল্লাহ এই মসজিদটি নির্মান করেন। যখন এই মসজিদের নির্মাণ কাজে নিযুক্ত ছিল তখন একজন জ্ঞানী ব্যক্তি হতে একটি অলৌকিক স্বর বলে এই গৃহের জায়গাটি আল্লাহর মসজিদের নির্মাণ তারিখ ১১৫২ হিজরী/ ১৭৩৯-৪০ খৃঃ গৃহের জায়গা সর্বোতভাবে আল্লাহর ১৯৫২ হিজরী (১৭৩৯খ্রীষ্টাব্দ) নির্মিত।

Dhaka University Institutional Repository

কদমরসূল ইমারত নবীগঞ্জ

কদমরসূল ইমারতটিতে দু'টি শিলালিপি আছে একটিতে লেখা আছে ইমারতটির নির্মাতার নাম (সাদাত খাঁন) গোলাম নবী ১১৯১ হিজরী / ১৭৭৮-৭৯ খ্রীঃ।

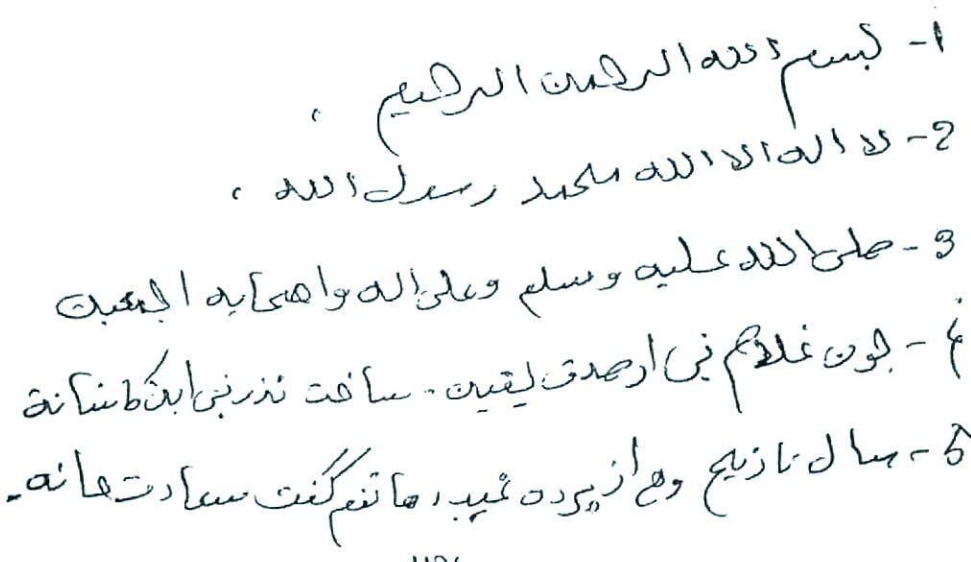

অনুবাদ

(১)পরম করুণাময় আল্লাহর নামে আরম্ভ করা হল।

(২)আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ।

(৩) আল্লাহর আর্শীবাদ তার উপর। তার পরিবারের এবং সাহাবীদের উপর বর্ষিত হোক।

(৪)যখন গোলাম নবী তার বিশ্বাসে অটুট মুহাম্মদ (সঃ) -এর স্মরণে এই ইমারতটি নির্মাণ করেন।

(৫)অলৌকিক ধ্বনি ঘোষণা করে এর নির্মাণ তারিখ ১১৯১ হিজরী/ ১৭৭৮-৭৯ খ্রিস্টাব্দ।[২০]

Dhaka University Institutional Repository

কদমরসূল ইমারতের শিলালিপি

প্রবেশ পথের উপর শিলালিপিটি গ্রোথিত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। শিলালিপি থেকে জানা যায় গোলাম নবীর তৃতীয় পুত্র গোলাম মোহাম্মদ প্রবেশ তোরণটি নির্মাণ করেন। শিলালিপি অনুযায়ী তোরনটি ১২২০ হিজরী/ ১৮০০-০৬ খ্রিস্টাব্দ নির্মিত।[২১] শিললিপিটিতে ৪টি পংক্তি ফার্সী, নাস্তালিক রীতিতে লিখিত বর্তমানে ঢাকা জাতীয় জাদুঘরে রক্ষিত আছে।

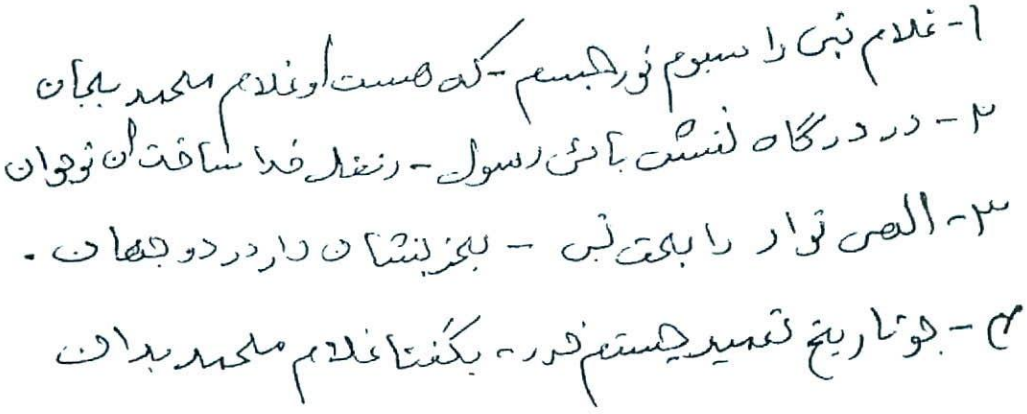

অনুবাদ

(১) গোলাম নবীর তৃতীয় পুত্র তিনি মুহাম্মদ (সঃ) এর দাস।

(২) মুহাম্মদ (সঃ) এর পায়ের ছাপযুক্ত বেদীটি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য তৈরী।

(৩) হে আল্লাহ আপনি তাঁর সম্মান দুনিয়া এবং আখেরাতে রসূলের উছিলায় বজায় রাখবেন।

(৪) যখন আমি ইমারতের নির্মাণ কাল জানতে চাই তখন জ্ঞানী বলেন, "জেনে রাখ, এটা গোলাম মুহাম্মদের নির্মিত।

(গোলাম মুহাম্মদ কর্তৃক দেওয়া তারিখ সঠিক নয় কারণ শিলালিপিতে তার বাবার দেওয়া তারিখ লিপিবদ্ধ আছে।)

Dhaka University Institutional Repository

দারু গোলা মসজিদ

দারুগোলা মসজিদটি শেখ সাহেবের মসজিদ নামে পরিচিত। এখানে প্রদত্ত শিলালিপিটি বাংলায় লিপিবদ্ধ শিলালিপি থেকে জানা যায় ১২৭২ বাংলা /১৮৬৫ খ্রিঃ মুন্সী গোলাম মহিউদ্দীনের তত্ত্বাবধানে, যিনি মরহুমা মজলিশন্নেছা বিবির তত্ত্বাবধায়ক এ মসজিদ নির্মিত, তিনি মৃত মজলিশন্নেছা বিবির তত্ত্বরধায়ক ছিলেন; স্থানীয় ভাবে জানা যায় মজলিশন্নেছা বিবি শেখ সাহেবের স্ত্রী ছিলেন।

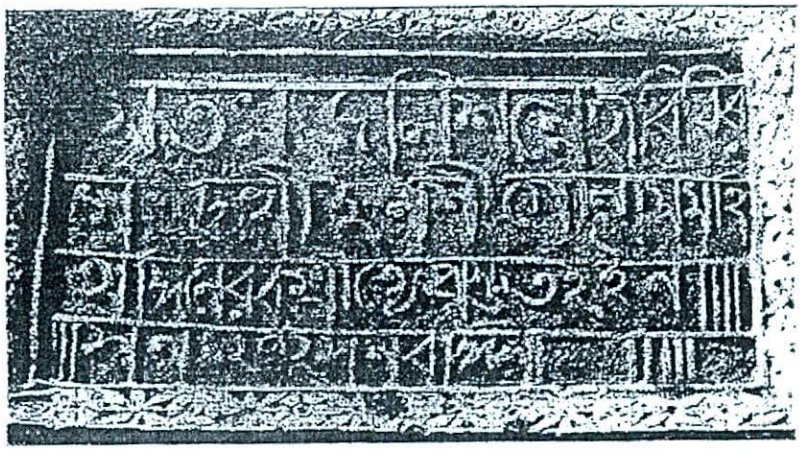

দারুগোলা মসজিদের শিলালিপি

শিলালিপিতে চারটি পংক্তি আছে।

মৃত মজলিশন্নেছা বিবির

মত দুখী মুন্সী গোলাম মহি

– অদ্দিনের কত্রীত্বে প্রস্তুত হইল

সন ১২৭২ সন বাঙ্গালা।[২২]

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. Karim, Abdul. ***Corpus of the Arabic and Persian Inscriptions of Bengal,*** Asiatic Society of Bangladesh Dhaka, 1992, pp. 110
২. ***Ibid.*** pp. 110
৩. ***Ibid.*** pp. 197
৪. Begum, Ayesha. Inscriptions' ***Sonargaon-Panam,*** Dhaka, Asiatic Soceity of Bangladesh, 1997 pp. 152.
৫. বাস্তব পর্যবেক্ষণ. ১৭ মে, ২০০১
৬. Begum, Ayesha. ***Op.cit.*** pp. 152
৭. ***Ibid,*** pp. 153
৮. Karim, Abdul. ***Op.cit.*** pp. 275
৯. ***Ibid.*** pp. 275
১০. ***Ibid.*** pp. 305
১১. Begum, Ayesha. ***Op.cit.*** pp. 155
১২. ***Ibid.*** pp. 155
১৩. Karim, Abdul. ***Op.cit.*** pp. 329
১৪. Begum, Ayesha. ***Op.cit.*** pp. 160
১৫. Karim, Abdul. ***Op.cit.*** pp. 478
১৬. Begum, Ayesha. ***Op.cit.*** pp. 163
১৭. Begum, Ayesha. ***Op.cit.*** pp. 163
১৮. Karim, Abdul. ***Op.cit.*** pp. 509
১৯. Karim, Abdul. ***Op.cit.*** pp. 515
২০. Begum, Ayesha. ***Op.cit.*** pp.. 167
২১. ***Ibid.*** pp. 166
২২. ***Ibid.*** pp. 167

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায়

উপসংহার

নারায়নগঞ্জের ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় নারায়নগঞ্জ তথা সোনারগাঁ দাক্ষিন-পূর্ব বঙ্গের একটি সমৃদ্ধিশালী বন্দর ছিল। প্রাচীনকাল হতেই দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গের ইতিহাসের সাথে সোনারগাঁয়ের ইতিহাস অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে। নদীর গতিপথ পরিবর্তন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, একাধিকবার প্রশাসনিক কেন্দ্রের রদবদল এবং শাসকদের অবহেলা ইত্যাদি কারণে কালের বিবর্তনে নারায়নঞ্জের স্বীয় অতীত ঐতিহ্য ও জৌলুস হারিয়ে সাধারণ জেলায় পরিণত হয়। প্রাচীন কাল থেকেই বাংলায় অনেক ইমারত নির্মিত হয়েছিল বলে ধারণা করা হয় কিন্তু বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে এসব ইমারত কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। ইতিহাস পুনর্গঠনের অন্যতম উপাদান স্থাপত্য। উত্তরবঙ্গে এবং দক্ষিণবঙ্গে কিছু কিছু বৌদ্ধ বিহার পাওয়া গেলেও দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গের রাজধানী সোনারগাঁ তথা নারায়নগঞ্জে গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ নির্মীত সমাধি ব্যতীত এরূপ প্রাচীন কোন নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া যায়নি। কিন্তু শিলালিপি এবং মুদ্রা ইত্যাদি পাওয়া গেছে যা দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গের ইতিহাস পুনর্গঠনে সহায়তা করেছে। দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গের শেষ হিন্দু শাসক দনুজরায় দশরথদেব বিক্রমপুর হতে রাজধানী সোনারগাঁয়ে স্থানান্তরিত করেন।

ত্রয়োদশ শতকে মুসলিমদের আগমন বাংলার ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। মুসলিম শাসকরা সোনারগাঁকে প্রশাসনিক কাঠামোর কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলে। মুসলিম শাসকদের আগমনে বাংলার সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়। এতদিন যে উপাদান গুলো বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিকে গড়ে তুলেছিল তা ছিল একান্তই ভারতীয় হিন্দু বৌদ্ধ উপাদান। মুসলিমদের বয়ে আনা সাংস্কৃতিক উপাদানের সাথে বাংলার প্রচলিত উপাদানের সংমিশ্রন ঘটায় বাংলায় এক নতুন ধারার স্থাপত্য বিকাশ লাভ করে। এ অঞ্চলে মুসলিম শাসকদের আগমনের অনেক পূর্বেই সুফী সাধকগণ ইসলাম

Dhaka University Institutional Repository

ধর্ম প্রচারের জন্য আসেন। ইসলামের সাম্য মৈত্রীর বানীতে মুগ্ধ হিন্দুরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে বাংলায় তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এসময় মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলার সর্বত্র মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলিম শাসকগণ তাদের সাথে যে নির্মাণ কৌশল বয়ে এনেছিলেন তার সাথে এদেশের নির্মাতা ও কারিগররা পরিচিত ছিল না। এই গুলোর মধ্যে খিলান, গম্বুজ নির্মাণ পদ্ধতি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বখতিয়ার খলজীর বঙ্গ বিজয়ের অনেক পরে মুসলিম শাসকরা সোনারগাঁ তাদের শাসনাধীনে আনেন। ইলিয়াসশাহী বংশের শেষ শাসক জালাল উদ্দীন ফতেহ শাহের শাসনামলে সোনারগাঁর ফতেশাহ জামে মসজিদ (১৪৮৪ খ্রি.) প্রতিষ্ঠিত হয়। জামে মসজিদ সাধারণত গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কেন্দ্রে নির্মিত হত। এ মসজিদটি এক গম্বুজ বিশিষ্ট একটি আয়তাকার মসজিদ। সুলতানী আমলের বক্র কার্নিশ বিশিষ্ট মসজিদের যে ধারা বিকশিত হয়েছিল তার পরিপূর্ণ বিকশিত রূপটি এই মসজিদে পরিলক্ষিত হয়। ফতেশাহ মসজিদটি বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য ধারন করে আছে যার প্রভাব বাংলার পরবর্তী মসজিদ স্থাপত্যে লক্ষ করা যায়। হোসেনশাহী শাসন আমলে সোনারগায়ের গোয়ালদী মসজিদ এক গম্বুজ বিশিষ্ট একটি বর্গাকার মসজিদ নির্মিত হয়। এই মসজিদের দেয়াল স্থুলাকার এবং সুউচ্চ গম্বুজ নির্মাণে যে রীতিটি অনুসৃত হয়েছে তা 'বাংলা পেনডেনটিভ' নামে পরিচিত। সুলতানী আমলে সারা বাংলায় বিকশিত স্থাপত্যের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে এই বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ইটের সার্বজনীন ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। বাংলায় পাথরের স্বল্পতার জন্য সাধারণত পাথরের সীমিত ব্যবহার লক্ষণীয়। যে সব ইমারতে পাথরের ব্যবহার দেখা যায় তা খুব সম্ভব পূর্ববর্তী ইমারত হতে সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া ঢালু ছাত, বক্রাকার কার্নিশ, পুরু দেয়াল, ইমারতের চারকোণে অনুচ্চ স্থুল অষ্টাভুজাকার ব্যান্ডযুক্ত পার্শ্ববুরুজ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য বাংলার মুসলিম স্থাপত্যে লক্ষ করা যায়। পার্শ্ববুরুজের এই বৈশিষ্ট্যটি মূলত গ্রাম বাংলার কুঁড়েঘরের বাঁশের চারটি খুঁটি থেকে গৃহীত। দ্বি-কেন্দ্রিক কৌণিক খিলান, জুল্লায় দন্ডায়মান স্তম্ভের ব্যবহার, প্রবেশ পথের বরাবর সমসংখ্যক মিহরাব, অনুচ্চ গোলায়িত গম্বুজ, ছাত নির্মাণে পান্দানতিভ, স্কুইঞ্চ, ভল্টের

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবহার, অলংকরণ হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে টেরাকোটা অলংকরণ, ঝুলন্ত শিকলঘন্টা নকশা, অগভীর খোদাই নকশা, মিনা করা টালী, অ্যারাবেস্ক ও জ্যামিতিক নকশা ইত্যাদি বাংলার সুলতানী স্থাপত্যে দেখা যায়। এসময়ে নির্মিত ইমারত গুলোতে শাসকদের অর্থনৈতিক অবস্থা, রুচিবোধ এবং সৌন্দর্য প্রিয়তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সুলতানী শাসকদের স্বাধীন স্বতন্ত্র সত্তার বহি:প্রকাশ ঘটে সে সময়ে নির্মিত স্থাপত্য সমূহে। মুঘল শাসন আমলের পূর্ব পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত ছিল। মুঘল শাসন আমলের প্রথমদিকে বাংলায় মুগলদের নির্মিত তেমন কোন স্থাপত্য পরিলক্ষিত হয় না। পরবর্তীতে মুগল সুবাদারদের তত্ত্বাবধানে বাংলায় তাদের স্থাপত্য গড়ে উঠে। সুলতানী আমলে বাংলায় সুলতানী স্থাপত্যের একটা স্বাধীন স্বতন্ত্র ধারা দেখা যায় কিন্তু মুঘল আমলে নির্মিত ইমারতে সেই ধারাটি অব্যাহত থাকে না। এসময় রাজকীয় মুঘল স্থাপত্যের অনুকরণে এখানে বিভিন্ন ইমারত নির্মিত হয়। সুলতানী আমল থেকে মুঘল আমলে উত্তরণের সময় যুগসন্ধি লগ্নে সারা বাংলায় কিছু মসজিদ নির্মিত হয়েছে। এই মসজিদ গুলোতে সুলতানী এবং মুঘল উভয় আমলের স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। নরায়নগঞ্জ জেলার সোনারগাঁ উপজেলার মুয়াজ্জেমপুর গ্রামে এই ধরণের বৈশিষ্ট্য মন্ডিত ছয় গম্বুজ বিশিষ্ট একটি আয়তকার মসজিদ নির্মিত হয়েছে। এই মসজিদটিতে একদিকে যেমন সুলতানী আমলের বহুখাজ বিশিষ্ট্য খিলান, পান্দান্তিভের ব্যবহার, সুউচ্চ গম্বুজ, দেখা যায় তেমনি অষ্টভুজাকার পার্শ্ববুরুজ, মসজিদের ফাসাদে এবং বহির্ভাগের সম্মুখে দেয়ালে আয়তাকার প্যানেল এবং প্যানেলের মধ্যে খিলান নকশা ইত্যাদি মুঘল আমলের সাধারণ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। এই মসজিদের মাঝখানের পিলার দুটির ভীত অষ্টটভুজাকার উপরের দিকে গোলায়িত। এই মসজিদটি সম্ভবত মুঘল শাসন আমলের প্রথম দিকে নির্মিত হয়েছে। তাই এই মসজিদে সুলতানী এবং মুঘল স্থাপত্য রীতির সংমিশ্রন পরিলক্ষিত হয়। মুগল আমলে নির্মিত ইমারতে যে সাধারণ বৈশিষ্ট্য গুলো দেখা যায় সেগুলো বেশীরভাগই তিন গম্বুজ বা এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ, চতুর্কেন্দ্রিক খিলানের ব্যবহার, পিপার উপর নির্মিত সুডৌল বৃত্তাকার গম্বুজ, গম্বুজ নির্মাণে বর্গাকার অংশ এবং

Dhaka University Institutional Repository

গম্বুজের বৃত্তের মাঝখানে অবস্থান্তরের পর্যায়ে অগভীরভাবে সংস্থাপিত কৌণিক ভল্টের ব্যবহার, সমান্তরাল কার্নিশ, আস্তরযুক্ত দেয়াল, দেয়ালে টেরাকোটা অলংকরণের পরিবর্তে ছোট ছোট বর্গাকার এবং আয়তাকার অবতল প্যানেল। অধিকন্তু পদ্মপাঁপড়ির মারলন নকশা, চক্রাকার ফুল-লতা-পাতার অনুকৃতি, এবং গম্বুজের শীর্ষে ফিনিয়েলের ব্যবহার ইত্যাদি। মুঘল পরবর্তী সময়ে নারায়নগঞ্জ জেলায় দেলোয়ারদি মসজিদ, দরিকান্দি মসজিদ, বাড় মজলিস মসজিদ, বালিয়া দিঘির পাড় মসজিদ নির্মিত হয়েছে। এই মসজিদগুলো সম্ভবত মুঘল পরবর্তী জমিদারী শাসন আমলে নির্মিত হয়েছিল। এই মসজিদ গুলোর মধ্যে বিশেষ করে দেলোয়ারদি মসজিদ এবং বারি মজলিস মসজিদ আয়তনে খুবই ছোট। এই মসজিদ গুলো ছিল খুব সম্ভব পরিবার কেন্দ্রিক মসজিদ এবং এখানে চারজনের বেশী মানুষের স্থান সংকুলান হত না। দরিকান্দি মসজিদ বর্তমানে সম্পূর্ণ ভঙ্গুর অবস্থায় বিদ্যমান। দেলোয়ারদি মসজিদও বর্তমানে পরিত্যক্ত অবস্থায় বিদ্যমান। এই মসজিদটিও অদূর ভবিষ্যতে কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে বলে অনুমিত হয়। বারিমজলিস মসজিদ এখনও বিদ্যমান থাকলেও স্থানীয় সংস্কারকারীদের দ্বারা সংস্কার করায় এর আদি বৈশিষ্ট্য হারাতে বসেছে। মুগল আমলে রাজধানী ঢাকার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করা এবং যাতায়াতের সুবিধার জন্য ঢাকার আশেপাশে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে কয়েকটি দুর্গ ও সেতু নির্মিত হয়। অবস্থান গত দিক হতে নারায়নগঞ্জের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী ছিল তাই হাজীগঞ্জ ও সোনাকান্দায় জলদুর্গ নির্মিত হয়। নির্মাণ কৌশল এবং বৈশিষ্ট্যগত দিক হতে এই জলদুর্গ দুটির সাথে মুন্সিগঞ্জের ইদ্রাকপুর দুর্গের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে। যাতায়াতের সুবিধার জন্য মুঘল সুবাদারগণ মুন্সিগঞ্জ সোনারগাঁ, এবং ঢাকায় কয়েকটি সেতু নির্মাণ করেন। ব্যবসা বাণিজ্য প্রসার ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর করার জন্য নারায়নগঞ্জ কয়েকটি বৃহৎ সেতু নির্মাণ করা হয়। যেমন, পানাম সেতু, চাপাতলির সেতু, পাগলা সেতু ইত্যাদি। পানাম সেতুটি স্তম্ভের উপর চর্তুকেন্দ্রিক খিলানের মাধ্যমে নির্মিত হয়েছে। মুন্সিগঞ্জের মীরকাদিম সেতুর সাথে সোনারগাঁয়ের পানাম সেতুর বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য থাকায় এই দুটি সেতু একই

Dhaka University Institutional Repository

সময়ে নির্মিত হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। মুঘল আমলে নারায়নগঞ্জের দুর্গ এবং সেতু নির্মিত হওয়ায় ধারণা করা যায় তখন নারায়নগঞ্জের অবস্থানগত গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী ছিল। নারায়নগঞ্জের ইতিহাস ও স্থাপত্য পর্যালোচনায় দেখা যায় অবস্থানগত বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে সোনারগাঁ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থিত হওয়ায় প্রাচীন আমল হতে শুরু করে মুঘল আমল পর্যন্ত এই স্থানের কমবেশী প্রশাসনিক প্রাধান্য ছিল। নারায়ণগঞ্জের প্রত্নবস্তু, বিভিন্ন ধরণের স্থাপত্য নিদর্শন এ অঞ্চলের উন্নত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার স্বাক্ষ্য বহন করে। কালের গতিতে নারায়নগঞ্জের অনেক স্থাপত্য নিদর্শনই বিলীন হয়ে গেছে। বর্তমানে যে অল্পসংখ্যক নিদর্শন টিকে আছে সেগুলো সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সংস্কার ও নবায়নের ব্যবস্থা করা উচিত। যথাযথ সংরক্ষণের মাধ্যমে একদিকে যেমন এ অঞ্চলের স্থাপত্য বিষয়ে ভবিষ্যতে পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণার সুযোগ অবারিত থাকবে তেমনি অতীত ঐতিহ্যের স্মারক দর্শনীয় নিদর্শনগুলো ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা পাবে।

Dhaka University Institutional Repository

পরিভাষা

আইল — স্তম্ভ সারি দ্বারা বিভক্ত মধ্যবর্তী লম্বালম্বি অংশ বা পথ। আইল সাধারণতঃ কিবলা দেয়ালের সমান্তরালে নির্মিত হয়।

আরকেড — স্তম্ভ বা দেয়ালের অংশ দ্বারা বহনকৃত নির্মিত খিলান সারি।

আরকুয়েট — নির্মাণ কার্য সম্পাদনের জন্য খিলানকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয় এই পদ্ধতিতে।

কিউপোলা — ক্ষুদ্র গম্বুজ।

কুলঙ্গি : দেয়ালে অন্তঃপ্রবিষ্ট অবতল খোপ।

খিলান : কোন উম্মুক্ত স্থানকে পার্শ্ববর্তী দুটি স্তম্ভ বা দেয়ালের সাথে সংযোগ সাধনের উদ্দেশ্যে উম্মুক্ত স্থানের উপর বক্রাকার বা এইরূপ কোন আকারের স্থাপত্য কৌশল এমনভাবে নির্মিত হয় যে তার উপরস্থ চাপ কর্ণের রেখায় নিচের দেয়াল বা স্তম্ভের উপর পড়ে। সাধারণত দরজা ও জানালার উপর নির্মিত এইরূপ স্থাপত্য অঙ্গকে খিলান বলে।

খিলান, দ্বিকেন্দ্রিক : দুই বলয় বিশিষ্ট খিলান, দুই কেন্দ্র থেকে উত্থিত বৃত্তাংশের খিলান।

খিলান, চতুর্কেন্দ্রিক : চার বলয় বিশিষ্ট খিলান, চারটি কেন্দ্র থেকে উত্থিত বৃত্তাংশের খিলান।

গম্বুজ — কোন কক্ষ বা ইমারতের কাঠামোর উপর নির্মিত অর্ধাবৃত্তাকার বা এইরূপ আকৃতি বিশিষ্ট ছাদকে গম্বুজ বলে।

জুল্লাহ — কিবলার দিকে ছাদ বিশিষ্ট নামাজের স্থান।

Dhaka University Institutional Repository

টেরাকোটা — পোড়ামাটির ফলকে ফুল, লতা-পাতা দেবদেবী, নারী-পুরুষ, জীব-জন্তু জ্যামিতিক নকশা প্রভৃতি উৎকীর্ণ অলংকরণ।

পলকাটা — শিরা বিন্যাস, গোলাকার ফুলন।

পান্দান্তিভ — বর্গকার কাঠামোর উপর বৃত্তাকার গম্বুজ ধরে রাখার জন্য বর্গের কোণগুলোতে নির্মিত ত্রিভুজাকার স্থাপত্যিক সংগঠন।

প্যানেল — দেয়াল গাত্র বা দরজা গাত্রে আয়তাকার বর্গাকার অংশ বা বিভাজন বিশেষ। এগুলো সমতল, স্ফীত, কিছুটা অন্তপ্রবিষ্ট বা নকশাকৃত হতে পারে।

প্রদীপ কুলঙ্গি — প্রদীপ স্থাপনের জন্য দেয়ালে অন্তঃপ্রবিষ্ট খোপ।

ফাসাদ — ইমারতের সম্মুখভাগ।

ফিনিয়াল — বুরুজ বা গম্বুজের ক্রমহ্রাসমান সূচালো শিরোচূড়া।

বুরুজ — টাওয়ার, মিনার, স্তম্ভ। স্বাধীনভাবে দন্ডায়মান ইমারত বা অন্য ইমারতের অংশ হতে পারে। ইমারতের কোণাকে মজবুত করার জন্য চারকোণে বৃত্তাকার, বর্গাকার বা অষ্টভুজাকার মোটা ও শক্তিশালী খুঁটিকে বুরুজ বলে।

বে — খিলান পথ, ছাদ অথবা মেঝের ভাগ।

ব্যাসাল্ট — কষ্টিপাথর।

মিনার — মসজিদ সংলগ্ন বা মসজিদের বাইরে নির্মিত উঁচু বুরুজ। এই বুরুজ হতে নামাজ পড়ার জন্য আহ্বান করা হয়।

মিম্বার — বক্তৃতা মঞ্চ, ইমাম যার উপর দাড়িয়ে খুৎবা পাঠ করেন।

মিহরাব — মসজিদের কিবলা দেয়ালে স্থাপিত বৃহৎ কুলঙ্গি।

Dhaka University Institutional Repository

মোটিফ	নকশার মূল বিষয়, কোন প্রধান উপাদান বা বৈশিষ্ট্যকে বিকশিত করে দেখানো।
রিওয়াক	কিবলা দিক ছাড়া অবশিষ্ট তিন দিকে কোঠা বিশিষ্ট আবেষ্টনী প্রাচীর।
সাহন	জুল্লার বিপরীত পার্শ্বের উন্মুক্ত চত্বর।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

(English)

Ahmed, Nazimuddin. *Discover the Monuments of Bangladesh,* Dhaka, UPL, 1984.

Ahmed, Shamsuddin. *Inscriptions Of Bengal,* Vol-iv, Rajshahi, Verendra Research Museum, 1960.

Ahmed , Sharif. Uddin (ed.), *Dhaka Past Present Future,* Dhaka, The Asiatic Society of Bangladesh, 1991.

Ali, Mohammad Mohar. *History of the Muslims of Bengal* (1203-1757), Vol-1, Riyadh, Imam Muhammad IBN Sa'ud Islamic University, 1985.

Ali, Qazi Azhar. *District Administration in Bangladesh,* Dacca, National Institute of public Administration, 1978.

Asher Catherine. B *Architecture of Mughal India,* London, Cambridge University Press, 1992.

Bagchi, K. *The Ganges Delta.,* Calcutta, University press, 1914.

Batley, C. *The Design Development of Indian Architecture,* London, Alec Tiranti Ltd, 1960.

Bernier, F. *Travels in the Mughal Empire* 1656-1668 A.D. Revised by Archibold Constable, Westminister, 1891.

Bhattashali, N. K. *Coins and Chronology of the Early Independent Sultans of Bengal.*Cambridge, W. Heffer & Sons, 1922.

----------. *Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculptures in the Dacca Museum,* Dacca, Dacca Museum, 1929.

Dhaka University Institutional Repository

Blochmann, H. — *Contributions to the Geography and History of Bengal*, Muhammedan period, Calcutta, Asiatic Society,1968.

Brown , Percy. — *Indian Architecture (Buddhist and Hindu period),* Bombay, D. B. Taraporevala Sons & company Pvt. Ltd, 1949.

---------. — *Indian Architecture(Islamic period),* Bombay, D.B. Taraporevala Sons & Company Pvt. Ltd, 1942.

Burt. F.B. Bradly, — *The Romance of an Eastern Capital* London, Smith Elder & Co, 1906

Chatterji, S. P. — *Bengal In Maps,* Bombay, Orient Longmans, 1949.

Chakravarti, Dilip. Kumar. — *Ancient Bangladesh,* Dhaka, UPL, 1992.

Chowdhury, A. M. — *Dynastic History of Bengal,* Dacca, Asiatic Society of Pakistan, 1967.

Creswell, K. A. C. — *A Short Account of Early Muslim Architecture,* London, Penguin Books, 1958.

----------. — *Early Muslim Architecture* (EMA), VoL-1, Pts, 1&11 Oxford, Clarendon Press, 1969.

Cunningham, Alexander. — *Archaeological Survey of India,* Report of Archaeological tour in Bihar & Bengal in 1874-80, vol -xv, Delhi, Indological book house, 1878.

Dani, A. H. — *Muslim Architecture in Bengal,* Dacca, Asiatic Society of Pakistan, 1961.

----------. — *Dacca :A Record of its Changing Fortunes,* Dacca, Dacca Museum, 1962.

----------. — *Bibliography of the Muslim inscriptions of Bengal* (down to1538 AD), Dacca , Asiatic Society of Pakistan, 1957.

Dhaka University Institutional Repository

Datta, Bimal Kumar. *Bengal Temples,* New Delhi, Munshiram Monoharlal publishers Pvt. Ltd, 1975.

Datta, Kalikinkar. *Studies in the History of the Bengal Subah* (1740-70, Social & Economic) Vol-1, Calcutta, University of Calcutta, 1936.

Dept. of Archaeology (GOB), *Relevant Reports,* past and present.

Fazal, Abul. Eng. tran. H. Beveridge, *Akbarnama,* 3 vols, Delhi, Indian Reprint, 1972-73.

Ferguson, J. *History of Indian &Eastern Architecture,* New Delhi, Munshiram Manoharlal publishers Pvt. Ltd, 1972.

Habib, Irfan. *An Atlas of the Mughal Empire, Centre of Advanced Study in History,* Delhi, Aligarh Muslim University, 1982.

Habibullah, A. B. M. *The Foundation of Muslim Rule in India,* Allahabad, Central Book Depot, 1961.

Haque, Enamul. *Islamic Art Heritage of Bangladesh,* Dhaka, BNM, 1983.

Haque, Saif Ul and Others (ed.), *Pundranagar to Sherebanglanagar, Architecture in Bangladesh,* Dhaka, Chetona Sthapatya Unnoyon Society, 1997.

Hasan, S. M. *A Guide to Ancient Monuments of East Pakistan,* Dacca, Society for Pakistan Studies, 1970.

----------. *Mosque Architecture of pre Mughal Bengal,* Dacca, University press Ltd. 1979.

----------. *Muslim Monuments of Bangladesh,* Dhaka, Islamic Foundation, 1987.

Husain, A.B.M. (ed.), *Sonargaon-Panam,* Dhaka, Asiatic Society of Bangladesh, 1997.

----------, *Gaur-Lakhnauti,* Dhaka, Asiatic Society of Bangladesh, 1997.

Dhaka University Institutional Repository

Hunter, W.W. *Statistical Account of Bengal,* Vol-v, London, Trubness, Co, 1677.

Islam, Nurul (ed.), *District Gazetteers Dacca,* Dacca, Bangladesh Government press, 1975.

Islam, Sirajul (ed.), *History of Bangladesh,* (1704-1971), Dhaka, Asiatic Society of Bangladesh, 1992.

Karim, A. *Social History of the Muslims in Bengal (down to 1538 A.D),* Dacca, Asiatic Society of Pakistan, 1959.

----------. *History of Bengal (Sultani Period),* Dacca, Bangla Academy.1977.

----------. *History of Bengal (Mughal Period),* Vol-ll Rajshahi IBS,1995.

----------. *Corpus of the Arabic and Persian inscriptions of Bengal,* Dhaka, Asiatic Society of Bengal, 1992.

----------. *Murshid Kuli Khan and His Times,* Dacca, Asiatic Society of Pakistan, 1964.

Khan, M. Hafizullah. *Terracotta Ornamentation in Muslim Architecture of Bengal,* Dhaka Asiatic Society of Bangladesh, 1988.

List of Ancient Monuments in Bengal Calcutta, Public Workes Dept, Govt. of Bengal, 1896.

List of Protected Monuments and Mounds, Dhaka, Dept. of Archaeology, GOB, 1977.

Mc Cutchion, David J. *Late Mediaeval Temples of Bengal, Origin & Classification,* Calcutta, The Asiatic Society of Bengal, 1972.

Dhaka University Institutional Repository

Michell, G. (ed.), *Brick Temples of Bengal,* From the Archives of David Mcutch, New Jersy, Princeton University press, 1983.

Michell, G. (ed), *The Islamic Heritage of Bengal,* Paris, Unesco, 1984.

Majumdar, N.G *Inscriptions of Bengal,* Vol-iii, Rajshahi,Varendra Research Museum, 1929.

Majumdar, R.C (ed.), *The History Of Bengal Vol-1, Hindu Period,* Dacca, University of Dacca, 1963.

Majumdar, S.C. *Rivers of the Bengal Delta,* Calcutta University Press, 1942.

Martin, M. *The History, Antiquities, Topography and Statistics of Eastern India* vol-lll, Delhi, Cosmo Publications, 1976.

Mukharji, R. K. *The Changing Face of Bengal,* Calcutta, University of Calcutta, 1938.

Musa, Md, Abu. *Archaeological Survey Report Munshiganj, District*, Dacca, Dept. of Archaeology, 2000.

Nath, R. *History of Sultanate Architecture*, New Delhi, Abhinav Publications, 1978.

Qureshi, I. H. *The Administration of the Sultanate of Delhi,* New Delhi, Oriental Books Corporations, 1971.

Rahim, A. *Social Cultural History of Bengal,* Voll-l & ll, vol-I Karachi, 1963.Vol-ll Karachi, Pakistan Publishing House, 1967.

Rashid, H. *Geography of Bangladesh,* Dacca,

Dhaka University Institutional Repository

University press Ltd, 1977.

Rizvi,S. N. H. (ed.), *East Pakistan District Gazetteers*, Dacca, 1969

Rannell, James. *A Bengal Atlas,* London, Oxford University Press, 1780.

Sarkar , J. N (ed.), *The History of Bengal,* Voll-11, Muslim period, Dacca, The University of Dacca, 1972.

Sarkar , Jagadish. Narayan. *Islam in Bengal (13th to 19th century),* Calcutta, Ratna prakashan, 1972.

Salim, Allah. Eng. Tran. F. Gladwin, *Tawarikh- I Banglah*, Calcutta, The Asiatic Society, 1788.

Saraswati, S. K. *Architecture of Bengal,* Book 1, Calcutta, G. Bharadhaj & Co. 1976.

Satish, Grover. *Architecture of India,* 727-1707 A.D. New Delhi, Vikas Publishing House Pvt. Ltd, 1981.

Siddique, Yusuf . *Arabic and Persian Text of the Islamic Inscriptions of Bengal,* U.S. A, 1992

Stewart, Charles. *The History of Bengal,* Delhi, Oriental Publishers, 1971.

Sur, A. K. *History and Culture of Bengal,* Calcutta, Chakravarti Chatterji and Co. Ltd, 1963.

Tarafdar, M. R. *Husain Shahi Bengal,* Dacca, University of Dhaka, 1999.

Zahiruddin, Shah Alam & Others. *Contemporary Architecture Bangladesh,* Dhaka, Institute of *Architects, Bangladesh, 1990.*

Dhaka University Institutional Repository

(বাংলা)

আনিসুজ্জামান (সম্পা.), *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, ১ম খন্ড, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭।

আলী, আবিদ *গৌড় পান্ডুয়ার স্মৃতিকথা*, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭।

আলী, এ. কে. এম. ইয়াকুব *মুসলিম মুদ্রা ও হস্তলিখন শিল্প*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯।

আহমদ, ওয়াকিল (সম্পা.), *বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ রজত জয়ন্তী*, ঢাকা, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ১৯৯৩।

আহমদ, খাজা নিযাম উদ্দীন *তবাকাত-ই-আকবরী*, ১ম খন্ড, আহমদ ফজলুর রহমান (অনূদিত), ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮।

আহমদ, সালাউদ্দীন ও অন্যান্য (সম্পা.), *আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ স্মারক গ্রন্থ*, ঢাকা, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষৎ, ১৯৯১।

আহমেদ, নাজিমউদ্দিন *পূর্ব পাকিস্তানের স্থাপত্য*, ঢাকা, পাকিস্তান পাবলিকেশন্স, ১৯৬৫।

ইসলাম, সিরাজুল (সম্পা.), *বাংলাপিডিয়া*, (১ম খন্ড- ১০খন্ড) ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩।

----------, *বাংলাদেশের ইতিহাস(১৭০৪-১৯৭১)*, ১ম, ২য় ও ৩য় খন্ড, ঢাকা, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩।

ইসলাম, এস. এম. রফিকুল *প্রাচীন বাংলার সামাজিক ইতিহাস(সেনযুগ)*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ২০০১।

করিম, আবদুল *বাংলার ইতিহাস, (সুলতানী আমল)*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩।

----------, *বাংলার ইতিহাস,(মোগল আমল)*, ১ম খন্ড রাজশাহী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯২।

----------, *মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

করিম, রেজাউল ও আজগর সৈকত (সম্পা.), *সোনারগাঁয়ের ইতিহাস উৎস ও উপাদান*। ঢাকা, রহমান গ্রুপ অব ইন্ডাষ্ট্রীজ, ১৯৯৩।

গুপ্ত, যোগেন্দ্রনাথ *বিক্রমপুরের ইতিহাস* (প্রথম সংস্করণ), কলকাতা, ভট্টাচার্য এন্ড সন্স প্রকাশনী, ১৩১৬। দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা ১৯৯৮।

চক্রবর্তী, রতনলাল *বাংলাদেশের মন্দির*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭।

চৌধুরী, আবদুল মমিন ও আলম ফখরুল (সম্পা.), *বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে নগর*, ঢাকা, উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৬।

তরফদার, এম. আর *ইতিহাস ও ঐতিহাসিক*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫।

ফারুক, এম.এম. আল (সম্পা.) *ঝিনাইদহের ইতিহাস*, ঝিনাইদহ, ১৯৯১

বন্দোপাধ্যায়, রাখালদাস *বাঙালার ইতিহাস*, ১ম ও ২য় খন্ড, কলিকাতা, নবভারত পাবলিশার্স, ১৯৭৪।

বারানী, জিয়াউদ্দিন *তারিখ-ই-ফিরোজশাহী*, গোলাম সামদানী কোরায়শী (অনূদিত), ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪।

বেগম, আয়শা *আমাদের ঐতিহ্য শাহজাদপুর মসজিদ*, ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৯০।

----------, *পাবনার ঐতিহাসিক ইমারত*, ঢাকা, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ২০০২।

বেগম, আয়শা (সম্পা.), *টাঙ্গাইলের স্থাপত্যিক ঐতিহ্য*, ঢাকা, খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানী, ২০০০।

ভট্টাশালী , নলিনীকান্ত *বাংলার প্রাথমিক যুগের স্বাধীন সুলতানদের মুদ্রা ও কালক্রম*, ঢাকা, ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর বেঙ্গল ষ্টাডিজ, ১৯৯৯।

মজুমদার, রমেশচন্দ্র *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ১ম খন্ড(প্রচীন যুগ), কলিকাতা, জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, ১৯৯৮।

মাহমুদুল হাসান, সৈয়দ *বাংলাদেশের মসজিদ*, ঢাকা, বাংলা একডেমী, ১৯৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

মুখোপাধ্যায়, সুখময় — *বাংলায় মুসলিম অধিকারের আদিপর্ব* (১২০৪-১৩৩৮),কলিকাতা, বঙ্গবাণী প্রিন্টার্স, ১৯৮৮।

মোহসীন, কে.এম ও অন্যান্য (সম্পা.), — *বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ (১ম খন্ড)*, ঢাকা, ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৩।

যাকারিয়া, আ. কা. মো. — *বাঙলাদেশের প্রত্নসম্পদ*, ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৮৪।

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৯৯।

রহিম, আবদুর ও অন্যান্য — *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস (১মখন্ড)*,ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮২।

রায়, নীহাররঞ্জন — *বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)*, কোলকাতা, লেখক সমবায় সমিতি, ১৯৫৩।

-------, — *বঙ্গের নদনদী*, কলিকাতা, ১৯৫৮

রায়, যতীন্দ্রমোহন — *ঢাকার ইতিহাস*, (১ম ও ২য় খন্ড), শৈব্যা প্রকাশন, কলকাতা, ২০০০।

শর্মা, হিমাংশু মোহন — *বিক্রমপুর(১ম খন্ড)*, নারায়ণগঞ্জ, বিক্রমপুর প্রতিভা কার্যালয়, ১৩৩৮।

শেরওয়ানী, আব্বাস খান — *তারিখ-ই-শেরশাহী*, মোহাম্মদ আলী চৌধুরী (অনূদিত), ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৬।

শাহনেওয়াজ, এ. কে.এম — *মুদ্রায় ও শিলালিপিতে মধ্যযুগের বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯।

সম্পাদনা পরিষদ, — *নারায়ণগঞ্জের ইতিহাস*, নারায়ণগঞ্জ, সুধীজন পাঠাগার, ১৯৮৫

সলীম, গোলাম হোসাইন — *রিয়াজ-উস-সালাতীন*, আকবর উদ্দীন (অনূদিত), ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪।

সাত্তার, আব্দুস — *বাংলাদেশ-ভারত অভিন্ন নদীর পানি সংকট*, ঢাকা, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ১৯৯৮।

সিরাজ, মিনহাজ উদ্দীন — *তবকাত-ই-নাসিরী*, আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া (অনূদিত ও সম্পা.), ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩।

হোসেন, এ বি এম. — *আরব স্থাপত্য*, ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

প্রবন্ধাবলী
(ইংরেজী)

Banerji, R. D. `Naihati Copper Plate', *Epigraphia Indica* ,Vol- xlv, Calcutta, 1917-18.

---------. `Barackpur Copper Plate,' *Epigraphia Indica* ,Vol- xv, Calcutta, 1921.

Chakravarti, M. M. `Bengal Temples and their Genaral Characteristics', *JPAHB*, N.S. Vol- v, Calcutta, 1906.

---------. `Notes on the Geography of Old Bengal', *JPASB,* N.S. Vol- iv, Calcutta, 1908.

---------. `Pre-Mughal Mosques of Bengal', *JPASB*, N.S. Vol- vi, Calcutta, 1910.

Husain, A.B.M. `The Ornamentation of the Sultanat Architecture in Bengal', *AJBSA*,Vol-1, Dhaka, 1978.

Khatun, Habiba *Report 2000,* Conservation team of Japan (Unpublished),

Kielhorn, `Deopara Copper Plate', *Epigraphia Indica* ,Vol- l, Calcutta, 1892.

Tarafdar, M.R. `Notes on Indo- Muslim Architecture', *JASP*, Vol- xI, Dacca, 1966.

 Dhaka University Institutional Repository

খাতুন, হাবিবা — 'মুহাম্মাদাবাদ, স্থান চিহ্নিতকরণ প্রসঙ্গ', *ইতিহাস*, ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, পঞ্চদশ-বিংশতি বর্ষ, ঢাকা, ১৩৮৮ - ১৩৯৩।

--------, 'সোনারগাঁও রাজধানী শহর ও বন্দর', *ইতিহাস*, ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, একবিংশ বর্ষ প্রথম-তৃতীয় সংখ্যা, ঢাকা, ১৩৯৪

---------, 'নারায়ণগঞ্জ জেলার প্রত্নসম্পদ: সেতু', *ইতিহাস*, পরিষদ পত্রিকা, চৌত্রিশ বর্ষ, প্রথম-তৃতীয় সংখ্যা, ঢাকা, ১৪০৭।

বেগম, আয়শা — 'বাংলাদেশের মসজিদ স্থাপত্য', *বাংলাদেশ ইতিহাস পারষদ রজতজয়ন্তী*, ইতিহাস পরিষদ ঢাকা, ১৯৯১।

----------, 'হাজিগঞ্জ দুর্গঃ নির্মাণকাল', *ইতিহাস*, ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, সপ্তবিংশতি বর্ষ, প্রথম-তৃতীয় সংখ্যা, ঢাকা, ১৪০০।

রহমান, কাজী মুস্তাফিজুর — 'বাংলার মন্দিরস্থাপত্যে মুসলিম প্রভাব' *গবেষণা পত্রিকা*, ৩য় সংখ্যা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, ১৯৯৭-১৯৯৮